Rizon

মাসুদ রানা

আগুন নিয়ে খেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

আগুন নিয়ে খেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালানোর উপায় কোথায় রানা-ববির?
গোবি মরুভূমি। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, পাহাড়-টিলা, গিরি-সংকট, বালির উঁচু স্তূপ বা গভীর খাদ। খেয়ালী প্রকৃতিকে নিয়ে খেলছে কেউ।
বড় বাড় বেড়েছে ওই জালাইর তেমুজিনের।
আগুন নিয়ে খেলছে ও!
স্তব্ধ হয়ে এল মধ্য-প্রাচ্যের ক্রুড অয়েল রপ্তানি! হোঁচট খেল গোটা বিশ্বের অর্থনীতি! পাগল হয়ে উঠলেন তাবৎ রাজনীতিবিদ! মহাচিনকে পায়ের কাছে হাঁটুমুড়ে বসাতে চায় তেমুজিন। তার সামনে কোন্ সাহসে মাথা সোজা রাখছে রানা?
সোহেল ও ববিকে নিয়ে আবার ঢুকল ও চেঙ্গিস খানের কমপাউণ্ডে। এমনি সময়ে খেপে উঠল প্রকৃতি।
পড়ছে একের পর এক লাশ! শেষে সমাধির ভিতর জালাইর তেমুজিনের মুখোমুখি হলো রানা।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

ঢেউ-খেলানো বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দ্রুত নেমে এল রাত। হু-হু বইছে হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধুলোর মেঘ। তার আড়ালে লুকিয়েছে চাঁদ-তারা। চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। হেডলাইটের আলো ম্লান হয়ে গেছে ধূলি-ঝড়ে, সামনের কয়েক গজ ছাড়া চারপাশ নিকষ অন্ধকার। হৃৎস্পন্দনের মত বিট-বিট আওয়াজ তুলে ছুটছে টু-সিলিণ্ডার ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন।

ঘেসো-জমি যেন প্রকাণ্ড সব ঢেউ, সেগুলোর উপর দিয়ে চলেছে চেক মোটর সাইকেল—যেন জেট স্কি। প্রতি ঝাঁকিতে গুঙিয়ে উঠছে পুরানো বডি। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার দিকে চলেছে রানা ও ববি। থ্রটল পুরোপুরি খোলা। ইঞ্জিনের কাছ থেকে সমস্ত শক্তি আদায় করতে চাইছে রানা। পথ বলতে কিছু নেই, তার পরেও সাইড-কার নিয়ে পঞ্চান্ন মাইল বেগে ছুটছে জাওয়া ৫০০ ওএইচসি। অনুসরণকারীদের পিছনে ফেলে দ্রুত সরছে ওরা। তবে সেটা কোনও বড় বিষয় নয় এখন। বড় সমস্যা অন্যখানে। গ্রীষ্মের শুকনো ঘাসে স্পষ্ট রয়ে যাবে মোটর সাইকেলের চাকার চিহ্ন।

সামনে কোনও চৌরাস্তা পড়বে, ভেবেছিল রানা। কিন্তু

অনেক দূর যাওয়ার পরও তেমন কিছু মিলল না। কখনও কখনও ঘোড়ার হাঁটা-পথ পাওয়া গেল, কিন্তু ওগুলো এত সরু যে লুকানো যাবে না চাকার দাগ। একবার বহু দূরে আলো দেখল, কিন্তু সেদিকে খানিক যাওয়ার পর হারিয়ে ফেলল ধূলিঝড়ের ভিতর। আবার এগোতে হচ্ছে আঁধারে। কোথায় চলেছে জানে না। হেডলাইটের ম্লান আলোয় কোনও সড়ক চোখে পড়ল না। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য একটু একটু করে বদলাতে থাকল। ঘাসজমি জায়গা ছেড়ে দিল পাহাড়ি টিলাকে। একের পর এক ঝাঁকি শুরু হলো। বারবার শুনল রানা, কপালকে গালি দিচ্ছে ববি। আরও কিছুক্ষণ পর টিলাগুলো পিছনে পড়ে গেল। শুরু হলো উস্কো-খুস্কো ঘাসের চাপড়া ভরা জমি। তারও খানিক পর নুড়ি-পাথরে ভরে উঠল জমিন। এখানে-ওখানে জন্মেছে কাঁটাওয়ালা ঝোপ-ঝাড়।

গোবি মরুভূমির উত্তর-প্রান্ত এটা। মঙ্গোলিয়ার এ অংশটা পাথুরে এলাকা, কখনও কখনও বালির টিবি। তারই মাঝে ঘাসজমি। টিকে রয়েছে গ্যাজেল হরিণ, বাজপাখি ও কিছু বন্যপ্রাণী। বহুকাল আগে এখানে রাজত্ব করেছে অতিকায় ডাইনোসর।

মোটর সাইকেল নিয়ে বালি ও নুড়ি-পাথরের উপর দিয়ে চলেছে রানা-ববি। মাঝে মাঝে সামনে পড়ছে গ্র্যানিটের উঁচু চাতাল, তখন এগোতে হচ্ছে পথ খুঁজে। সামনে পড়ল এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমি। এখানে-ওখানে মাথা তুলেছে বড় বোল্ডার। কিছুদূর এগুবার পর এ এলাকাও পিছনে পড়ল। দুটো প্রকাণ্ড বোল্ডারের মাঝ দিয়ে চওড়া এক সমতল উপত্যকায়

বেরিয়ে এল ওরা।

এ জায়গার মাটি ভুসকা নয়, শক্ত জমিন পেয়ে বাড়ল মোটর সাইকেলের গতি। তবে খোলা প্রান্তরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ধূলি-ঝড়, প্রায় অন্ধ করে দিল রানাকে। পরবর্তী একঘণ্টা মরুভূমির উপর দিয়ে ছুটল তিন-চাকার মোটর সাইকেল। ছোট ছোট ঝোপঝাড় ও পাথর বারোটা বাজাল চাকা ও বডির। তারপর হঠাৎ হিক্কা তুলতে শুরু করল ইঞ্জিন। কিছুক্ষণ পর কাশতে লাগল, বারবার ঝাঁকি খেয়ে থামতে চাইল। ওটাকে অনেক তোষামোদ করে আরও এক মাইল পেরুল রানা, তারপর সত্যিই থেমে গেল ইঞ্জিন। এক ফোঁটা অকটেন নেই!

শেষ কয়েকবার ঘুরে থেমে দাঁড়াল চাকাগুলো। চারপাশ দেখল রানা। সবদিকেই খাঁ-খাঁ মরুভূমি। বালির একটা ওয়াশের মুখে থেমেছে ওরা। আওয়াজ বলতে শুধু নিচু ঝোপ-ঝাড়গুলোর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার চাপা, হিসহিসে শব্দ। কিছুক্ষণ হলো ধূলি-ঝড় থেমেছে, পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ। মাঝে মাঝে পাক খেয়ে উড়ছে বালি, এ ছাড়া কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। ধুলো-বালির চাঁদোয়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে হাজারো নক্ষত্র। বালির প্রান্তরে আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

সাইড-কারের দিকে চাইল রানা। প্রাচীন মমির মত লাগছে ববিকে। চুল-দাড়ি-মুখ-পোশাক ঢেকে গেছে ধুলোয়। ভুল দেখছে, ভাবল রানা। না! সত্যিই ঘুমে কাদা সে! এক হাতে এখনও ধরে রেখেছে হ্যাণ্ডরেইল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ও গতির দুলুনি থেমে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে নড়ে উঠল ববি, চোখ মেলে কালো আকাশ ও চারপাশ দেখল।

'আমরা কোথায়? এ কোথায় নিয়ে এলে তুমি, রানা?' হাই

তুলল। 'এবার কি উটের পিঠে?'

'না,' বলল রানা। 'আজকের খেলা ঘোড়-দৌড়। দোলনা ছেড়ে নামো দেখি, খোকাবাবু।'

নেমে এল ববি, আড়মোড়া ভাঙছে। শরীর বাঁকিয়ে নিজের বাম উরু দেখল রানা। চামড়া ও সামান্য মাংস চিরে দিয়ে গেছে তীর। আগেই থেমেছে রক্ত বেরুনো। ধুলোর সঙ্গে জমে রয়েছে খানিকটা। ব্যথা নেই বললেই চলে।

'পায়ের কী অবস্থা?' জানতে চাইল ববি। এইমাত্র দেখেছে।

'পায়ে মাথা ঠুকতে চেয়েছিল তীরটা—নিয়ার মিস,' বলল রানা। ইঞ্জিন-কেসিং থেকে টান দিয়ে ভাঙা তীরের ফলাটা বের করল।

একবার ফেলে আসা দিগন্ত দেখল ববি। 'আন্দাজ কত পিছনে ওরা, রানা?'

সময় ও গতির হিসাব কষল রানা, তারপর বলল, 'ধরে নাও বিশ মাইল এগিয়ে আছি। বারবার ঘোড়া পাল্টে চলে আসতে পারে।'

'শর্টকাট না থাকলে হয়,' বলল ববি। 'ঘোড়ার বদলে জিপগাড়ি নিয়ে এলে?'

'একই কথা।'

'ঘোড়ার পিঠে লাফাতে লাফাতে খসে পড়ুক ব্যাটাদের পিছনের মাংস,' অভিশাপ দিল ববি। 'রাতের মত কোথাও থামুক। সেই সুযোগে এগোই আমরা। সামনে কোনও রাস্তা পেলে গাড়ি মিলবে।'

'সুখ-স্বপ্ন দেখা ভাল।' মোটর সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘোরাল রানা, সামনে গিয়ে পড়ল হেডলাইটের আলো। চকচক করছে

মরুভূমির বালি ও নুড়ি-পাথর। বামদিকে খানিক দূরে উঁচু পাথুরে জমি। ওদিকে বোধহয় টিলা-টক্কর। ওদিক ছাড়া বাকি তিনপাশ টাক মাথার মত পরিষ্কার।

'আমরা যেন একেকটা ফুটবল, এখানে-ওখানে লাথি খেয়ে পাহাড় থেকে পড়েছি,' বিড়বিড় করে বলল ববি। রানার দিকে চাইল। 'এবার একটু হাঁটলে খারাপ লাগবে না। তুমি বললে বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি!' যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকটা দেখাল।

'যাব ওদিকে, তবে আগে হাতের জরুরি কাজ শেষ করি।'

'সে আবার কী?'

'আমরা হবো জাদুকর। এই মরুভূমিতে গায়েব করে দেব মোটর সাইকেল।'

মোটর সাইকেলকে ধাওয়া করতে চাইল না ছয় ঘোড়সওয়ারী, বরং ধীর গতিতে অনুসরণ শুরু করল। এই গতিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগোতে পারবে। মঙ্গোলিয়ান ঘোড়া অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এদের অভ্যস্ত করা হয়েছে। এদের পূর্ব-পুরুষদের কাজে লাগিয়ে পুরো এশিয়া দখল করে নেয় মঙ্গোল যোদ্ধারা। অতি অল্প খেয়ে সারা দিন ছুটতে পারে এসব ঘোড়া। বেঁটে-খাটো দেখতে, মনে হয় খাবার না পেয়ে মরতে বসেছে। কিন্তু বাস্তবে প্রাণশক্তির দিক দিয়ে পশ্চিমা ঘোড়ার চেয়ে অনেক এগিয়ে।

দলের সবাইকে কাছাকাছি রেখে এগিয়ে চলেছে মঙ্গোলদের প্যাট্রল লিডার। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে। সামনে থেকে হঠাৎ হাত তুলল সে। থেমে গেল সবাই। লিডারের চোখের

পাতা ব্যাঙের চোখের পাতার মত ফোলা। জমির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। হাতে চলে এল টর্চ, আলো ফেলল শুকনো ঘাসের উপর। তিনটি চাকার গভীর চিহ্ন সামনে গেছে। সন্তুষ্ট হয়ে টর্চ রেখে দিল সে, দাগ ধরে এগোতে শুরু করল। পিছু নিল দলের সবাই।

লিডার আন্দাজ করেছে পুরানো মোটর সাইকেল বড়জোর দশ মাইল চলবে। সামনে টিলা, ঢেউ-খেলানো জমি ও মরুভূমি। এক শ' মাইলের মধ্যে এমন জায়গা নেই যে লুকাবে দুই শয়তান। ঘোড়ার গতি বাড়াল না সে। তিন ঘণ্টা পেরুনোর আগেই গন্তব্যে পৌঁছবে। হেডকোয়ার্টার থেকে জিপ-গাড়ি নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। সঙ্গে যে ক'জন, তাদের নিয়েই এই ছোট্ট অভিযান শেষ করবে সে। তারা সবাই মঙ্গোল পুরুষ, হাঁটা শেখার আগে ঘোড়া চালাতে শিখেছে। লোকগুলো পালাবে কোথায়? মরতেই হবে। মুক্তি নেই। আর বড়জোর তিনটে ঘণ্টা, তারপর ওদের খেলা শেষ।

দিনের আলো সেই কবেই হারিয়ে গেছে। চাঁদ-তারাও ঢাকা পড়েছে। দমকা হাওয়া বইছে। উড়ছে বালি। একটু আগেও ভেসে এসেছে মোটর সাইকেলের আওয়াজ। তারপর টিলার রাজ্যে হারিয়ে গেছে শব্দ। চাকার দাগ অনুসরণ করে অন্ধকার রাতে এগিয়ে চলল ঘোড়সওয়াররা। কেউ কথা বলছে না, যে যার চিন্তায় ডুবে রয়েছে। টানা পাঁচ ঘণ্টা এগোল তারা। মাত্র একবার থামল, যখন মরুভূমিতে নুড়ি-পাথরের প্রান্তর শুরু হলো।

মরুভূমির পাথুরে জমিতে চাকার দাগ খুঁজে পাওয়া কঠিন। অন্ধকারে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেল চিহ্ন। টর্চ জ্বেলে আবারও

খুঁজে নেয়া হলো। ভোরের দিকে পড়ে গেল বাতাস, চারদিক ফর্সা হয়ে এল। এরপর পরিষ্কার দেখা গেল টায়ারের ছাপ। এগুনোর গতি বাড়ল তাদের। একজনকে সামনে ঘুরে আসতে পাঠাল লিডার। পাথুরে এক এলাকা পার হচ্ছে। কিছুক্ষণ হলো চাকার দাগ হারিয়ে গেছে।

খানিক পর একটা বালির খাড়িতে পৌঁছুল সবাই। বাম দিকে আকাশে মাথা উঁচু করেছে পাথুরে টিলা। সামনে বালি ও নুড়ি-পাথরের চওড়া সমতল জমি। এখানে আবার পাওয়া গেল ছাপ, খাড়ির ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে মোটর সাইকেলের চাকা। অনুসরণ করল মঙ্গোলরা। শক্ত জমিতে উঠে ঘোড়ার গতি বাড়ল। যদিও চাকার ছাপ হারিয়ে গেছে। সামনে যাকে পাঠানো হয়েছে, দূরে তাকে দেখল প্যাট্রল লিডার, দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়াটা। সবাইকে নিয়ে এগোল লিডার। পাশে যেতেই স্কাউট লোকটা বোকা-বোকা চেহারা করে চাইল।

'থেমেছ কেন?' ধমকে উঠল মঙ্গোল নেতা।

'সামনে... কোনও চিহ্ন নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'আরও সামনে নিশ্চয়ই আছে?'

'বালিতে ছাপ থাকার কথা। কিন্তু নেই কিছু। এখানে এসেই শেষ।' বালির দিকে আঙুল তাক করল লোকটা।

'ব্যাটা বেধড়ক গাধা,' বিড়বিড় করে বলল মঙ্গোল নেতা। ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়ল সে, বিরাট এক বৃত্ত তৈরি করছে। পুরো এক চক্কর ঘুরল সে, গর্দভের মত চেহারা হলো তারও। ফিরে এসে ঘোড়া থেকে নামল, চাকার দাগের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। বুটের হিল ডেবে গেল বালির ভিতর। খানিক নীচে পাথুরে জমিন। সাইড-কার সহ মোটর সাইকেলের চাকা তিনটে

এখানে এসেই শেষ! চারপাশ দেখল সে, পাতলা বালির পরত ঢেকে রেখেছে সব। তারা এসেছে বলে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ তৈরি হয়েছে, এ ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। চাকার ছাপ আর এগোয়নি। কোনও জুতোর চিহ্নও নেই। মোটর সাইকেল তো নেই-ই!

গেল কোথায় দুই বদমাশ! মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়?

দুই

মরুভূমির সমতল থেকে ষাট ফুট উপরে এই পাহাড়ি গুহা। খোঁড়লের মুখে বসেছে রানা ও ববি, চেয়ে রয়েছে নীচের দিকে। রাতের আঁধারে খাড়া টিলা বেয়ে উঠে এসেছে। সামনে খানিকটা চাতাল, নীচ থেকে দেখা যায় না। কিন্তু লোকগুলো টিলার দিকে এগিয়ে আসছে। সূর্যোদয়ের পরপর ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়েছে। পলাতকদের খুঁজতে শুরু করেছে। রানা-ববির পিছন থেকে উঠেছে সূর্য। পিঠের দিকে দেয়ালের মত চূড়া, তাই এখনও চাতালে সূর্য-রশ্মি পড়েনি। এ ছাড়া চারদিক জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বল আলোয়।

মোটর সাইকেলের চাকার দাগ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আবারও এসে থেমেছে মঙ্গোলরা। পরস্পরকে একবার দেখল রানা ও ববি। ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো দুই

মঙ্গোল। অন্য চারজন ছড়িয়ে পড়ল। দু' দিক দেখতে দেখতে চলেছে। এরা ভাবেনি পলাতকরা পিছিয়ে টিলার উপর উঠবে।

'প্রিয় হুডিনি, তুমি ওদের মাথা গরম করে দিয়েছ,' ফিসফিস করে বলল ববি। 'একবার ধরতে পারলে...'

'ধরুক তো আগে। ওরা যত খেপে উঠবে, তত কম দেখবে চারপাশ।'

নীরবে বসে থেকে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর সামনে থেকে ফিরল মঙ্গোলরা, আবারও জড় হলো দাগের শেষে। কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল প্যাট্রল লিডার। পিছনের দিকটা আবারও খুঁজতে শুরু করল সবাই। রানা ও ববি যেদিকে, সেদিকে আসছে এবার। দুই মঙ্গোল ফিরতি পথ দেখতে গেল। দু'পাশ দেখছে দু'জন করে। ডানদিকের দল এক-পা দুই-পা করে টিলার দিকে এগিয়ে এল।

'চুপচাপ ঘাপটি মেরে থাকি,' ফিসফিস করে বলল ববি। খোঁড়লের আরও ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জন। ক্লপ-ক্লপ আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে ঘোড়া। তারপর আওয়াজ থেমে গেল। বরফের মত জমে গেল রানা-ববি। সরাসরি গুহার নীচে এসে থেমেছে লোকগুলো। চোখে চোখে কথা হলো ওদের। টিলায় উঠবার আগে সমস্ত ছাপ মুছে এসেছে। আঁধারে যতটা সম্ভব। সেটা যথেষ্ট তো? এখন যে-কোনও সময় ধরা পড়বে ওরা।

লোকদুজন কী যেন বলছে। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল রানার। একজন ঘোড়া থেকে নেমেছে। ধীরে ধীরে টিলা বেয়ে উঠছে। বেলে-পাথরের বোল্ডারে খসখস আওয়াজ তুলছে চামড়ার বুট। ববির দিকে চাইল রানা। উবু হয়ে বসল ববি, গোটা কতক ক্রিকেট বল আকৃতির পাথর তুলে পায়ের কাছে রেখেছে।

'এখানে কেউ নেই,' চেঁচিয়ে বলছে লোকটা। চাতালের কয়েক ফুট নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। ডানহাতে একটা পাথর তুলে নিল ববি। কব্জি নাড়ছে। চট্ করে হাতটা ধরে ফেলল রানা। নীচ থেকে লোকটা কী যেন বলল। কণ্ঠস্বরে নির্দেশ। একটু নীচের লোকটা নড়তে শুরু করেছে। বুটের খসখস শব্দ সরছে। ধীরে ধীরে পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। নেমে গেল লোকটা। আবারও উঠল ঘোড়ার পিঠে। ক্ষুরের শব্দ। এক মিনিট পেরুনোর আগেই মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

'বড় কাছে চলে এসেছিল,' বলল ববি। 'কারও উচিত না এত কাছে আসা।' পাথরটা নামিয়ে রাখল ও।

'হঠাৎ মত বদলেছে, নইলে ট্যাপ খেয়ে যেত তোমার পাথর।'

খোঁড়ল থেকে মাথা বের করল ববি। বহু দূরে ধুলো তুলছে ঘোড়াগুলো। 'এখানে আরও অপেক্ষা করব আমরা?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা আবারও আসবে খুঁজতে।' মঙ্গোল আগ্রাসনের কথা ভাবছে রানা। যুদ্ধের ময়দানে চেঙ্গিস খানের প্রিয় কৌশল ছিল পিছিয়ে যাওয়া। বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী। কখনও কখনও কয়েকদিন অপেক্ষা করা হতো। তারপর রাজশক্তি যখন নিশ্চিত আর কোনও আক্রমণ আসবে না, ঠিক তখনই নতুন করে হামলা হতো। ওই একই অবস্থা হতে পারে মরুভূমিতে বেরোলে, ভাবছে রানা। ঘোড়সওয়ারীরা সহজেই পেয়ে যাবে ওদের। তার চেয়ে অনেক ভাল অপেক্ষা করা, লোকগুলো বিদায় নিলে পথ খুঁজে বেরিয়ে পড়বে ওরা।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল দু'জন, তারপর শুয়ে পড়ল।

সারারাতের ক্লান্তি ওদের পেয়ে বসেছে। যে-কোনও সময় বিপদ আসতে পারে, তারপরেও ঘুম এল। ঘণ্টাখানেক পর জেগে গেল ওরা গুড়গুড় আওয়াজে। মনে হলো কাঁপছে টিলা। বাইরে চাইল ওরা। বহুদূরে বজ্রপাতের আওয়াজ, কিন্তু আকাশ নির্মেঘ। উত্তরদিকে চোখ পড়ল। ধুলোর একটা মেঘ উড়ছে ওখানে। দ্রুত আসছে ছয় অশ্বারোহী। দেখতে দেখতে হাজির হলো, রানাদের অবস্থান পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। চাকার শেষ দাগের কাছে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। মাথা নিচু করে জমি দেখতে দেখতে চলেছে। কী ভাবে রানা ও ববি অদৃশ্য হলো আবিষ্কার করতে চাইছে। একঘণ্টা খুঁজে আবারও জড় হলো তারা। নেতা লোকটা চেঁচিয়ে কী সব যেন বলল। একই সঙ্গে রওনা হলো ঘোড়াগুলো, চারপাশ দেখতে দেখতে চলল সবাই। কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে গেল উত্তর দিগন্তে।

'আরেকবার চেষ্টা করে দেখল,' বলল ববি। 'তখন বেরিয়ে পড়লেই গেছিলাম।'

'আর আসবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'এবার যাওয়া যাক, চলো।'

'যা খিদে লেগেছে, মরুভূমির বালিই খেতে হবে যা মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করল ববি।

পেট চোঁ-চোঁ করছে। রানার মনে পড়ল, গতকাল সকালে নাস্তা করেছে, তারপর আর কিছুই খাওয়া হয়নি।

গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা, নামতে শুরু করল সাবধানে। পাঁচ মিনিট পর বালিতে নেমে মোটর সাইকেলের দাগের কাছে চলে গেল। ওখান থেকে সত্তর ফুট দূরে ঘন ভাবে জন্মেছে টামারিক ঝোপ-ঝাড়। ওগুলোর মাঝের ঝোপটা কয়েক সেকেণ্ড

দেখল রানা। ওটার নীচে লুকিয়েছে সাইড-কার। ঝোপের বাইরে এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঝারি সব পাথর। চট্ করে কেউ খুঁজে পাবে না ওখানে কিছু রয়েছে।

'রাতে দেয়া ক্যামোফ্লেজ, সে হিসাবে খারাপ নয়,' রানার দিকে চাইল ববি। কোটের পকেট থেকে বের করল ঘোড়ার নাল। সাইড-কারের কাউলিঙে ছিল, পরে পকেটে পুরেছে আবার। 'আমাদের কপাল ভাল যে এটা সঙ্গে ছিল।'

মৃদু হাসল রানা। মোটর সাইকেল অদৃশ্য করবার বুদ্ধি কাজে লেগেছে। কপাল সত্যি ভাল যে, ঠিকভাবে যন্ত্রটা লুকানো গেছে। প্রথমে ওরা পিছন দিক খুঁজেছে। নুড়ি-পাথর ভরা এক নালা পেয়ে মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছে। একই দাগের উপর দিয়ে ফিরেছে রানা। নালার কাছে এসে দু'জন মিলে মোটর সাইকেল শূন্যে তুলে সরিয়ে নিয়েছে। নালা ধরে বহুদূর গেছে ওরা। কাউলিঙের ভিতর একটা টুলবক্স ও কোদালের পাত পাওয়ায় পরের কাজটি খুব কঠিন হয়নি। মোটর সাইকেল থেকে খুলে ফেলেছে ওরা সাইড-কার। বালি খুঁড়ে শুইয়ে দিয়েছে মোটর সাইকেল। খানিক তলায় পাথরের স্তর থাকায় আরও নীচে পোঁতা যায়নি। এরপর সাইড-কার বয়ে রওনা হয়েছে। ওটা ছিল বড় একটা ঝামেলা। গর্ত খুঁড়বার উপায় নেই পাথরের বুকে। কারটা সঙ্গে নিয়ে টামারিক ঝোপের ভিতর ঢুকেছে ওরা। শুইয়ে দিয়েছে মাঝখানের ঝোপে। কাত করা সাইড-কারের সিটে রোপণ করেছে ঝোপ-ঝাড়। মাঝারি সব পাথর এনে তিনদিক আড়াল করেছে। এরপর নিজেদের সমস্ত চিহ্ন মুছে টিলায় গিয়ে উঠেছে। কাছাকাছি পৌঁছে টের পেল রানা, লুকানোর কাজটা খুব ভাল হয়নি। তবে পাথরগুলোর কাছে

ঘোড়ার কয়েকটা খুরের দাগ দেখে বোঝা গেল খুব খারাপও বলা যায় না। অশ্বারোহী সাইড-কার দেখেনি।

মাঝ দুপুর। মাথার উপর গনগন করছে সূর্য। তাপ যেন বালি থেকে ছিটকে উঠে আসছে। অর্ধেক ডুবে থাকা সাইড-কার দেখল রানা-ববি আত্মমগ্ন হয়ে।

'ওটায় চেপে আসার সময় খারাপ লাগেনি,' বলল ববি।

'আমারও না। অন্য পথও ছিল না।' দিগন্তে চাইল রানা। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। চারদিক ফাঁকা। থমথমে নীরবতা। চোখের কাছে আড়াআড়ি ভাবে হাতঘড়ি তুলল ও। কাঁচে রশ্মি পড়তে সূর্যের দিকে ঘুরতে শুরু করল। ঘণ্টার কাঁটার উপর সোনালী গোলকটা আরেকবার দেখল। এখন দুটো বাজে। পুরানো সার্ভাইভাল কৌশল—নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে ঘণ্টার কাঁটা ও ডায়ালের বারোটার মাঝখানে থাকবে দক্ষিণ দিক। মনে মনে হিসাব কষল এবার, এটা দক্ষিণ দিক, অর্থাৎ সাতটা বাজবার জায়গাটা উত্তরদিক। তার মানে দুটো ও চারটের দাগের মাঝখানে পশ্চিম।

'আমরা পশ্চিম দিকে যাব,' বহু দূরের লালচে টিলাগুলো দেখল রানা। 'ওদিকে ট্র্যান্স-মঙ্গোলিয়ান রেলওয়ে। বেইজিং থেকে উলানবাটোর গেছে।'

'একদিন পৌঁছে যাব... হয়তো,' বিড়বিড় করে বলল ববি। 'কত দূরে কে জানে!'

'ওদিকে না গিয়ে আর কোনও উপায় আছে?' হাঁটতে শুরু করল রানা।

'নেই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছু নিল ববি।

তিন

দুনিয়ার যেখানে যত ভয়ংকর প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে গোবি মরুভূমি নিঃসন্দেহে অন্যতম। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ওঠে এক শ' দশ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি। শীতে নামে শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রি। প্রায়ই দেখা যায় একই দিনে ষাট ডিগ্রি নামছে বা উঠছে। মঙ্গোলরা এ এলাকার নাম দিয়েছে, পানি-শূন্য জমি। পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মরুভূমি এটা। কে বলবে এককালে এখানে ছিল সাগর। পরবর্তী সময়ে ছিল জলা, সেখানে ঘুরে বেড়াত ডাইনোসর। প্যালিয়োন্টোলজিস্টদের জন্য সেরা এলাকা এটা। সহজেই মেলে ফসিল।

এ বিশাল প্রান্তরকে বালি, বোল্ডার ও নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরি সাগর মনে হয়েছে রানা ও ববির। চারদিকে টিলা, লালচে পাথরের স্তূপ, কখনও কখনও বাদামি-ধূসর নুড়ি-পাথরের সমতল এলাকা। মাথার উপর নির্মেঘ আকাশ, নীচে ধু-ধু প্রান্তর, তারই মাঝে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে গূঢ় সৌন্দর্য। হেঁটে চলেছে ওরা। নীরব থমথমে পরিবেশ বলছেঃ মৃত্যুর পথে চলেছে দু'জন।

প্রায় বিকেল হয়ে এল, তাপমাত্রা এক শ' ডিগ্রির উপর। চারপাশের পাথরগুলো তেতে উঠেছে সূর্যের তাপে। থেমে থেমে

এলোমেলো হাওয়া বইছে, যেন ব্লো-টর্চ দিয়ে শরীর পুড়িয়ে দেবে। রানা-ববির সাহস নেই যে শার্টের আস্তিন বা প্যান্টের গোড়ালি গুটিয়ে রাখে। তা করলে একটু স্বস্তি মিলত, কিন্তু বদলে লাগত মরুভূমির শক্তিশালী আলট্রাভায়োলেট রে। অবশ্য কোট খুলেছে ওরা, কোমরে বেঁধে রেখেছে। রাতে শীতের প্রকোপে লাগবে ওগুলো। কোটের লাইনিং ছিঁড়ে টুপির মত বেঁধে নিয়েছে মাথায়। পরিচিত কেউ দেখলে হাসত, এরা যেন অভিনয় করছে মরুভূমিতে পথ হারানো জলদস্যুর।

রানা ও ববি জানে, সামনে কঠিন সময় ওদের। প্রায় দু'দিন হলো পেটে কিছু পড়েনি। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে চলেছে। দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে হাড় কাঁপানো শীত। দু'দিক থেকে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। ডিহাইড্রেশন বা হাইপোথারমিয়া ওদের শেষ করতে পারে। ওদের নিয়ে খেলছে নিষ্ঠুর প্রকৃতি। প্রচণ্ড খিদে কোথায় যেন মিলিয়েছে, রয়েছে শুধু ভয়াবহ পিপাসা। মোটর সাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে প্রচুর ধুলো গিলতে হয়েছে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। কণ্ঠনালীতে টনটনে ব্যথা। মরুভূমিতে বেঁচে থাকতে হলে জমিয়ে রাখতে হবে শক্তি। পানি ছাড়া বড়জোর তিনদিন টিকবে ওরা। সূর্যের তাপকে এড়িয়ে চলতে না পারলে মাত্র দেড় দিনেই নিশ্চিত মরণ।

গত রাতে যে গুহার ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। আরেকটু গিয়ে থামবে, ঠিক করেছে রানা। কোনও গ্রাম বা শহর পাওয়া জরুরি, নইলে মরতে হবে। দূরে একটা ল্যাণ্ডমার্ক ঠিক করেছে, এখন মাপা পা ফেলে সেদিকে চলেছে। পাশে নীরবে হাঁটছে ববি। দেহের তাপ স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রতি আধঘণ্টা পর থামছে ওরা,

কোনও বোল্ডার বা টিলার ছায়ায় থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিকেল পেরুলে দিগন্তের উপর ঝুলতে থাকল সূর্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। খর-উত্তাপ বিদায় নিয়ে, পরিবেশ এখন সহ্য করবার মতন। তারপর... উফ্ফ্!

গোবি মরুভূমি যে একেবারেই জনশূন্য তা কিন্তু নয়, এখানে বাস করে অল্প কিছু মানুষ। ছোট্ট গ্রামগুলো টিকে রয়েছে অগভীর কূপ খনন করে। এসব বসতিতে সামান্য ঘাস মেলে। সে কারণে ওখানে যায় যাযাবর পশুচারকরা। রানা ও ববি যদি হাঁটতে পারে, এমনও হতে পারে, কারও সঙ্গে দেখা হবে। হাল ছাড়বার প্রশ্নই ওঠে না, ওরা জানে পশ্চিমে রেল-লাইন পড়বে। ওটা বেইজিং থেকে উলানবাটোরে গেছে। পাশে থাকবে ধূলি-ধূসরিত সরু এক রাস্তা। ...কিন্তু আছে কত দূরে ওটা?

রানার ঘড়ি ও সূর্যের অবস্থান ঠিক। পশ্চিমে চলেছে ওরা। মরুভূমি কালচে ধূসর হয়ে আসছে। একটু পর আঁধার নামবে। ঠিক তখনই গভীর চিহ্ন দুটো পেল ওরা। নব্বুই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দূরে চলে গেছে।

চাকার দাগ!

'হায়, খোদা!' বিড়বিড় করল ববি। 'আমি তো ভেবেছি এই ভিন-গ্রহে মানুষ নেই!'

উবু হয়ে ট্র্যাকগুলো গভীর মনোযোগে দেখল রানা। এই চিহ্ন তৈরি হয়েছে জিপ-গাড়ি বা ট্রাকের কারণে। কিন্তু দাগের দু'পাশ ভোঁতা, বুজে এসেছে। ধুলোও জমেছে অনেক।

'গতকাল এ পথে যায়নি,' বলল রানা।

'তা হলে অনুসরণ করা উচিত না?'

'হতে পারে পাঁচ দিন আগে গেছে, আবার হতে পারে পাঁচ

মাস আগে।' আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। মন চাইল গিয়ে দেখে কোন্ দিকে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরেকবার মাথা নাড়ল, হাতের ইশারা করে পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করল। ওরকম চিহ্ন আরও মিলতে পারে। মঙ্গোলিয়ায় খুব কম রাস্তা রয়েছে যেগুলো মরুভূমির ভিতর দিয়ে গেছে। কোথাও রওনা হলে দিক ঠিক করে বেরিয়ে পড়ে মঙ্গোলরা, রাস্তা থাকুক বা না থাকুক। যদি কোনও স্যাটালাইট দিয়ে ছবি তোলা হয়, ওসব চিহ্ন বা পথ মনে হবে প্লেট থেকে পড়ে যাওয়া একগাদা নুডল্স্।

সূর্য ডুবতে মরুভূমির হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এল। খাবার ও পানির অভাবে, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড গরমে দুর্বল হয়ে পড়েছে ওরা। কিন্তু শীতল হাওয়া খানিকটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়ে দিল। নুড়ি-পাথরের প্রান্তরে গতি বাড়ল ওদের হাঁটবার। তিন চূড়াওয়ালা পাথুরে এক টিলাকে তাক করে চলেছে, ওটাই রানার কম্পাস। ওখানে পৌঁছুবে মাঝরাতের পর। আকাশ একদম পরিষ্কার, তার কপালে ঝুলছে বাঁকা একফালি চাঁদ, চারপাশে রুপালি আলো বিছিয়েছে। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পর বেলে-পাথরের মসৃণ এক স্ল্যাব পেয়ে থামল ওরা, ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। আকাশে চোখ রাখল। লক্ষ-কোটি নক্ষত্র ঝিকমিক করছে।

'ওই যে বিগ ডিপার,' আঙুল তাক করে কনস্টেলেশন উর্সা মেজর দেখাল ববি। 'ওটার একটু উপরে লিট্ল্ ডিপার।'

'ওটার হাতের শেষে ওই যে ধ্রুবতারা,' উঠে দাঁড়াল রানা। অন্ধকারে অদৃশ্য টিলার দিকে বামহাত তুলল। 'ওদিকটা পশ্চিম।'

'চলো, যতটা পারা যায় এগুনো যাক,' একবার গুছিয়ে নিয়ে

উঠে দাঁড়াল ববি। কোটের ভিতর থেকে ঘোড়ার নাল বেকায়দা খোঁচা দিয়েছে। আনমনে একবার চাপড় দিল ওটার উপর, তিক্ত হাসল।

নতুন কম্পাস পেয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ পর পর আকাশ দেখছে রানা। ধ্রুবতারা ওদের ডানদিকে থাকতে হবে। পেটে ভীষণ ক্ষুধা, তার চেয়ে বেশি পিপাসা। হাঁটতে হাঁটতে শক্তি ফুরিয়ে আসছে, ফলে গতি মন্থর। কথা বন্ধ হয়ে গেল। রানার বাম উরুর ব্যথা নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রতি কদমে খচখচ করে লাগছে এখন। রাতের হাওয়া ক্রমে হিমশীতল হয়ে উঠল। কোমর থেকে কোট খুলে পরে নিল ওরা। হাঁটছে বলে শরীর গরম থাকছে, কিন্তু শক্তি কমে আসছে পুষ্টির অভাবে।

'আর কখনও মরুভূমির ধারেকাছে নেই আমি, বাবা!' বলল ববি। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'জোসেফ কার্ক কী করছেন কে জানে!'

'আসার আগে ফোনে বলেছি আমাদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট দানিয়া থেকে নামাতে,' বলল রানা।

'ট্রাক পেলে এ সপ্তাহের মধ্যে উলানবাটোরে পৌঁছে যাবে।'

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান খোঁজ-খবর নেবে তিনদিন পর, তার আগে না।'

'ততদিনে হেঁটে পৌঁছে যাব উলানবাটোরে।'

মৃদু হাসল রানা। সত্যিই পারত ববি। বলা যায় না, হয়তো পৌঁছে যেত ওকে কাঁধে তুলে নিয়েও। কিন্তু পানি না থাকায়... খুব শীঘ্রি... ওরা মরতে চলেছে! পথ হারিয়ে কত লোকই তো মারা পড়েছে এখানে, আরও দুটি নাম যোগ হবে নির্দয় গোবির খুনের তালিকায়।

উত্তরদিক থেকে টানা হাওয়া শুরু হয়েছে। দ্রুত নামছে তাপমাত্রা। হাড় কাঁপিয়ে দিতে চাইছে। হাঁটলে হয়তো শীতে জমে মরবে না। একটা কথা ভেবে সন্তুষ্ট ওরা, গ্রীষ্মের রাত দ্রুত পেরিয়ে যায়। পশ্চিমদিকে চলেছে, কিন্তু মন বলছে, একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু তা হতেই পারে না। নক্ষত্র চট্ করে নড়ে না। কিন্তু গন্তব্য কত দূর? তিন চূড়াওয়ালা টিলা কই?

দু' ঘণ্টা হাঁটবার পর ফসকা পাথরের এক উপত্যকা পড়ল। কঠিন হয়ে উঠল পা ফেলা। বারবার ঢেউ খেলে গেছে জমিন, একেকটা ঢেউ যেন ছোটখাটো একেকটা পাহাড়। দূরের ওই টিলা কত দূর? অনেকক্ষণ হাঁটবার পর বড় একটা পাথুরে ঢেউয়ের কাঁধে উঠল ওরা। ওটার সঙ্গে মিশেছে ওই তিনটি চূড়াওয়ালা টিলা। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলো ওরা, টিলার চূড়ায় উঠবে। অনেকদূর সহজে উঠে গেল, তারপর কঠিন হলো ওঠা। চূড়ার কাছে প্রায়-খাড়া এক অংশে অসংখ্য বোল্ডার, ওগুলোর ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হলো। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইল দেহ। খাড়া পথের শেষ অংশ পেরিয়ে চূড়ায় উঠল ওরা, হাঁপাতে লাগল। সারা শরীরে ব্যথা।

ধীরগতির একখণ্ড মেঘ কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিল চাঁদকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল চারপাশ। ব্যাঙের ছাতা আকৃতির এক পাথরের উপর বসল রানা পা দুটোকে বিশ্রাম দিতে। উবু হয়ে দু' হাঁটুর উপর থাবা রেখে হাঁপিয়ে চলেছে ববি। বলল, 'আমার সর্বস্ব দিয়ে দেব একটা স্যাটালাইট ফোনের বিনিময়ে।'

'আমিও,' সায় দিল রানা। গলাটা ভেঙে গেল।

আড়াই মিনিট বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর মেঘ সরে গেল চাঁদের উপর থেকে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল নীলচে আলো।

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা, চোখ চলে গেল টিলার ওপাশে। সোজা নেমেছে কিনারা, মিশেছে গিয়ে নিচু খাড়া টিলার সঙ্গে। তার ওপাশে গামলার মত এক উপত্যকা। আঁধারে আবছা দেখা গেল, মাঝখানে কয়েকটা গোলাকার কী যেন।

'ভুল দেখছি না বোধহয়?' হাত তুলে উপত্যকা দেখাল রানা। 'তুমিও কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'বিয়ার আর সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ মিলতে পারে ওখানে, যা দেখছ ঠিকই দেখছ, বন্ধু!' সোজা হয়ে দাঁড়াল ববি, রানার পাশে এসে থামল। চোখ দুটো ব্যস্ত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর নিশ্চিত হলো উপত্যকার মাঝখানে কালো বিন্দুগুলো ঠিক জিনিসই।

'হতে পারে ম্যানহ্যাটান না, তবে বসতি তো!'

'গোলাকার ওগুলো যাযাবর মঙ্গোলদের জারের মত,' বলল রানা। 'হয়তো ওখানে তাঁবু ফেলেছে পশুচারকরা।'

'মন বলছে তাদের কারও কেতলি আর কফি আছে,' গরম রাখতে দু'হাত জোরে ঘষছে ববি।

'একটু বেশি আশা হয়ে গেল, তবে নিশ্চয়ই চা মিলবে।'

'গরম গরম? চলবে।'

ঘড়ি দেখল রানা। রাত তিনটে। 'আমরা যদি এখন রওনা হই, সূর্য উঠবার সময় পৌঁছে যাব।'

'ঠিক একেবারে নাস্তার সময়।'

নামবার পথ খুঁজতে শুরু করল ওরা। খানিক দূরে পেয়েও গেল একটা চওড়া নালা, ওটা বেয়ে সাবধানে নামল অনেক পথ। নীচের টিলার উপর নামল বেশ কিছুক্ষণ পর, পাথর ছাওয়া জমির উপর দিয়ে এগোল। নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে। জানে,

সব কষ্টেরই শেষ আছে। সামনে গ্রাম। গ্রামে মিলবে খাবার ও পানি।

কিন্তু হাঁটবার গতি কমাতে বাধ্য হলো ওরা। ঢেউ-খেলানো কয়েকটা উঁচু ধাপ পেরুনোর পর থাকল শুধু বালির বড় বড় ঢিবি। আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে চলল ওরা। নামতে হলো তিন-কোনা এক মেসার উপর। ওটার শেষ প্রান্তে ছোট্ট এক অধিত্যকা, ওখানে থামল ওরা বিশ্রাম নিতে। নীচে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার। নীরব। আর বড়জোর এক মাইল দূরে।

পুব আকাশে ফুটছে ভোরের আবছা আলো। চারপাশ এখনও ভাল দেখা যায় না। তবে মরুভূমির কালচে পটভূমিতে ধূসর-রঙা লাগছে জারগুলো। গুনল রানা, বিশটা তাঁবু। দূর থেকে মনে হলো একেকটা বিশাল আকৃতির। উলানবাটোরে যেসব দেখেছে, সেগুলো অনেক ছোট। গ্রামের পরিবেশ অস্বাভাবিক। কোথাও কোনও আলো নেই। একটা লণ্ঠনও জ্বলছে না। আগুনও নেই। অন্ধকারে থম মেরে রয়েছে সব।

ওখানে রয়েছে খুদে খুদে কালচে আকৃতি। এত দূর থেকে বোঝা গেল না ওগুলো ছাগল, গাধা, ঘোড়া না উট। বড় একটা জারের ধারে বেড়া দেওয়া এক করাল, ভিতরে চরছে পশু। গ্রামের অন্য প্রাণীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

'একটা ঘোড়া পেলে কাজ হয়!' বলল ববি।

'উট হলেও চলবে।'

রওনা হয়ে গেল ওরা। অধিত্যকা থেকে নেমে এগিয়ে চলল। মনে সুখের আমেজ। সামনে গরম গরম খাবার। গ্রামের এক শ' ফুটের ভিতর পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। চোখের কোণে ওকে থামতে দেখেছে ববি, দাঁড়িয়ে পড়ল সে-

ও। চোখ-কান খোলা। কোনও বিপদ? কই, না তো! সবই স্বাভাবিক। রাতের আঁধার এখনও বিদায় নেয়নি। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। মাঝে-মধ্যে দমকা হাওয়া বইছে। এর বাইরে আবার কী?

'কী হলো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ববি।

'ঘোড়া বা উট,' নিচু স্বরে বলল রানা, 'ওগুলো নড়ছে না।'

ঝাপসা আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাণীগুলো। সত্যিই নড়ছে না। বামদিকে খানিকটা দূরে তিনটে বাদামি উট চোখে পড়ল ববির। ওগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পাক্কা এক মিনিট ওগুলোকে দেখল ও, একচুল নড়ল না একটাও। 'ঘুমাচ্ছে হয়তো?' রানার দিকে চাইল।

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'গায়ের গন্ধ কই?'

গবাদি পশু থাকবে, অথচ আশপাশে গোবর থাকবে না, এ হয় না। সামনে বাড়ল রানা, চলে গেল উটগুলোর পাশে। সামান্যতম ভয় পেল না ওরা। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। একটার নিতম্বে হালকা চাপড় দিল রানা। পশমগুলো কর্কশ। দু' পা সরে জড়িয়ে ধরল উটের গলা, ববিকে চমকে দিয়ে জোর এক ধাক্কা দিল। এবার একই সঙ্গে নড়ে উঠল তিন উট। প্রায় দৌড়ে রানার পাশে পৌঁছে গেল ববি। জন্তুগুলোর পায়ের কাছে সরে গেছে বালি, ওখানে দেখা গেল কাঠের আড়া।

উটগুলো জীবন্ত নয়। এ গ্রামের সবকটা প্রাণী কাঠের!

চার

'অদৃশ্য হয়ে গেছে? কী বলছ! গায়েব হয়ে গেছে? কী করে?' জালাইর তেমুজিনের রাগ চড়ছে উত্তরোত্তর। ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠল। 'ওদের পিছনে মরুভূমি পর্যন্ত গেছ তোমরা!'

দশাসই লোক সিকিউরিটির হেড, তবে বসের ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল। লোকটাকে যমের মত ভয় পায় সে।

'হঠাৎ বালির মধ্যে হারিয়ে গেছে চাকার চিহ্ন, স্যর,' নিচু স্বরে বলল গ্যানবোল্ড। 'অন্য কেউ গাড়িতে তুলে নিয়েছে, তা-ও নয়। ওখানে কোনও চিহ্ন নেই। সবচেয়ে কাছের গ্রাম পঞ্চাশ মাইল দূরে, স্যর। পুবে। লোকগুলো দক্ষিণে গেছে। ...গোবি মরুভূমি তাদের বাঁচতে দেবে না, স্যর।'

বার কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ভোদকা মার্টিনি মিক্স করছে বলোর্মা। ভাইয়ের হাতে একটা গ্লাস তুলে দিল সে। নিজেরটা ঠোঁটে তুলে বলল, 'ওরা কি চায়নিজ গুপ্তচর?'

'না,' আস্তে করে মাথা নাড়ল গ্যানবোল্ড। 'আমার তা মনে হয় না। ঘুষ দিয়ে মঙ্গোলিয়ান স্টেট সিকিউরিটির ভিতর ঢুকে পড়ে। চায়নিজ ডেলিগেশন খেয়াল করেনি যে এরা ফেরেনি। উলানবাটোরে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির গার্ডরা যে দুই লোকের বর্ণনা দিয়েছে, মনে হয় সেই দু'জনই।'

'চায়নিজরা এত বড় বোকামি করবে না,' মন্তব্য করল তেমুজিন।

'ওরা চিনা নয়, স্যর। নিজ চোখে দেখেছি আমি। একজন ইউরোপিয়ান, অন্যজন ইণ্ডিয়ান। ডক্টর মংখোবাত ল্যাবোরেটরিতে শুনেছে একজন ইংরেজি বলেছে। উচ্চারণ আমেরিকানদের মত।'

ড্রিঙ্ক গিলতে গিয়ে বিষম খেল বলোর্মা। কাউন্টারে গ্লাস নামিয়ে কাশল বার কয়েক, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'আমেরিকান? ইণ্ডিয়ান? দেখতে কেমন?'

জালাইর তেমুজিন বলল, 'জানালা দিয়ে যা দেখেছি, একজন বেশ লম্বা, পেটা শরীর, কালো চুল। অন্যজন বেঁটে, মজবুত শরীর। কালো চুল, কোঁকড়া।'

মাথা দোলাল গ্যানবোল্ড। নিচু স্বরে বলল, 'স্যর যা বলছেন সবই মেলে।' লোকদুটোকে হাতে পেয়েও হারিয়েছে, চেপে গেল। কোদালের বাড়ি খেয়ে চোয়ালে এখনও ব্যথা।

'আমার তো মনে হচ্ছে ওরা নুমার লোক,' তিক্ত চেহারা করল বলোর্মা। 'মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ড। ওরাই বৈকাল হ্রদের বিশাল ঢেউ থেকে উদ্ধার করে আমাদের। ওরাই তাতিস্কা জাহাজে ওঠে, রাশান বিজ্ঞানীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এর পর সাইবেরিয়া ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হই আমরা।'

'তোমার পিছু নিল কী করে?' কড়া স্বরে জানতে চাইল জালাইর।

'জানি না। তাতিস্কা জাহাজ লিজ নিই আমরা, সে কাগজ যোগাড় করা খুব কঠিন নয়।'

'এরা এমন এক বিষয়ে নাক গলাচ্ছে, যেটা তাদের ব্যাপার

নয়। কমপাউণ্ডের কোথায় কোথায় গেছে?' গ্যানবোল্ডের দিকে ফিরল জালাইর তেমুজিন।

'চাকা লিক হওয়া একটা জিপ নিয়ে গ্যারাজে যায়। ওখান থেকে ঢুকে পড়ে রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ভিতর। ডক্টর মংখোবাত সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি পারসনেলদের সঙ্গে কথা বলে। ওখানে কয়েক মিনিট থাকে লোকগুলো। কী করে যেন গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। বোধহয় ঢুকতে চাইছিল এ বাড়ির ভিতর। তখনই তাদের দেখতে পান আপনি।'

রাগে লাল হয়ে উঠল জালাইর তেমুজিনের মুখ, ঘাড়ের রগ আরও ফুলে উঠল।

'আমি শিওর, অয়েল কোম্পানির ওই কর্মচারীদেরকে খুঁজতে এসেছে এরা,' বলল বলোর্মা। 'আমরা কী করছি জানে না। দুশ্চিন্তা কোরো না, ভাইয়া।'

'তেল কোম্পানির কর্মচারীদের এখানে নিয়ে আসা তোমার মোটেই উচিত হয়নি,' হিসহিস করে বলল জালাইর।

'ভুলটা তোমার!' চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল বলোর্মা। 'তুমি আগেই জার্মানদের মেরে ফেললে, নইলে পুরো ফিল্ড ডেটা পেতাম। নতুন করে সাহায্য লাগত না।'

আগুন ঝরছে চোখে, বোনের দিকে চাইল জালাইর তেমুজিন, স্বীকার করল না সত্যি বলেছে বলোর্মা। 'আমাদের হাতে যে দু'জন রয়ে গেল, তাদেরও পরপারে পাঠাতে হবে। তাড়া দিয়ে কাজ করাও, অ্যানালাইজ করুক। এ সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই।'

'চিন্তা কোরো না। মাসুদ রানা বা ববি মুরল্যাণ্ড কিছুই জানে না আমাদের কাজ সম্পর্কে। তা ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে

জানাবে কাকে? মরুভূমির ভিতর ধুঁকে ধুঁকে মরবে ওরা।

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ,' খানিকটা শান্ত হলো তেমুজিন। 'সাগরে ভাসলেও সুপেয় পানি পেত না।' গ্যানবোল্ডের চোখে চাইল সে। 'তবে নিশ্চিত হতে হবে লোকদুটো মরেছে।'

'ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ, ভাইয়া।'

'তৃষ্ণা নিয়ে মরুক ওরা,' বিড়বিড় করে বলল তেমুজিন, ঠোঁটে তুলল মার্টিনির গ্লাস।

এক ঢোকে নিজের ড্রিঙ্ক শেষ করল বলোর্মা। মন কু দিয়ে উঠল তার। মরুভূমির ভিতর মরবে তো লোকদুটো? দুর্ধর্ষ লোক এরা, সহজে মরে না। কে জানে, আরও কোনও বিপদ ঘটায় কি না!

গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা ও ববি। ওদের মনে হচ্ছে হলিউডের কোনও ব্যাক-লট সেট দেখছে। ওয়েস্টার্ন সিনেমার দৃশ্যপট। তবে গরুর পালের বদলে উটের পাল। একটা করালের বেড়া ডিঙাল ওরা, চোখ পড়ল গিয়ে চৌবাচ্চার উপর। কাঠের পশুর জন্য পানি লাগে না। নেই-ও! সকালের কাঁচা রোদে লম্বা ছায়া পড়ছে পশুগুলোর। গ্রামের বিভিন্ন অংশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এক শ'র বেশি কাঠের উট গুনেছে রানা, তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছে। কারা এটা করেছে, উদ্দেশ্য কী, কে জানে!

'টেক্সাসের এক লোককে চিনতাম, সে ব্যাটা সামনের উঠানে বারোটা ক্যাডিলাক অর্ধেক পুঁতে রেখেছিল,' বলল ববি।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা কী রকম সৌন্দর্য চর্চা জানি না,

তবে এখানে এরা শিল্প দেখাতে চায়নি।'

নিকটবর্তী জারের কাছে চলে গেল ওরা। ওটা স্বাভাবিক তাঁবুর চারগুণ আকৃতির। পশমে মোড়া গোলাকার তাঁবু, দু' শ ফুট বৃত্তের। দশ ফুট উঁচু। সাদা রঙে আঁকা দরজা। মঙ্গোলিয়ার আর সব জারের মত দক্ষিণ মুখো। দরজার উপর টোকা দিল রানা, ববি গলা উঁচু করে খুশি খুশি গলা ছাড়ল, 'হ্যালো?'

জবাব নেই। তার চেয়ে বড় কথা, ধাক্কা দিতেও দরজা একটু নড়ল না। ভিতর থেকে 'ঠং' আওয়াজ এল। ক্যানভাসের দেয়ালে ধাক্কা দিল রানা। একটুও নড়ল না ওটা। ক্যানভাসের পিছনে কাঠের মত কিছু। ববির দিকে চেয়ে বলল, 'বিরাট শয়তান নেকড়ে এ জিনিস ফুঁ দিয়ে উড়াবে, তা হবে না।' দু'আঙুলে ক্যানভাস ধরল ও, এক টানে ছিঁড়ে নিল দেয়াল থেকে। ক্যানভাসের পর পশম স্তর। ওটা ছিঁড়তে বেরিয়ে এল সাদা রঙের শীতল ধাতব দেয়াল। দু' আঙুলে টোকা দিল রানা, 'কোনও ধরনের স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।'

'পানির?'

'অথবা তেলের,' চারপাশের জারগুলো দেখছে রানা।

'যাযাবরদের তাঁবুর তুলনায় অনেক বড়, কিন্তু তেলের ট্যাঙ্ক হিসেবে অনেক ছোট,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ববি।

'আমরা বোধহয় আইসবার্গের উপরের অংশ দেখছি। বালির নীচে চল্লিশ ফুট থাকলে?'

বালিতে গেঁথে থাকা ছোট্ট এক পাথরের উপর চোখ পড়ল ববির। খোঁচাখুঁচি করে তুলে নিল। ওটা দিয়ে জোরে টোকা দিল ট্যাঙ্কের দেয়ালে। ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ এল। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'পুরো খালি,' উঠে দাঁড়িয়ে কাছের জার লক্ষ্য

করে পাথর ছুঁড়ল ববি। ঠং করে লাগল। ওই একই ধাতব আওয়াজ। তিক্ত চেহারা হলো ওর। 'সবই খালি।'

'আর তুমি চাও কেতলি ভরা কফি,' বলল রানা।

'মরুভূমির মধ্যে কে রাখল খালি তেলের টাঙ্কি? পশম দিয়ে ঢাকা জার, নকল গ্রাম—কীসের জন্য!'

'আমরা মনে হয় চিনা সীমান্তের কাছে,' বলল রানা। 'হতে পারে কেউ চিনা তেল চুরি করছে। যে করছে এয়্যারিয়াল সার্ভে করেছে, স্যাটালাইট ইমেজ নিয়েছে, ভাল করেই জানে আকাশ থেকে সব স্বাভাবিক মনে হবে।'

'নিশ্চয়ই তেলের কূপ ফুরিয়ে যায়নি? ট্যাঙ্কগুলো তো খালি।'

কোনও জবাব নেই ওদের কাছে। চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল। বুঝে গেল, এ নকল গ্রামে পানি বা খাবার নেই। আসবার সময় যত উৎসাহ ছিল, সব উবে গেল। জারগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল ওরা। খালি টাঙ্কি বালির ভিতর গাঁথা। এ ছাড়া কিছুই নেই! শেষ তাঁবুর পাশে পৌঁছে গেল। চেষ্টা করতে গিয়ে অবাক হলো রানা, এটার দরজা আসল! খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা। থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে আর মেঝে নেই! মাটির বিশ ফুট নীচে ওটা পাম্পিং স্টেশন! প্রকাণ্ড পাম্প থেকে পাইপের গোলকধাঁধা গেছে স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো লক্ষ্য করে। মরুভূমির বালির নীচ থেকে উঠেছে চার ডায়ামিটারের এক ইনলেট পাইপ।

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড অয়েল পাইপ-লাইন,' বলল রানা।

'সুড়ঙ্গ খুঁড়বার যন্ত্রের খেলা?' বন্ধুর দিকে চাইল ববি। 'একটু দাঁড়াও তো, দোস্তো, কোথায় যেন ও জিনিস দেখেছি!'

'আমাদের বন্ধ্রজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের বন্ধুরা তেল পেয়েছে। তা-ই এত আলাপ চায়নিজদের সঙ্গে।'

চুপ হয়ে গেল ওরা। বেরিয়ে এল। যেন ব্যঙ্গ করছে এ ভুয়া বসতি। মাথার উপর আগুন ঢালছে সূর্য। তপ্ত হয়ে উঠছে বালি ও নুড়ি-পাথর। আশা নিয়ে সারারাত হেঁটেছে। এখন পেয়ে বসেছে ক্লান্তি ও হতাশা। দু'জন ঠিক করল, বিশ্রাম নেবে। পাম্পিং হাউসের টাঙ্কি থেকে পশমের বড় এক অংশ ছিঁড়ল, দু' টুকরো করে বিছিয়ে দিল দেয়ালের ছায়ায়। পাশাপাশি শুয়ে পড়ল, মুহূর্তে হারিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

পশ্চিম দিগন্তে ডুবছে ফুটবল সদৃশ সোনালী সূর্য, এমন সময় ঘুম ভাঙল রানা ও ববির। ক্লান্তি দূর হয়নি একটুও, অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। হামাগুড়ি দিয়ে বসল ওরা, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। এ কপট বসতি ছেড়ে বেরিয়ে এল পা টেনে। হাঁটতে গিয়ে টের পেল, শক্তি আরও কমে গেছে। এক ঘুমে যেন দ্বিগুণ হয়েছে বয়স। শামুকের গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। ঘড়ির কাঁচে একবার বেয়ারিং নেবার জন্য থামল রানা। পশ্চিম দিক ঠিক করে নিয়ে আবারও হাঁটতে লাগল। ওরা এত ক্লান্ত যে খেয়াল করল না আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপ-লাইন কোনদিকে গেছে। কেউ কথা বলছে না, শুধু চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। ফাঁকা হয়ে আসছে মস্তিষ্ক, আবছা ভাবে সব চিন্তা হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়।

ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে হাওয়ার। ঝটকা দিয়ে বালি তুলছে। বোধহয় আবারও আসবে ধূলি-ঝড়। উত্তুরা হাওয়া এল কনকনে শীত নিয়ে। পাম্পিং স্টেশনের দেয়াল থেকে পশমের পাতলা ম্যাট্রেস সঙ্গে এনেছে রানা ও ববি। ওগুলো দিয়ে মাথা ও বুক

ঢেকে নিল। কোমরের নীচে গেল না। প্যান্ট ভেদ করে লাগছে হিম ঠাণ্ডা। বহুদূরে S আকৃতির এক টিলা লক্ষ্য করে চলেছে ওরা। সোজা পথে হাঁটতে চাইছে। দিগন্তের ওপাশে টুপ করে ডুবে গেল সূর্য। এর পর বাড়তে লাগল হাওয়ার মাতম। ধুলো উড়ছে চারদিকে। যে-কোনও সময়ে হারাবে ধ্রুবতারা। কম্পাস হিসাবে ওটা কাজে লাগবে না আর। হয়তো একই জায়গায় বার বার ঘুরপাক খেতে হবে।

হাঁটো, নইলে মরবে, মনের ভিতর বার বার আসছে কথাটা, এগিয়ে চলেছে রানা। কণ্ঠতালু ফুলে উঠেছে, মন থেকে প্রাণপণে সরিয়ে রাখছে পিপাসার কথা। বন্ধুর দিকে একবার চাইল রানা, নিষ্পলক চোখ, হেঁটে চলেছে ববি। সমস্ত মনোযোগ আটকে রেখেছে হাঁটবার উপর। এক পা এক পা করে চলেছে।

সময় যেন কিছু নয়, হারিয়ে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে বিদায় নেবে চেতনা। চোখদুটো খোলা রেখে ববির পাশে হাঁটতে চাইছে রানা। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছে, তার পর নতুন করে জেগে উঠছে। প্রতিবার দেখছে পাশে দাঁড়িয়ে ববি, টলছে। ছিন্নভিন্ন এলোমেলো চিন্তা আসছে। একবার সোহানার কথা, আবার সুলতা... কত মানুষের কথা... সব অনেক দূর ওর থেকে। ...সাগর ওকে সবসময় টেনেছে। সেই সাগরে ভেসে চলেছে? না বোধহয়। আবার হতেও পারে!

একঘণ্টা পেরিয়েছে হাঁটছে যে? হতে পারে দু'ঘণ্টা। কতক্ষণ হলো? জোরাল হাওয়া বইছে উত্তরদিক থেকে। ধুলোগুলো ঢেকে দিয়েছে নক্ষত্রগুলোকে। মাথার উপর একটু আলো ছিল, সেটাও নেই। হু-হু হাওয়ায় উড়ছে বালি। একটা রিজ দেখে রওনা হয়েছে ওরা। হারিয়ে গেছে ওটা। কোথায়? ...তাতে কী এসে

যায়? নিজের পাদুটোর দিকে চাইল রানা। অবশ দুটো ভারী পা থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু ওকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়?

ববি থমকে দাঁড়িয়েছে। হাত ধরে টানল রানা, আবারও হাঁটতে শুরু করল ওরা। যেন একই সুতোয় বাঁধা দুটো পুতুল। তুমুল হাওয়া বইছে। মুখ-চোখে আছড়ে পড়ছে বালির তীক্ষ্ণ কণা। সুচের খোঁচার মত ব্যথা! সামনে কিছু দেখা যায় না। আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে ওরা। জানে না তুমুল হাওয়া থেকে বাঁচতে গিয়ে পশ্চিমে নয়, এঁকেবেঁকে চলেছে ওরা দক্ষিণে।

কতদূর হেঁটেছে, ভাবতে চাইল রানা। এইবার ঘুমিয়ে পড়া যায় না? পায়ের কাছে এটা কী? থমকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল ও। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে ববি। দু'হাতে বন্ধুকে তুলতে চাইল রানা। উল্টো টান এল। পা পিছলে ববির পাশে পড়ে গেল রানা। নরম বালি। চারপাশ দেখতে চাইল। খানিক উপর দিয়ে বইছে ধুলো-বালির ঝড়, নীচে নেই। রাতের আঁধারে পাথরের উঁচু এক স্তূপের পাশে পৌঁচেছে ওরা। এদিকের পাথরের দেয়ালে ছোট্ট এক গুহা। ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তীব্র হাওয়া। গুহার মুখে পৌঁছুতে হবে। একহাতে ববিকে টানল রানা। আরেক হাতে ক্রল করতে চাইল। নড়ে উঠেছে ববি। হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জন। ধপ করে শুয়ে পড়েছে ববি। শেষ শক্তিটুকু কাজে লাগাল রানা, গা থেকে পশমের চাদর খুলে ববির মাথা ঢেকে দিল। বাকি অংশ দিয়ে মাথা ঢাকল নিজে। একটু উষ্ণতা যদি মিলত! চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থাকল রানা। বাইরে টানা শোঁও-শোঁও ঝড়। ভীষণ হিমশীত। কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

ওরা জানল না কখন চেতনা হারিয়েছে।

স্বপ্ন দেখছে ববি। গ্রীষ্মের দুপুর। নিথর এক পুকুরে ভাসছে ও। পানি ঘন, যেন সিরাপ। নড়তে অসুবিধা হচ্ছে। হঠাৎ গরম ঢেউ ভিজিয়ে দিল মুখ। বারবার ছলকে উঠে আসছে। মুখ সরাতে চাইল ববি। আবছাভাবে ভাবল, এটা কি স্বপ্ন, নাকি বাস্তব? স্বপ্নে কি এত বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে আসে? ঘুম ভেঙে গেল ববির। চোখের পাতা ভারী হয়ে আটকে গেছে। জোর করে খুলল একটা চোখ।

সরাসরি চোখের উপর পড়েছে সূর্যের আলো। আড়চোখে পাশে চাইল ববি। কোথায় সে ঝকঝকে নীল পানির পুকুর? তার বদলে গোলাপি থলথলে কী যেন নেমে এল গালের উপর। গরম অনুভূতি। কেউ গাল চাটছে। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নিল ববি। দু'পাটি বড় বড় হলুদ দাঁত, তার ভিতর ঢুকে গেল গোলাপি জিনিসটা। দাঁতগুলো এত বড় কেন? কী এটা? ঠোঁটের উপর মাইলখানেক লম্বা এক নাক! জন্তুটা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ওর মুখের উপর। বাপরে বাপ্, গেছি রে! গন্ধে শিউরে উঠল ববি। এ যেন পেঁয়াজ-রসুন ও লিমবার্গার-পনির একইসঙ্গে পচেছে!

দু'চোখ কষ্ট করে খুলল ববি, দু'হাতে ডলল চোখের পাতা। মাকড়সার ঝুলের মত চোখের সামনে কিছু। কখনও সখনও

হয়। কয়েকবার পিটপিট করবার পর দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। বিশাল ওই নাকের উপর বাদামি-খয়েরি দুটো চোখ। আরেকটু উপরে দীর্ঘ পাপড়ি। তবে অসুন্দর! কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে একটা উট। ওকে নড়ে উঠতে দেখে ব্রাঁ-উ-উ-উও-ও-ও বলে এক পা পিছিয়ে গেল। পশমের ম্যাট্রেসের বেশির ভাগ অংশ ডুবে গেছে বালির নীচে। তারই এক অংশ কামড়ে দেখতে চাইল জিনিসটা কী।

উঠে বসতে গিয়ে ববি বুঝল, যে পুকুর স্বপ্নে দেখেছে, তা বালির স্তূপ। জায়গাটা সূর্যের তাপে উষ্ণ। রাতের ঝড়ে একফুট উঁচু বালি জমেছে গুহার ভিতর। বাদামি বালির ভিতর থেকে জোরাজুরি করে দু'হাত বের করল ও, পাশে শুয়ে থাকা বন্ধুকে জাগাতে চাইল। প্রায় কবর হয়েছে রানার, দু'হাতে বালি খুঁড়তে শুরু করল ববি উপর থেকে স্তূপ সরানোর পর ম্যাট্রেস বেরিয়ে এল। এক টানে ওটা সরিয়ে নিল ববি। রুক্ষ চেহারা হয়েছে রানার। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রোদে পুড়ে কালচে ত্বক। ঠোঁটে ফাটল। কিন্তু কুচকুচে চোখদুটো চেয়ে রইল বন্ধুর দিকে। ববি বেঁচে আছে বুঝে একটু হাসল।

'স্বর্গে নতুন একটা দিন,' জড়ানো স্বরে বলল। ঠোঁটে ব্যথা পেয়ে চুপ মেরে গেল। চারপাশে চাইল। রাতের বালি-ঝড় বিদায় নিয়েছে। ঝকমক করছে মেঘহীন সুনীল আকাশ।

দুর্বল শরীরে উঠে বসল ওরা, পোশাক থেকে ঝরঝর করে পড়ল একগাদা বালি। ডানহাত প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে দিল ববি, চোখে ফুটে উঠল স্বস্তি। ঘোড়ার নালটা আছে। কর্কশ স্বরে বলল, 'এখানে নতুন অতিথি এসেছে।'

ম্যাট্রেস সরিয়ে দিল রানা, থরথর করে কাঁপছে দেহ।

ব্যাকট্রিয়ান উট কয়েক ফুট সরে কৌতূহলী চোখে দেখছে ওদের। কুঁজদুটো একদিকে হেলে পড়েছে। গা ভরা জাপ্টে থাকা পশম। বিশেষ করে উরু চারটেয়। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওটার। লোকটাকে কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে নতুন উৎসাহ নিয়ে ম্যাট্রেস চিবুতে লাগল।

'মরুভূমির জাহাজ,' বলল রানা।

'জাহাজ কই, টাগবোট। আমরা কি ওটা মেরে খাব, না চড়ব পিঠে?'

একটু ভাবল রানা। মেরে খাওয়ার শক্তি আছে ওদের?

ঠিক তখনই বালির এক ঢিবির ওপাশ থেকে ভেসে এল সুরেলা শিস। প্রথমে দেখা গেল ছোট এক ছেলের মুখ। একমাথা চুল। পরনে নীল ডেল। এবার ঢিবির উপর উঠে এল বেঁটে এক ধূসর ঘোড়া। ওটার পিঠে চেপে উটের দিকে আসছে ছেলেটি। থামছে না শিস। মালিকের গলা শুনে মাথা উঁচু করল উট। তার মালিকের হাতে লাঠির ডগায় ফাঁস, পরিয়ে দিল ঘাড়ে। শক্ত করে আটকে নিয়ে হঠাৎ দেখল গুহার মুখে দুই লোক। চমকে গেল বেচারা। বিস্ফারিত হলো দু' চোখ। এরা কি বালি-ভূত?

'হ্যালো,' নরম স্বরে বলতে চাইল রানা। মনে হলো চাপের মুখে ফেটেছে পাকা বাঁশ। ল্যাগব্যাগ করে উঠে দাঁড়াল ও। পোশাক থেকে ঝুরঝুর করে ঝরল বালি। 'একটু সাহায্য করতে পারো আমাদের?'

'আপনি... ইংরেজি বলেন?' ছেলেটি থতমত খেয়েছে।

'হ্যাঁ, বলি। তুমি কি আমার কথা বুঝবে?'

'আমি এ ভাষা শিখি এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে,' গর্ব ঝরে পড়ল

বলবার ভঙ্গিতে। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে বলছে।

'আমরা হারিয়ে গেছি,' খসখসে স্বরে বলল ববি। 'তোমার সঙ্গে খাবার বা পানি আছে? আমরা খুব ক্ষুধার্ত।'

কাঠের স্যাডল থেকে ঝুঁকে এল ছেলেটি, হাতে ছাগলের চামড়ার ছোট একটা মশক। ভিতরে ঢুক-ঢুক আওয়াজ তুলছে পানি! বাড়িয়ে দিতে ওটা নিল ববি, রানার হাতে দিতে চাইল। মাথা নাড়ল রানা। 'প্রথমে অল্প করে নাও। পরে নিচ্ছি।'

এক ঢোক গিলে বন্ধুকে দিল ববি। এক চুমুক খেয়ে ওকে ফিরিয়ে দিল রানা। এভাবে কিছুক্ষণ ছোট ছোট ঢোকে তৃষ্ণা মেটাল ওরা।

শার্টের পকেট থেকে রুমাল বের করল ছেলেটি, ভাঁজ খুলতে দেখা গেল ভিতরে রোদে শুকানো বড়সড় এক টুকরো পনির। ছুরি বের করে দু'টুকরো করল, দু'জনকে ভাগ করে দিল। রাবারের মত জিনিসটা পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে গেল রানা ও ববি। পানি দিয়ে গিলে ফেলল।

'আমার নাম গান্টামুর,' বলল ছেলেটি। 'আপনাদের নাম?'

'আমি মাসুদ রানা। আর এ ববি মুরল্যাণ্ড। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি।'

'রানা, ববি, আপনারা খুব বোকা, নইলে মরুভূমিতে পানি আর ঘোড়া না নিয়ে বেরোয় কেউ?' বেশ জোর দিয়ে বলল গান্টামুর। হাসতেই মিষ্টি লাগল ওকে দেখতে। একমাথা চুল দুলিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। অতিথি পেলে খুশি হবেন আমার বাবা। আমাদের বাড়ি এখান থেকে বড়জোর এক কিলোমিটার। ঘোড়ায় চেপে যেতে পারেন।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে এল সে, খুলে নিল কাঠের

ছোট্ট স্যাডলে রানা ও ববিকে হাতের ইশারা করল। বেঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠতে বলছে। স্টিরাপে পা রেখে ধীরে ধীরে উঠল রানা, হাত বাড়িয়ে ববিকে পিছনে উঠতে সাহায্য করল। রাশ ধরে বাড়ি লক্ষ্য করে রওনা হলো গাণ্টামুর। আরেক হাতে উটের দড়ি। মরুভূমি মাড়িয়ে উত্তর দিকে চলেছে।

কিছুদূর এগিয়ে বেলে-পাথরের এক টিলা পেরুল ওরা। একটা বাঁক নিতে দেখা গেল উটের বড়সড় এক পাল চরছে। পাথুরে জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে ঘাস। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি জার, ধুলোয় ধূসর সাদা ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। দক্ষিণ মুখো দরজাটা বহু পুরানো, ঝাপসা কমলা রঙের। একপাশে খুঁটি ও দড়ি দিয়ে তৈরি করাল, ভিতরে বাদামি পাঁচটি ঘোড়া। করালে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের দেখছে রুক্ষ চেহারার এক লোক। কালো চোখদুটো অন্তর্ভেদী। একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে, এমন সময় আগন্তুকরা হাজির হয়েছে।

'বাবা, এ লোকদুজনকে মরুভূমিতে পেয়েছি, হারিয়ে গেছে,' স্থানীয় ভাষায় বলল গাণ্টামুর। 'আমেরিকা থেকে এসেছে।'

নোংরা পোশাক পরা হৃতক্লান্ত লোকদুটোকে দেখল গাণ্টামুরের বাবা। সন্দেহ নেই বোকা লোকগুলো মস্ত ভুল করেছে আরলেগ খানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে। মঙ্গোলিয়ার নীচের অংশে দাপট শুধু ওই মরুভূমির। মুখে কিছু বলল না সে, রানা ও ববিকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল। দুই আগন্তুক কাঁপা হাতে হ্যাণ্ডশেক করল তার সঙ্গে।

'ঘোড়া বেঁধে রাখো,' ছেলের উদ্দেশে কড়া স্বরে বলল মঙ্গোল। হাতের ইশারায় আগন্তুকদের তাঁবু দেখাল।

তার পিছু নিয়ে জারের ভিতর ঢুকল রানা-ববি, অবাক

হলো। বাইরে থেকে পুরানো তাঁবু মলিন লাগে, কিন্তু ভিতরে সবকিছু অন্যরকম। মাটির মেঝে ঢেকে দিয়েছে উজ্জ্বল লাল রঙের কার্পেট। চারদিকের দেয়ালে ঝুলছে হাতে সেলাই করা ফুল-পাখি-জন্তুর কারুকার্য-খচিত নকশা। কাঠের কেবিনেট ও টেবিলগুলো লাল, কমলা ও নীল রঙের। চারপাশ ঝলমল করছে নানান রঙে, মনে ছাপ পড়ে। যেসব ফ্রেম ছাত ধরে রেখেছে, সেগুলো পাকা লেবুর মত সবজেটে-হলুদ রঙের।

ভিতরটা আর সব জারের মতই, যাযাবর জীবনের কুসংস্কারের ছাপ রয়েছে। দরজা থেকে বামে একটা র‍্যাক ও কেবিনেট। ওগুলো পুরুষদের। ওখানে ঝুলছে স্যাডল ও অন্যান্য জিনিসপত্র। জারের ডানদিক নারীদের জন্য। সেখানে রান্নার তৈজসপত্র ও পোশাক। মাঝখানে মাটি দিয়ে তৈরি ফায়ারপ্লেস ওটার সঙ্গে লাগানো ধাতব এক পাইপ উঠে গেছে ছাত ফুঁড়ে। দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে নিচু তিনটি বিছানা। পিছনের দেয়ালে একটা বেদি, পারিবারিক উপাসনার জায়গা।

রানা ও ববিকে বামদিক দিয়ে নিয়ে গেল লোকটি, ফায়ারপ্লেসের পাশে কয়েকটা টুল দেখাল। চিকন-চাকন এক মহিলা বসে রয়েছে তোবড়ানো এক কেতলির সামনে। হাঁটু পর্যন্ত কালো চুল তার। চোখদুটো যেন সবসময় হাসছে। দুই নবাগতকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। অতিথিরা পরিশ্রান্ত বুঝে নিয়ে এল ভেজা তোয়ালে। মুখ ও হাত পরিষ্কারের ব্যবস্থা। রানা ও ববি তোয়ালে নিতে চলে গেল সে রান্না করতে। পানি ভরা হাঁড়িতে ফেলল ছাগলের ফালি করা অনেক মাংস। রানার উরুর ক্ষত কোটের লাইনিং দিয়ে বাঁধা। রক্তের দাগ চোখে পড়েছে মহিলার। আবার উঠে এল, ব্যাণ্ডেজটা খুলে আরেকটা

কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। গান্টামুরের বাবা আগেই কাপে ঢেলে দিয়েছে কড়া কালো চা। রানা ও ববি তিনবার কাপ ভরে নিল। মাংস রান্না শেষে প্রত্যেককে মাংসের বিরাট একটা করে খণ্ড দিল মহিলা। সঙ্গে ট্রে ভরা পনির। ক্ষুধার্ত রানা-ববির মনে হলো জীবনে এত ভাল রান্না খায়নি। এ যেন ফ্রেঞ্চ হট কুইসিন! পেট ভরে মাংস ও পনির খেল ওরা। এরপর হাজির হলো চামড়া দিয়ে তৈরি একটি ব্যাগ। বাড়িতে তৈরি গাধার ফার্মেন্টেড দুধের তৈরি—এইরেগ। পুরুষদের তিনটি কাপ এনে দিল মহিলা।

জারে এসে ঢুকেছে গান্টামুর, সবার পিছনে বসল সে দোভাষী হতে। তার বাবা রানা ও ববির দিকে নিষ্পলক চোখে চাইল। কণ্ঠস্বর মোটা, কী যেন বলল।

'আমার বাবা ব্যাত-এরদেনে, মা তাতিয়ানা,' বলল গান্টামুর। 'তাঁদের বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছেন আপনাদের।'

'সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমরা না থাকলে মরতে হতো আমাদের,' বলল রানা। এইরেগের কাপ তুলে টোস্ট করল। স্বাদটা গরম বিয়ার ও বাটারমিল্কের মিশেল।

'রসদ ছাড়া গোবি মরুভূমিতে বেরিয়েছেন কেন?' ছেলের মাধ্যমে জানতে চাইল ব্যাত-এরদেনে।

'আমেরিকানদের একটা দলের সঙ্গে মরুভূমি দেখতে এসে হারিয়ে গেছি,' বলল ববি। 'যেখান থেকে শুরু করি, সেখানে ফিরতে চাইলাম, কিন্তু হঠাৎ শুরু হলো বালি-ঝড়।'

'গত রাতে?' মাথা দোলাল ব্যাত-এরদেনে। 'কপাল ভাল যে গান্টামুর আপনাদের খুঁজে পেয়েছে। মরুভূমির এদিকে বসতি খুব কম।'

'আমরা কাছের গ্রাম থেকে কতটা দূরে?' জানতে চাইল

রানা।

'এখান থেকে বিশ মাইল দূরে ছোট এক বসতি আছে,' জানাল ব্যাত-এরদেনে। 'এখন ওসব বাদ থাকুক, আপনারা বিশ্রাম নিন।' বুঝতে পারছে ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে লোকদুটোর চোখ। 'ঘুমিয়ে উঠুন, পরে কথা হবে।'

অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো বিছানা দেখিয়ে দিল গাণ্টামুর, তারপর বাবার পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল উটের পাল ফিরিয়ে আনতে। নরম বিছানায় এলিয়ে পড়ল ববি, মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ হলুদ ছাত দেখল রানা, তারপর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল রানাও।

সন্ধ্যার একটু আগে জেগে উঠল ওরা, নাকে বাড়ি দিল ছাগ মাংস রান্নার সুগন্ধ। জার ছেড়ে বেরিয়ে এল দু'জন একটু হাঁটতে। উটের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। কিছুক্ষণ পর ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো ব্যাত-এরদেনে ও গাণ্টামুর, দূরে চলে যাওয়া উট ফিরিয়ে এনেছে।

'দেখে মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠছেন,' বলল ব্যাত-এরদেনে।

'বলতে পারেন পুরোপুরি তরতাজা,' বলল রানা। বিশ্রাম ও খাবার নতুন করে ফিরিয়ে দিয়েছে শক্তি।

'আমার বউ রাঁধছে, দারুণ রাঁধে ও,' আন্তরিক হাসল ব্যাত-এরদেনে। ঘোড়াদুটো বেঁধে রাখল সে, ছেলেকে নিয়ে একটা গামলার সামনে থামল। সাবান পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তার পর অতিথিদের নিয়ে জারের ভিতর ঢুকল। পরিবেশিত হলো সেই ছাগ মাংস ও পনির। তবে এবার সঙ্গে নুডল্স্। আগের চেয়ে অনেক কম স্বাদু মনে হলো রানা ও ববির। খাওয়া শেষে সিরামিকের বাটি ভরে দেয়া হলো এইরেগ। একটু কমে

এলেহ মুহূর্তে নতুন করে ঢালা চলছে।

'বিশাল উটের পাল আপনার,' প্রশংসা করে বলল ববি 'কতগুলো হবে?'

'এক শ তিরিশটা উট আর ছ'টা ঘোড়া,' জানাল ব্যাত-এরদেনে। 'যথেষ্ট, কিন্তু একসময় সীমান্তের ওপাশে ছিল আমার পাঁচ শ উট।'

'চায়নিজ ইনার মঙ্গোলিয়ায়?'

'হ্যাঁ। ওরা বলে ওটা স্বাধীন এলাকা, কিন্তু আমরা জানি ওটা চিনের দখল করে নেওয়া একটা প্রদেশ।' আগুনের দিকে চেয়ে রইল ব্যাত-এরদেনে, চোখে রাগ। 'শক্তিশালী দেশ সবসময় দুর্বল দেশের ওপর অত্যাচার করে।'

বাঙালি জাতির উপর তা-ই করেছে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা, ভাবল রানা। মুক্তিযুদ্ধের সময় চিন আমাদের স্বাধীনতা রুখতে চেয়েছে। আমেরিকাও। যেমন অত্যাচার করছে ফিলিস্তিনি মানুষের উপর ইজরায়েল, ইঙ্গ-মার্কিন মদতে। জানতে চাইল রানা, 'আপনি এদিকে চলে এলেন কেন?'

মাথা কাত করে পিছন-দেয়ালের বেদি দেখাল ব্যাত-এরদেনে। ওটার উপর ঝাপসা সাদা-কালো একটা ছবি। ঘোড়ার পিঠে ছোট্ট এক ছেলে, রাশদুটো ধরে রেখেছেন মাঝবয়সী এক লোক। ছেলেটির অন্তর্ভেদী চোখ ঠিক ব্যাত-এরদেনের মত। বড় হয়ে বাপের মত দেখতে হয়েছে সে।

'গোবি মরুভূমির উত্তর দিকের মাঠে আমাদের সাত-পুরুষ উট চরিয়েছে। এমন এক সময় ছিল, আমার বাবার ছিল দু'হাজার উট। কিন্তু সে দিন এখন শেষ। ওদিকে সাধারণ পশুচারক নেই। জমি নিজেদের কাজে লাগিয়েছে চিনের

আমলারা। পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। বাপ-দাদার ঘাসজমি থেকে বারবার পিছিয়ে এসেছি। শেষে বাধ্য হয়ে মরুভূমির সবচেয়ে খারাপ জমিতে সরেছি। ভাল জমিতে যতটুকু পানি ছিল, সেটুকু পাম্প বসিয়ে টেনে নিয়েছে শিল্প-কারখানার নামে। চোখের সামনে মাঠ-ভরা ঘাস শুকিয়ে গেছে। কিছুই করতে পারিনি। দিনে দিনে আরও মরল মরুভূমি। বড় হতে লাগল। সবুজ বলতে থাকল না কিছুই। শেষে বাধ্য হয়ে পরিবার নিয়ে সীমান্ত পেরুলাম। এলাম ঠিকই, কিন্তু ঘাস এখানে খুব কম মেলে। তার পরও আফসোস নেই, এখানে পশুচারকদের সম্মান করে মানুষ।'

এইরেগ-এ ছোট্ট চুমুক দিল রানা। তিতা স্বাদ। ঝাপসা ছবিটা আরেকবার দেখে বলল, 'অনেকে ভুলে যায়, মানুষের পেটে লাথি দিতে হয় না।'

বেদির দিকে চেয়ে ববি। ওখানে ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ছাপা এক ছবি। লোকটা মোটাসোটা। চেহারা গম্ভীর। আভিজাত্য নিয়ে একহাতে ধরেছে থুতনি ভরা ছাগল-দাড়ি। ব্যাত-এরদেনের দিকে চাইল ববি। 'বেদির উপর উনি কে?'

'ওয়াইউয়ান সম্রাট, কুবলাই। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসক, কিন্তু সবসময় সাধারণ মানুষের বন্ধু,' ব্যাত-এরদেনে এমন ভাবে বলেছে, যেন কুবলাই খান এখনও বেঁচে।

'কুবলাই খান?' নিশ্চিত হতে চাইল ববি।

মাথা দোলাল পশুচারক। তিক্ত স্বরে বলল, 'অনেক ভাল ছিল যখন মঙ্গোলরা শাসন করত চিন।'

'দুনিয়া অনেক বদলে গেছে,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

ব্যাত-এরদেনের নেশা হয়েছে। এরইমধ্যে কয়েক বাটি শেষ

করেছে কড়া তরল। চোখদুটো চকচক করছে, গলা দিয়ে নামছে গাধার ফার্মেন্টেড বিয়ার, ফলে আবেগ উপচে উঠছে। রাজনীতির আলাপ থেকে সরে যেতে চাইল রানা। বলল, 'ব্যাত-এরদেনে, মরুভূমিতে বালি-ঝড় শুরু হওয়ার আগে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছি। একটা খালি গ্রাম। চারপাশে কাঠের উট। আপনি ওই গ্রাম দেখেছেন?'

ঘড়ঘড়ে হাসি বেরিয়ে এল পশুচারকের গলা থেকে। 'হ্যাঁ, দেখেছি। ওই গ্রামের মালিক গোবির সবচেয়ে বড়লোক। তার একটা মাদি গাধাও দুধ দেয় না।' এইরেগ-এ আরেক চুমুক দিল সে।

'কে বানিয়েছে?' একটু ঝুঁকে বসল ববি।

'একদিন মরুভূমিতে বহু লোক এল। সঙ্গে পাইপ, যন্ত্রপাতি আর মাটি খোঁড়ার মেশিন। বালির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করল। মাইলের পর মাইল। সবচেয়ে কাছের কুয়া দেখিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে টাকা দিল ফোরম্যান। উলানবাটোরের এক কোম্পানিতে নাকি কাজ করে তারা। আমাকে শপথ করাল, যাতে কাউকে না বলি ওখানে কী করছে। কয়েকজন শ্রমিক বেশি কথা বলে, একদিন তারা গায়েব হয়ে গেল। অন্যরা ভয় পেল। তারপর কাঠের উট আর বড় জারের মত ট্যাঙ্কি বানিয়ে একদিন চলে গেল লোকগুলো। গ্রামের মধ্যে পড়ে থাকল খালি ট্যাঙ্কি। ওখানে আছে শুধু ধুলো-বালি আর হাওয়া। এটা বহুদিন আগের কথা। ওই গ্রামে আর কেউ আসেনি। অন্যগুলোর মতই।'

'অন্যগুলোর মত?' জানতে চাইল রানা।

'সীমান্তের কাছে ওরকম আরও তিনটা আছে। ধাতুর জার।

সব একই। খালি। দাঁড়িয়ে আছে কাঠের উট।'

'ওখানে তেলের কূপ আছে?' বলল রানা। 'বা ওদিকের জমি থেকে পেট্রোল তুলছে?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল ব্যাত-এরদেনে, তারপর মাথা নাড়ল। 'না। অনেক বছর আগে চিনে তেলের কুয়া দেখেছি। এদিকে একটাও নেই।'

'ট্যাঙ্কগুলো জারের মত করে বানিয়েছে কেন, জানেন?' বলল ববি। 'কাঠের উট কীসের জন্য?'

'জানি না। কেউ কেউ বলে এক বিরাট বড়লোক বানিয়েছে। তার উটের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। ধাতুর জার বানিয়েছে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে। চায় মরুভূমি আবারও সবুজ হয়ে উঠুক। আবার এক ভিক্ষু বলে, সেই বড়লোক মরুভূমির শক্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। তা-ই রেখেছে কাঠের উটগুলো। তার আশা, মাটি খুঁড়ে যে পাপ করেছে, সেটা মাফ করা হবে। অন্যরা বলে, এ কাজ করেছে পাগল কোনও উপজাতি। কিন্তু ওরা সবাই ভুল জানে। আমার সোজা কথা, বিরাট ক্ষমতাশালী কেউ মরুভূমি থেকে ধন-সম্পত্তি পেতে চায়। নইলে যা-ই করুক, লুকিয়ে করতে চাইবে কেন? এটা বুঝি, এদের মন নোংরা, এরা নষ্ট।'

ব্যাত-এরদেনেকে প্রায় শুইয়ে দিয়েছে এইরেগ। বাটির শেষটুকু সড়াৎ করে টেনে নিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চাইল। শুভরাত্রি বলে টলতে টলতে চলে গেল একটা বিছানার কাছে। প্রায় ধপাস্ করে শুয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে জোর নাক-ডাকা শুরু হলো। তাতিয়ানা ও গাণ্টামুরকে বাসন-কোসন ধুতে সাহায্য করল রানা-ববি। কাজ শেষে বেরিয়ে এল, খোলা জায়গায়।

'কোনও কিছু পরিষ্কার হচ্ছে না,' রাতের আকাশে চাইল ববি। 'মরুভূমির ভিতর ট্যাঙ্ক তৈরি করে লাভ কী?'

'হতে পারে, ট্যাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি কিছু লুকিয়েছে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম।'

'যেমন?'

'যেমন, আসলে তেলের খনিটা কোথায়, সেই তথ্য।' বালির উপর ডান পা ঠুকল রানা।

ছয়

সারারাত নাকের করাত চালাল ব্যাত-এরদেনে। ববিও পাল্লা দিল প্রায় সমানে সমান। তবে সমস্যা হলো না রানার, গভীর ঘুমে অচেতন থাকল ও। গাণ্টামুর তার বিছানা ছেড়ে দিয়েছে ওদেরকে, নিজে শুয়েছে কার্পেটের উপর। সূর্যোদয়ের সময় ঘুম ভাঙল সবার। একসঙ্গে বসে নুডলস্ ও চা খেল। ব্যাত-এরদেনে জানাল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে; রানা ও ববিকে কাছের গ্রামের একটা আশ্রমে পৌঁছে দেবে গাণ্টামুর। ওখানে ছোটদের জন্য বাসের ব্যবস্থা রয়েছে, বাচ্চাদের নিয়ে যায় স্কুলে। প্রতি সপ্তাহে তিনদিন আসে। গাণ্টামুরের সঙ্গে বাসে চড়ে ওই আশ্রমে পৌঁছবে দুই অতিথি। ওখানে সপ্তাহে দু'বার উলানবাটোর থেকে আসে এক ট্রাক। ওটা চেপে ফিরবে শহরে।

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসতে প্যান্টের পকেট থেকে ধুলোভরা মানিব্যাগ বের করল রানা, পঞ্চাশ ডলারের দুটো নোট তুলে দিল তাতিয়ানার হাতে। সুস্বাদু খাবার ও আশ্রয়ের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল। ব্যাত-এরদেনেকে বলল, 'আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম, এ ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়।'

'পশুচারকদের বাড়ির দরজা সবসময় খোলা থাকে,' বলল ব্যাত-এরদেনে। 'শুভ হোক আপনাদের যাত্রা। আপনারা যে বন্ধুদের গোবিতে হারিয়েছেন, তাঁদেরও ভাল হোক।'

করমর্দন শেষে ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো ব্যাত-এরদেনে উটের পাল চরাতে। এরপর গাঁট্টাগোট্টা তিনটি ঘোড়া নিয়ে রওনা দিল রানা-ববি ও গান্টামুর, উত্তর-দিগন্ত লক্ষ্য করে চলেছে।

'তোমার বাবা খুব ভাল মানুষ,' বলল রানা। একবার ঘুরে দেখল, দূর দিগন্তে হারিয়ে গেছে ব্যাত-এরদেনের ঘোড়া।

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল গান্টামুর। 'কিন্তু তাঁর মন সবসময় খারাপ থাকে। সর্বক্ষণ ভাবেন, যেখানে জন্মেছেন সেখানে যদি ফিরতে পারতেন। এখানে ভালই আছি আমরা, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকে দক্ষিণ এলাকার হুলানবুইর-এ।'

'এখানে যদি ভাল থাকেন, উনি দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় ভাল থাকবেন,' বলল ববি। চারপাশে রুক্ষ পাথুরে জমি দেখছে।

'এখানে রোজগার করা কঠিন, কিন্তু আরেকটু বড় হলে আমি বাবার কাজে সাহায্য করতে পারব। তখন অভাব কমবে। আমি উলানবাটোর ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করব, মস্ত বড় ডাক্তার হবো। তখন বাবা যত উট চান, সব কিনে দেব।'

নুড়ি-পাথরের এক সমতল জমি পেরুল ওরা, সামনে পড়ল

কয়েকটা বেলে-পাথরের উঁচু টিলা। তার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে সরু ট্রেইল। ঘোড়াগুলোকে পথ দেখাতে হলো না, গোটা এলাকা ভাল ভাবে চেনে ওরা। কিছুক্ষণ পর অস্বস্তির মাঝে পড়ল রানা ও ববি। নিতম্বে ফোস্কা পড়ছে। মঙ্গোলদের স্যাডল কাঠের তৈরি। ওদের মনে হলো কাঠের বেঞ্চিতে বসে একের পর এক অসংখ্য স্পিড-ব্রেকার ডিঙিয়ে চলেছে।

একটু পর মুখ কুঁচকে জানতে চাইল ববি, 'ঠিক বলছ তো খোকা, এখানে কোনও বাস-স্টপ বা এয়ারপোর্ট নেই?'

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল গাণ্টামুর, তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'না, এদিকে বাস নেই। শুধু গ্রামে আসে সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু এরোপ্লেন আছে। এখান থেকে বেশি দূরেও না। যাবেন? আপনাদের নিয়ে যেতে পারি ওখানে।'

রানার দিকে চওড়া হাসি ছুঁড়ল ববি। গাণ্টামুরকে কী যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল, কিন্তু তার আগেই ঘোড়া নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে সে। পুবদিকের এক টিলার দিকে চলেছে।

'এ পথ থেকে সরলে বহু দূর ঘুরতে হবে,' বলল রানা।

'তা হোক, কোনও ক্ষতি নেই, কয়েকটা ফোস্কার বদলে উলানবাটোরে পৌঁছানো যাবে প্লেনে চড়ে,' বলল ববি। 'হয়তো ওই টিলার ওপাশেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে লিয়ার-জেট!'

গাণ্টামুরের পিছু পিছু চলছে ওরা। ধূলি-ধূসর জমিতে ঘোড়ার খুরের দাগ। সামনের সঙ্গীকে ধরতে দ্রুত ছুটল রানা-ববির ঘোড়াদুটো। দেখতে দেখতে পুবের টিলার কোলে উঠে এল। উত্তরদিকে গেছে এক সরু হাঁটা-পথ, সে পথে এগিয়ে চলল ওরা। একটা তীক্ষ্ণ মোড় নেয়ার পর দেখা গেল জমিন

সমতল, বেলে-পাথর দিয়ে তৈরি। খানিকটা সামনে কিছু প্রকাণ্ড বোল্ডার। একটু দূরে গাণ্টামুরকে দেখা গেল, এক বোল্ডারের ছায়ায় থেমেছে। চোখ সরু করে চারপাশ দেখছে ববি। কোথায় অ্যারোপ্লেন? কীসের এয়ারপোর্ট? পাথুরে টিলাগুলো বাদ দিলে মরুভূমির যেদিকে চোখ যায়, দেখবার কিছু নেই। তবে একদিক থেকে অন্যায় করেনি গাণ্টামুর, ভাবল ববি। ছেলেটা ওদের বেশিদূর নিয়ে আসেনি। এবার ফিরতি পথ ধরতে হবে। বাস মিলবে সেই গ্রামে।

গাণ্টামুরের পাশে গিয়ে থামল রানা ও ববি। হাসছে ছেলেটি। মাথা কাত করে ডানদিকের টিলা দেখাল।

অতি সাধারণ পাথুরে টিলা। পায়ের কাছে লালচে বালির এক বড়সড় ঢিবি। জায়গাটা আবারও খেয়াল করল রানা। ওখানে কিছু বিদ্‌ঘুটে পাথর রুপালি আভা ছাড়ছে।

'পাথরের অদ্ভুত বাগান, কী বলো?' গাণ্টামুরের দিকে চাইল ববি, ঠোঁটে লটকে রেখেছে নকল হাসি। মনে মনে বলছে, কোন্ আক্কেলে যে ছোঁড়াটাকে বিশ্বাস করলাম!

ববির দিকে খেয়াল নেই রানার, ঘোড়া নিয়ে স্তূপের দিকে চলেছে। ওখানে দু'পাশের দুটো পাথর অদ্ভুত আকৃতির। আরেকটু এগুতে হঠাৎ বুঝল, ওগুলো কোনও পাথর নয়। বালির নীচে চাপা পড়েছে দুটো রেডিয়াল ইঞ্জিন! উল্টে থাকা ফিউজেলাজের সঙ্গে একটা ইঞ্জিন, অন্যটা ডানার সঙ্গে। বালির নীচে সবই ঢাকা পড়েছে প্রায়!

ববি ও গাণ্টামুর হাজির হলো। ততক্ষণে বিমানের পাশে চলে গেছে রানা, দু'হাতে সরাতে শুরু করেছে বালি। একটু খুঁড়তে বেরিয়ে এল কাউলিংগুলো। বন্ধুর দিকে চাইল রানা,

'মিথ্যে কথা বলো কেন, ববি? এটা লিয়ার-জেট না, সাধারণ একটা ফোকার ট্রাইমোটর।'

আট দশক আগে ক্র্যাশ করেছে ফোকার এফ সেভেন বি ট্রাইমোটর। তখন থেকে এ নীরব গোরস্তানে পড়ে পড়ে চুপচাপ অপেক্ষা করছে। হয়তো কেউ দেখেওনি ভিতরে কী রয়েছে। উল্টে পড়ে রয়েছে বিমান, যুগের পর যুগ ওটাকে চাপা দিয়েছে বালি। ডানদিকের ডানা ও ফিউজেলাজ বালির নীচে হারিয়ে গেছে। বেশ খানিকটা পিছনে পোর্টের ডানা ও ইঞ্জিন, মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রায় ঢাকা পড়েছে বালির নীচে। অনেক উপর থেকে পাথরে আছড়ে পড়ে ককপিট, থেবড়ে যায়। ভিতরটা বালি দিয়ে ভরা। তারই ফাঁকে দেখা গেল দুটো কঙ্কাল, এখনও সিটবেল্ট-এ বাঁধা। ঠিক কঙ্কাল নয়, মরুভূমির শুকনো পরিবেশে শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে। পাইলটের জানালার পাশে চলে গেল রানা, দু'হাতে কাঁচ থেকে ধুলো-বালি সরাতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পর ঝাপসা রঙের লেখাগুলো বেরিয়ে এল: *ব্লেসেড় লিণ্ডসি।*

'মানুষগুলোর কপাল মন্দ। মরতে হলো এই মরুভূমির ভিতর। আত্মীয়-স্বজন কেউ জানল না তাদের কপালে কবে কী ঘটেছে।' বন্ধুর দিকে চাইল ববি। 'রানা, তুমি কিন্তু বলতে এ প্লেন কখনও আকাশ থেকে পড়ে না।'

'ইঞ্জিনগুলো নষ্ট হয় না বললেই চলে,' শুধরে দিল রানা। 'ফোকার ট্রাইমোটরের জান শক্ত। এগুলোর একটা নিয়ে আর্কটিক আর অ্যান্টার্টিকা অভিযানে বেরোন অ্যাডমিরাল ব্রাইড। উনিশ শ' আটাশ সালে তাঁর ফোকার এফ সেভেন নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন চার্লস কিংসফোর্ড-স্মিথ।

ইঞ্জিনগুলো রাইট ওয়ার্লডউইণ্ড কোম্পানির। অনেকে বলে এসব ইঞ্জিন চিরদিন চলবে, ক্ষয় নেই।'

'হয়তো প্রচণ্ড বালি-ঝড় আছড়ে ফেলেছে মরুভূমির ওপর,' আন্দাজ করল ববি।

ভূপাতিত বিমান থেকে বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছে গাণ্টামুর, চোখে গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়। ফোকারের পাশে হাঁটতে শুরু করেছে রানা ও ববি, চলে এল ফিউজেলাজের পিছন দিকে। ওখানে ছোট এক ঢিবি। দু'হাতে বালি সরাতে লাগল দু'জন। সূর্যের তাপে চারপাশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। গরমে ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে দু'জন। খানিক পর ফিউজেলাজের এক অংশ বেরিয়ে এলে আরও দ্রুত হাত চালাল ওরা। কিছুক্ষণ পর দরজা পুরোপুরি বেরিয়ে এল। পরস্পরকে দেখল দু'জন, ফিউজেলাজে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত অজস্র গর্ত। ওগুলোর উপর হাত বোলাল ববি। এবড়ো-খেবড়ো, কর্কশ অনুভূতি। চাপা স্বরে বলল, 'না, এ প্লেনকে বালি-ঝড় আকাশ থেকে ফেলেনি। গুলি করে নীচে ফেলা হয়েছে। কারণটা জানতে পারলে হতো।' হ্যাণ্ডেল ধরতে তুলল হাত, কিন্তু চাপা স্বরে কাতরে উঠল গাণ্টামুর।

'বড়রা বলে ভিতরে মরামানুষ আছে। লামারা বলেছেন আমরা যেন মরামানুষকে জ্বালাতন না করি। নইলে...' চুপ হয়ে গেল গাণ্টামুর। সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'যাযাবররা এ প্লেনে কখনও ঢোকে না।'

'মরামানুষদের অসম্মান করব না আমরা,' নরম স্বরে বলল রানা। 'যাতে ভালভাবে শেষকৃত্য হয়, সেটাও দেখব।'

'যাতে মুক্তি পায় তাদের আত্মা।' হ্যাণ্ডেল মুচড়ে জোরে টান

দিল ববি। ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ভাঙা কাঠ, বালি ও পোর্সেলিন এসে পড়ল ওর উপর। সামলে নিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ববি। আবছা আঁধারে বেশি কিছু দেখা গেল না। ভিতরে জমেছে ছোটখাটো এক স্তূপ। একটা ভাঙা বাসন তুলে নিল, ওটার এক অংশে চকচক করছে নীল এক ময়ূর। পাশ ফিরে রানার দিকে চাইল।

জিনিসটা ওয়াইউয়ান ডায়ন্যাস্টির, একটু চমকে গেছে রানা। এক পলকে বুঝেছে, এসব অ্যান্টিক ছিল মহা-মূল্যবান স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'আমরা প্রতিদিন ডিনারে যা ব্যবহার করি, এ তা নয়। এর বয়স অন্তত কয়েক শ' বছর।'

'তা হলে আমরা পেয়ে গেছি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিগস' পাযল,' দরজা থেকে সরে এল ববি। হাতের ইশারায় বন্ধুকে ভিতরে চেয়ে দেখতে বলছে। 'ঢুকে পড়ো। সব হাজারো টুকরো! বাকি জীবন খেলতে পারবে!'

বিমানের ভিতর ছিটিয়ে রয়েছে কিছু ক্রেট, বেশির ভাগ ভেঙে টুকরো। ভাঙা পোর্সেলিনে ঢাকা পড়েছে মেইন কেবিনের মেঝে। ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠেছে ফ্যাকাসে নীল কার্পেট। ফোকার এফ সেভেন বি ট্রাইমোটর আকাশ থেকে পড়লেও, পিছন দিকে কয়েকটা ক্রেট এখনও আস্ত রয়েছে।

বাঘের মত গুড়ি দিয়ে ফিউজিলাজে নামল রানা। আবছা আলোয় কয়েক মুহূর্ত চোখদুটো সইয়ে নিল। ভিতরের বদ্ধ বাতাস গুমোট। দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো আসছে, তাতে দেখা গেল অজস্র ধূলি-কণা উড়ছে। পরিবেশটা ভীতিকর। কেমন যেন ছমছমে। উল্টে পড়া বিমানের ছাত থেকে ঝুলছে কয়েক সারি উইকার চেয়ার। সব শূন্য। উঠে দাঁড়িয়ে

পিছন দিকের ক্রেটগুলোর দিকে চলল রানা। প্রতি কদমে মুড়মুড় করে ভাঙছে পোর্সেলিন। আরও সতর্ক হলো, জঞ্জালের ভিতর পা ফেলছে ধীরে।

পাঁচটা ক্রেট এখনও ঠিক রয়েছে। এক পাশের স্টেনসিল-এ লেখা: *ভঙ্গুর। সাবধানে রাখুন। এই সম্পত্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের।*

উপরের একটা ক্রেটের ঢাকনি ঝাঁকিতে প্রায় খসে এসেছে। ওটা দু'হাতে ধরে টেনে খুলল রানা। ক্রেটের ভিতরে বড়সড় কিছু, নরম কাপড় দিয়ে মোড়ানো। কাপড়টা সরিয়ে নিতে বেরিয়ে এল পোর্সেলিনের এক বড় বোউল। উপরের অংশ খাঁজকাটা। শ্বেত মাটির পটভূমিতে ঝিকমিক করছে সবুজাভ নীল ডিজাইন। দক্ষ শিল্পী নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্ভুত সুন্দর কিছু ফুল। ভাবতে গেলে কেমন যেন লাগে, এটার বয়স কমপক্ষে সাত শ' বছর! এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কত মানুষের স্মৃতি, হাসি, কান্না, আনন্দ, যুদ্ধ, ইতিহাস! বোউলটা সাবধানে ক্রেটের ভিতর নামিয়ে রাখল রানা, ঢাকনি আটকে দিল। মেঝের দিকে চোখ গেল। কত অ্যান্টিক ভাঙল, কে জানে! তাও ভাল; এ বিমান শুধু অ্যান্টিক সিরামিক নিয়ে রওনা হয়, কোনও যাত্রী ছিল না।

দরজার কাছে ফিরল রানা। ববি নামেনি, দরজার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নিচু স্বরে জানতে চাইল, 'কী কার্গো ছিল?'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য অ্যান্টিক সিরামিক। কয়েকটা বাক্স এখনও ভাঙেনি।'

'উঠে আসবে? দেরি করে লাভ কী? বাস ছেড়ে দিলে...'

'আরেকটু দেখি।' ককপিট লক্ষ্য করে মন্থর পায়ে চলল রানা। পিছনের প্রথম সারি চেয়ার পেরুল। বিমানটা যখন আছড়ে পড়ে, ক্রেটগুলো ছিটকে যায় সামনের দিকে। ককপিটের কাছে জমেছে ছোটখাটো এক পর্বত। ফাটল ধরা বড়সড় এক ফুলদানী এড়াল রানা। সূর্যের আলো এদিকে আসেনি। চারপাশ প্রায় আঁধার। একটু দূরে ভাঙা কিছু ক্রেট। ছিটিয়ে রয়েছে পোর্সেলিনের থালা-বাসন-জগ-ফুলদানী—সব এখন হাজারো টুকরো। তারই ভিতর ধূলি-ধূসর এক জ্যাকেট। চুরমার হওয়া একটা ক্রেট পেরুল রানা, ঝুঁকে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল—জ্যাকেটের মালিক এখনও জ্যাকেটের ভিতর!

উইকার চেয়ার থেকে ছিটকে পড়েন আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ড, সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। প্রায় ছিঁড়ে যায় বাম ঊরু। ভয়ঙ্কর ব্যথা সহ্য করে মারা যান কয়েক দিন পর। লাশটা মমি হয়ে গেছে। কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে, কেউ জানেনি এখানে অপেক্ষা করছেন তিনি। শুকিয়ে যাওয়া সরু বামহাত বুকের উপর। হলদেটে ছোট একটা কাঠের বাক্স ধরে রেখেছেন। ডানহাতে একটা নোটবই। পাথরের মত মুখটা কুঁচকে রয়েছে প্রচণ্ড ব্যথায়।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'বেচারা, প্লেন ক্র্যাশ করার পরেও বেঁচে ছিলেন, ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরেছেন।'

কথাগুলো শুনেছে ববি, জানতে চাইল, 'ওঁর সঙ্গে কিছু আছে, রানা?'

'দু'হাতে ধরা ছোট একটা বাক্স আর নোটবুক। মানুষটার কাছে ওগুলোর মূল্য অনেক ছিল।' আধ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর ঝুঁকে পড়ল লাশের উপর। সাবধানে বাক্স ও

নোটবুক ছাড়িয়ে নিল হাত থেকে।

নেমে এসেছে ববি। বাক্সটা ওর হাতে দিল রানা। একটু দূরে পড়ে রয়েছে নোংরা এক ফেদোরা টুপি। ওটা তুলে নিল রানা, আস্তে করে ঢেকে দিল লাশের মুখ।

'একই পরিণতি হয় দুই পাইলটের,' সামনের ককপিট দেখাল রানা। লাশ পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল, উঁকি দিল ককপিটে। বিমান পড়বার সময় পাইলটের জানালাগুলো ভেঙে যায়। পুরো কম্পার্টমেন্ট ভরে যায় বালিতে।

'বালি খুঁড়ে লাশ বের করতে চাইলে প্রায় একদিন লাগবে,' রানার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল ববি।

'পরেরবার এলে কাজটা করব,' বলল রানা। 'লাশগুলো বালির কবরে থাকুক। নতুন করে নষ্ট হবে না।'

ফিউজেলাজের লেজের কাছে ফিরল ওরা, একে একে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। কড়া রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। গার্ণ্টামুর খানিক দূরে পায়চারি করছে, চোখে দুশ্চিন্তা। ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে হাসল।

ওকে হলদেটে বাক্স দেখাল ববি, সাবধানে খুলে ফেলল ঢাকনি। ভিতরে ব্রোঞ্জের একটা টিউব। পাশে শক্ত করে মোড়ানো চিতার চামড়া। 'কই গেল আমার সোনা-দানা-রত্ন-মনিমাণিক্য?' একটু হতাশ হয়ে বলল ববি। টিউবের একমাথা খোলা যায়। যত্নের সঙ্গে খুলল। সূর্যের আলোয় দেখল। ভিতরটা ফাঁকা। 'ধূর, কিচ্ছু নেই!'

নোটবুক উঁচু করে দেখাল রানা। 'এটা কিছু বলবে।' পুরু মলাট ওল্টাল ও, শিরোনাম পড়ল—শাং-ডু'র প্রত্নসন্ধান। মুখে বলল, 'এ কাজ শুরু হয় উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালের মে মাসের

পনেরো তারিখে। নেতৃত্ব দেন আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ড। এটা তাঁরই ডায়েরি।'

'পড়ো তো শুনি,' তিতকুটে চেহারা করল ববি। 'চিতার চামড়া হার্ভে পোলার্ডের লাইব্রেরির ফুটস্টুল হতো, নাকি প্রেমিকার বালিশের কভার, জানতে হবে আমার!'

'আমাদের রওনা হওয়া উচিত, নইলে বাস পাব না,' জানাল গান্টামুর।

'ডায়েরি পরে পড়ব,' শার্টের পকেটে রেখে দিল রানা, চলে গেল ফোকারের কাছে, শক্ত করে বন্ধ করে দিল দরজা।

'আমাদের মৃত বন্ধুদের কী হবে?' জানতে চাইল ববি।

'উলানবাটোরে পৌঁছে ডক্টর পাভেল রেদোরভকে ফোন দেব। উনি মঙ্গোলিয়ান সরকারকে জানাবেন এখানে পড়ে আছে বিমান ও লাশ। এরপর দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। মানুষগুলোকে নিয়ম মান্য করে কবর দেয়া উচিত।'

'বিশেষ করে হার্ভে পোলার্ডকে,' বলল ববি। 'এসবের জন্য জীবন দিয়েছেন উনি।' কাঠের বাক্সটা রেখে দিল ও স্যাডলের ব্যাগে।

ওরা নতুন করে বালি জড়ো করল দরজার সামনে, তারপর ফিরে এসে উঠল ঘোড়ার পিঠে। গান্টামুরের পিছু নিয়ে রওনা হলো। আবার সেই কাঠের স্যাডল! চেহারা কুঁচকে জানতে চাইল ববি, 'এমন হতে পারে না, রানা, ওই প্লেনে কোনও বিশেষ ক্রেট আছে? ভিতরে নরম দুটো বালিশ?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। হাসতে চাইল, মনে হলো ভেঙচি কাটছে। দ্রুত কদমে হাঁটছে ঘোড়াগুলো। একবার পিছন ফিরে চাইল রানা। ধুলো-বালির ভিতর লুকিয়ে পড়েছে ফোকার।

আনমনে ভাবল, এতকাল কোন্ তথ্য লুকিয়ে আছে ড়ক্টর পোলার্ডের ডায়েরিতে?

একঘণ্টা পর ছোট্ট এক বসতির ভিতর ঢুকল ওরা ঘোড়া নিয়ে। এটাই ওগোতাই গ্রাম। বেশিরভাগ মানচিত্রে পাওয়া যাবে না একে। শীর্ণ এক ঝর্নার দু'পাশে বেশ কিছু জার। সারাবছর বইছে ঝর্না, নইলে টিকত না স্থানীয় পশুচারকরা। প্রতি বছর খুঁজতে হতো ঘাসজমি। মঙ্গোলিয়ার এসব প্রত্যন্ত এলাকায় প্রচুর ঘোড়া ও উট রয়েছে, মানুষ নেই বললেই চলে।

রানা-ববিকে কমলা রঙের এক জারের কাছে নিয়ে গেল গান্টামুর, ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। এক খুঁটির সঙ্গে লম্বা এক দড়ি, ওটা দিয়ে জন্তুগুলো বেঁধে ফেলল। খানিক দূরে পিচ্চি ছেলে-মেয়েরা খেলছে। ফর্সা ববি ও বাদামি রানাকে দেখে খেলা থামল। তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার শুরু হলো দৌড়াদৌড়ি।

ঘোড়া থেকে নামল রানা ও ববি। মাতাল নাবিকের মত টলছে ববি, কাঠের স্যাডল ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। 'পরেরবার উটে উঠব,' বিড়বিড় করে বলল। 'ওই কুঁজে ওঠাই ভাল!'

এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে বলে খুশি রানা চারপাশ দেখছে।

'আপনারা মাত্র এক মৌসুম ঘোড়ায় চাপলে হয়ে উঠবেন আরাত,' বলল গান্টামুর। 'এখানে পাক্কা ঘোড়সওয়ারীদের বলে আরাত।'

'আরাত হবো কি না জানি না, তবে মাজাটা হয়ে যাবে কড়াৎ, আর পিছন দিক বলতে কিছুই থাকবে না,' নরম গলায়

বলল ববি।

প্রায় নাচতে নাচতে ওদের দিকে আসছেন বৃদ্ধ এক লোক। গাণ্টামুরকে কী যেন বলছেন।

'ইনি বাইচু বেলগুতাই,' বলল গাণ্টামুর। 'তাঁর জার দেখতে আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। এক পেয়ালা এইরেগ নিলে খুব খুশি হবেন।'

চারদিকের টিলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরছে নিচু এক আওয়াজ। খ্যার-খ্যার করছে ডিজেল ইঞ্জিন। হঠাৎ খানিক দূরের টিলার কাঁধে উঠে এল সবুজ এক বাস। গ্রামের দিকে আসছে, পিছনে ধুলোর মেঘ। ওটা দেখে আস্তে করে মাথা নাড়ল গাণ্টামুর, 'বাইচু বেলগুতাই-এর জারে যাওয়া চলবে না, বাস এসে গেছে।'

'আমাদের তরফ থেকে ওঁকে ধন্যবাদ দাও, অন্য কোনও দিন আসব আবার,' বলল রানা।

বৃদ্ধের সঙ্গে হাত মেলাল ওরা দু'জন।

বুঝতে পেরেছেন বাইচু বেলগুতাই, মাথা দুলিয়ে হাসলেন। দু'পাটি মাড়ির একটাতেও দাঁত নেই!

কাছে এসে ব্রেক কষেছে ড্রাইভার, ক্যাঁচর-ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে থেমে গেল বাস। টিপে ধরা হয়েছে হর্ন। খেলাধুলা শেষ, ছুটে এল বাচ্চারা, দেখতে দেখতে ছোট্ট একটা লাইন তৈরি হলো। বাসটা মুড়ির টিনের মত। দরজার দুই পাল্লা খুলে গেল। বাচ্চারা টপাটপ উঠে পড়ল বাসে।

'আসুন, এবার আমরা উঠব,' বলে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল গাণ্টামুর।

উনিশ শ' আশি সালে তৈরি রাশান বাস। কেএভিজেড

মডেল ৩৯৭৬। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ব্যবহার করত। আয়ু শেষ হওয়ায় মঙ্গোলিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রং চটে গেছে, বডি তোবড়ানো, জানালার কাঁচগুলো ফাটা। চাকাগুলো ন্যাড়া, বেরিয়ে এসেছে টায়ারের তার যেন শেষবারের মত নেমেছে রাস্তায়।

গাণ্টামুরের পিছু নিয়ে বাসে উঠল রানা ও ববি। তরুণ ড্রাইভারকে দেখে অবাক হলো রানা। একহাতে একতারা, নিচু স্বরে গাইছে ভাটিয়ালি গান। গাণ্টামুর গড়গড় করে কী যেন বলছে তাকে। একতারা রেখে দিল ড্রাইভার, বাসের দরজা বন্ধ করে দিল। গাণ্টামুর থেমে যেতে কয়েক মুহূর্ত রানা-ববিকে দেখল। ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'গাণ্টামুর বলছে আপনারা আমেরিকান?'

'আমার এই বন্ধু আমেরিকান, আমি তোমারই মত বাঙালি,' বলল রানা।

বাংলা ভাষা শুনে রীতিমত চমকে গেল ড্রাইভার। চকচক করে উঠল চোখদুটো। 'আপনি আমার দেশি ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও একদিন দেশে ফিরব,' চাপা স্বরে বলল ড্রাইভার। 'আর তিন বছর পর আমার চাকরি শেষ।'

'মঙ্গোলিয়ায় এলে কী করে?'

'কপালের ফেরে। আদম-ব্যাপারি বলল দক্ষিণ-কোরিয়ায় পাঠাবে। পাঠিয়ে দিয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। একটা চাকরি যে পাওয়া গেছে, তা-ই বেশি।'

'বাংলাদেশ এমব্যাসিতে জানাওনি?'

'কোনও কথা শুনতে চায় না। ঘাড় ধরে বের করে দিতে

চায়।' ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। 'বসে পড়ুন, রওনা হয়ে যাই। কপালটা ভাল, আজ দুটো মনের কথা বলতে পারব।'

আরেকবার হর্ন দিয়ে বাস ছাড়ল সে। রানা খেয়াল করল তার সিটের পিছনে শুয়ে আছে বিশাল এক কুকুর। গভীর ঘুমে মগ্ন। পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে এক কুড়ি ছেলে-মেয়েকে? ওকে পাহারা দেবে কে? নিজে বসল রানা ড্রাইভারের পাশে।

উটের পাল এড়িয়ে বেরিয়ে এল বাস। সমতল জমিতে পড়ে দেখতে দেখতে পঞ্চাশ মাইল গতি উঠল। 'আমার নাম মুহাম্মদ আশিক হোসেন,' বলল তরুণ।

'আমি মাসুদ রানা।'

'আপনারা যে আশ্রমে চলেছেন, সেটা কিন্তু হোটেল না। ঘোড়া না নিয়ে মরুভূমি দেখতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন?'

'প্রায় তা-ই।'

রানা ও আশিকের দিকে চেয়ে রয়েছে ববি। মৃদু হেসে নরম স্বরে বাংলা ভাষায় বলল, 'আমরা উলানবাটোরে ফিরতে চাই।'

'নিশ্চয়ই ফিরবেন,' ববিকে লুকিং গ্লাসে দেখল আশিক, একটু বিস্মিত। 'তার আগে জচি আশ্রমে একদিন থাকতে হবে। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকতে খারাপ লাগবে না। কাল সকালে উলানবাটোর থেকে ট্রাক আসবে, তখন ওতে করে রওনা হবেন।'

কাছাকাছি আরও তিনটি বসতি ছুঁয়ে গেল বাস, সব মিলে পঞ্চাশজন যাত্রী হলো। রানা-ববি ও ড্রাইভার আশিক ছাড়া সবাই নাবালক। মাঝে মাঝে এবড়ো-খেবড়ো জমি পড়ছে। জোর ঝাঁকি খেয়ে চলেছে বাস। রানা অবাক হয়ে দেখল, কুকুরটা কখনও কখনও শূন্যে উঠছে, আবার ধপ্ করে

নামছে—কিন্তু ঘুম ভাঙছে না তার!

'আপনারা যে আশ্রমে চলেছেন, তেমন অনেক আছে এদিকে,' অনেকক্ষণ পর বলল আশিক। 'শুনেছি উনিশ শ' একুশ সালে এ দেশে ছিল সাত শ' আশ্রম। তিরিশের দশকে কমিউনিস্টরা সব প্যাগোডা ভেঙে ফেলে, পুড়িয়ে দেয়। কয়েক হাজার ভিক্ষুকে গুম-খুন করা হয়। যারা রইল, তাদের বলা হলো, যদি মেনে নেয় সব ধর্ম মিথ্যা, খুন করা হবে না। বাধ্য হয়ে বহু মানুষ চুপ হয়ে গেল, কিন্তু মনে মনে ধর্ম পালন করতে থাকল।'

'তুমি তো খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলো,' বলল রানা।

মৃদু হাসল আশিক। 'একসময় লেখক হতে চেয়েছিলাম। হয়েছি ড্রাইভার। ...যাক গে, পরে নতুন করে আবারও প্যাগোডা তৈরি করল সবাই। যত পবিত্র কিতাব পেয়েছে, আগেই পুড়িয়েছে কমিউনিস্টরা। কিন্তু হাজার হাজার বইয়ের বেশির ভাগই খুঁজে পায়নি। ভিক্ষুরা আগেই ওগুলো সরিয়ে ফেলেছিল। বইগুলো ছিল মাটির নীচে। এখন আশ্রমগুলো চালু হওয়ায় প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে ধর্মীয় বই আর জিনিসপত্র, তৈজস।'

'স্কুল, বাস, ড্রাইভার, ডিজেল... খরচ দেয় কারা?' জানতে চাইল ববি।

'কয়েকটা এন.জি.ও। দুনিয়ার সব মানুষ তো খারাপ হয় না, এরা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। ওই যে গাণ্টামুরের কথাই বলি, ও তিনটে ভাষা শিখছে। অংক আর দাবায় ওর সঙ্গে কেউ পারে না। লেগে থাকলে একদিন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হবে।'

একটা খাড়া টিলার উপর উঠে এল বাস, মরুভূমি পিছিয়ে

গেল। সামনের পথ এঁকেবেঁকে নেমেছে সরু এক উপত্যকায়। টানা হাওয়ায় দুলছে ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা। এখানে ওখানে লালচে ঝোপঝাড়। উপত্যকার মাঝে কিছু পাথরের বাড়ি। দূর থেকে জায়গাটা ঘিঞ্জি মনে হলো। একপাশে কয়েকটা সাদা জার। কাছেই দড়ির এক করাল, ভিতরে উট ও ছাগল। দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটা জিপ-গাড়ি। বোধহয় এন.জি.ওর।

'জচি আশ্রমে সবাই সমাদৃত,' বলল আশিক। 'এখানে থাকেন বারোজন ভিক্ষু ও একজন লামা। এঁদের সতেরোটা উট আর কিছু ছাগল আছে। কয়েকজন মঙ্গোল খাবারের বিনিময়ে কাজ করে এখানে। এ ছাড়া আছে এন.জি.ওর কয়েকজন।' চাকার খাবড়া দাগ ভরা পথে নেমে চলেছে বাস। বড় এক জারের সামনে গিয়ে থামল। 'স্কুল শুরু হয়ে গেছে,' তাড়া দিল আশিক।

বাচ্চারা লাফিয়ে নামল, ওদের পর নেমে পড়ল রানা ও ববি। আগেই নেমেছে গাণ্টামুর, হাত নেড়ে বিদায় চাইল। বলল, 'আপনাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায়। ছেলেদের এখন ভূগোল পড়াতে হবে আমার। আপনারা বড় প্যাগোডায় চলে যান। ওখানে লামা আহ্ আলাগ্‌কে পাবেন। উনি ইংরেজি জানেন। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।'

'পরে আমাদের আবার দেখা হবে,' বলল ববি।

'মনে হয় না। আপনাদের সঙ্গে কথা বললে মন ভাল লাগে, কিন্তু বাচ্চাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। তারপর যাব আরেকটা গ্রামে। বাবার এইরেগ শেষ, কিনব।'

'এখানে পৌঁছে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'আসি।' জারের ভিতর ঢুকে পড়ল গাণ্টামুর।

ড্রাইভার আশিক ঘুমন্ত কুকুরটাকে জাগিয়েছে। বাস থেকে নেমে বিরাট হাই তুলল ওটা। গিয়ে ঢুকল ক্লাসরুমে। লেখাপড়া শিখতেই কি না, কে জানে! নাকি শেখাতে?

'সোজা চলে যান লামার কাছে,' বলল আশিক। 'থাকার ব্যবস্থা উনি করবেন। ...আমি যাই, অফিসারের সঙ্গে কথা বলি।' একটু দূরের এক সাদা জারের দিকে রওনা হলো সে।

'ভাল ছেলে,' বলল ববি, 'কিন্তু বাস চালায় পাগলের মত। পঞ্চাশ মাইলের নীচে কাঁটা নামাতে চায় না।'

দুটো জার পেরিয়ে তিনটে দালান, প্রাচীন মনে হলো। প্যাগোডার মত আকৃতি। চূড়াগুলো নীল সিরামিকের। মাঝেরটা আকারে প্রকাণ্ড। ওটাই প্রধান প্যাগোডা। ভিতরে বিশাল এক প্রার্থনা-কক্ষ। ডানদিকে একটা স্টোররুম। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার আগে জুতো খুলল রানা। ওর দেখা-দেখি ববি। পাথরে খোদাই দুটো প্রকাণ্ড ড্রাগন দু'দিকে। লেজদুটো মুচড়ে উপরে গিয়ে ছাতের কলাম হয়েছে। বারান্দা পেরিয়ে বিশাল দরজা। ঢুকল ওরা প্যাগোডার ভিতর। ঘরে গুনগুন আওয়াজ।

মৃদু আলোয় চোখ সয়ে আসতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। ঘরে জ্বলছে অনেকগুলো মোমবাতি। দরজার কাছ থেকে শুরু হয়ে পিছন-দেয়ালে গিয়ে মিশেছে চওড়া দুটো বেঞ্চ। ওপাশে বড়সড় এক বেদী। বেঞ্চ দুটোতে মুখোমুখি বসে বয়স্ক বারোজন ভিক্ষু, নিচু স্বরে প্রার্থনা করছেন। সবাই পদ্মাসনে, পরনে স্যাফ্রোনের আলখেল্লা। শ্লোক আউড়ে চলেছেন, ছেলা মাথাগুলো পাথরের মত স্থির, নড়ছে না একটু। রানা ও ববি পা টিপে টিপে ঘুরে দেখল প্যাগোডা। তারপর এক বেঞ্চির পিছনে গিয়ে বসল। বদলে গেছে শ্লোকের সুর, এবার বোধহয় প্রার্থনা শেষ হবে।

তিব্বতের লামারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, তাদের মতই ধর্ম-প্রাণ মঙ্গোলিয়ার ভিক্ষু ও লামারা। হাজার বছর ধরে এ দুই দেশের ধার্মিকদের যোগাযোগ রয়েছে। মঙ্গোলিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার উৎসাহ দেয়ায় দেশের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ লামা ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে তারা প্রত্যন্ত এলাকার আশ্রমগুলোতে, দেহ-মন পবিত্র রাখতে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছে। কমিউনিস্ট আমলে উপড়ে ফেলা হয় বুদ্ধের ধর্ম, তবে এখন নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ উৎসাহে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছে।

প্যাগোডার ভিতর শান্ত সমাহিত পরিবেশ। চুপচাপ বসে রইল রানা ও ববি। নীরবে প্রার্থনা চলছে। শত শত বছর ধরে এ শ্লোকগুলো চলছে। আগরবাতির মৃদু সুবাস শ্বাসের সঙ্গে ঢুকছে। মোমবাতির আলোয় প্যাগোডার চারদিক দেখছে ওরা। ছাতটা টকটকে লাল রঙের। পাথরের দেয়াল থেকে ঝুলছে অসংখ্য ব্যানার। একটু পরপর কুলুঙ্গি, তাতে বুদ্ধের মূর্তি—নানান জন্মের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ছোট কিছু বেদির উপর পদ্মাসনে বসেছেন বুদ্ধ। বিড়বিড় করে শ্লোক বলছেন লামা। তাঁর মত করেই বলছেন ভিক্ষুরা, সামনে প্রার্থনার বই। ধীরে ধীরে স্বর উঁচু হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর গমগম করতে লাগল প্রার্থনা-কক্ষ। তারপর হঠাৎ ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি ড্রামে আঘাত করলেন লামা। ভিক্ষুরা হাতে তুলে নিয়েছেন ব্রোঞ্জের ঘণ্টি, টিন-টিন-টিন-টিন শব্দে ভরে উঠল ঘর। কয়েকজন শাঁখ বাজিয়ে চলেছেন। এত আওয়াজ, রানা ও ববির মনে হলো চার-দেয়াল ধসে পড়বে। তারপর যেন অদৃশ্য কেউ হাত তুলল, হঠাৎ থামল সমস্ত আওয়াজ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। চারপাশ নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসীরা ধ্যানে ডুবে গেছেন। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য,

তারপর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়লেন সবাই।

ড্রাম নামিয়ে রাখলেন লামা, পুরু কাঁচের চশমা পরে নিলেন, তারপর রানা ও ববির দিকে এগিয়ে এলেন। বয়স তাঁর আন্দাজ নব্বুই। তবে সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটছেন। বাদামি দু'চোখে বুদ্ধির ঝিলিক ও উষ্ণতা।

'আপনারা সেই দুই আগন্তুক, যাঁরা হারিয়ে যান মরুভূমিতে,' আড়ষ্ট উচ্চারণে ইংরেজি বললেন। 'আমি আহ্ আলাগ। স্বাগত এ প্যাগোডায়। আজকের প্রার্থনায় আপনাদের জন্য দোয়া করব আমরা। যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন।'

'মাফ করবেন, অনুমতি না নিয়েই আপনাদের প্যাগোডার ভিতর ঢুকেছি,' বলল রানা।

অবাক হয়েছে ববি, ভদ্রলোক কী করে জানলেন এখানে এসেছে ওরা!

'এটা কেবল আমাদের নয়, আপনাদেরও প্যাগোডা। কেউ জ্ঞান চাইলে, স্রষ্টা তা দেন,' রানা ও ববির দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন লামা। 'আসুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।' আগে হাঁটছেন উনি, রানা-ববিকে সঙ্গে নিয়ে প্যাগোডার পিছন দিকে চলেছেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'এ প্যাগোডা তৈরি হয় আঠারো শতকে। কমিউনিস্ট আমলে এখানে যারা ছিল, তাদের ভাগ্য ভাল, তাদেরকে খুন করা হয়নি। সরকারী লোক এসে উট ও ছাগল সব মেরে ফেলে, খাবারের গুদাম পুড়িয়ে দেয়, ভিক্ষুদের তাড়িয়ে দেয়। কেন জানি না, প্যাগোডা নষ্ট করেনি। কয়েক দশক পড়ে ছিল। স্থানীয় পশুচারকরা আগেই বইপত্র সরিয়ে নেয়। সব পুঁতে রাখা হয় এক বালির ঢিবির নীচে। এরপর যখন পাল্টে গেল সরকার, নতুন করে আশ্রম খুললাম আমরা।'

'এ প্যাগোডা দেখে মনে হয় না অত পুরানো,' বলল ববি।

'গোপনে সন্ন্যাসী ও স্থানীয় লোকজন নিয়মিত মেরামত করে রেখেছে। সবাই জানত আজ হোক বা কাল, অধর্মের শাসন একদিন শেষ হবে। সেই সরকারের কিছু লোক অতি আগ্রহী ছিল: ধ্বংস করে দেবে সব ধর্মশালা। কিন্তু তাদের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখত সবাই। টিকে রইল প্যাগোডা, কিন্তু আগের মত করে চালু হতে বহুদিন লাগবে।' হাতের ইশারায় একদিক দেখালেন লামা। ওখানে বাড়ি বানানোর জন্য বালি, সিমেন্ট ও রড রাখা হয়েছে। 'আমরা এখন থাকছি জার-এ। তবে একদিন বড় দালান উঠবে।'

'আপনারা এই ক'জন পারবেন?' জানতে চাইল ববি।

'আমরা তেরোজন। এ ছাড়া অনেকে আসে অতিথি হয়ে। তারা সাহায্য করবে। কিছুদিনের মধ্যে ছোট একটা দালান তুলব আমরা। তখন বাড়তি দশজন ভিক্ষু থাকতে পারবে।'

প্রধান প্যাগোডার কাছেই ছোট এক দালান, রানা-ববিকে সেখানে নিয়ে এলেন লামা। 'আপাতত স্টোররুমে থাকবেন আপনারা। ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্টদের একটা দল এসেছে এখানে। মরুভূমির ভিতর কাজ করছে। তাদের কট্‌গুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আগামীকাল সকালে রসদের ট্রাক আসবে। ওটায় চেপে ফিরতে পারেন। কালকেই ফিরতে চান তো?'

'জী,' বলল রানা। 'উলানবাটোরে ফিরব।'

'ড্রাইভারকে জানিয়ে রাখব। আপনারা বিশ্রাম নিন। আমি চলি, ছেলেমেয়েদের ধর্মের ক্লাস নেব। সূর্য ডুবলে চলে আসবেন, একসঙ্গে রাতের খাবার খাব।' প্যাগোডার দিকে হেঁটে গেলেন লামা। হাওয়ায় উড়ছে তাঁর জাফরানি আলখেল্লা।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে গুদামে ঢুকল রানা ও ববি। সরু একটা ঘর, কোনও জানালা নেই। ছাত অনেক উঁচু। দরজার কাছে প্রকাণ্ড এক লোহার ঘণ্টি। ওটাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কয়েকটা বস্তা। ময়দা, নুডল্‌স, চা ইত্যাদির। উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে কম্বল ও আলখেল্লার চাঁই। তীব্র শীত পড়লে লাগবে। ঘরের পিছন দিকে ক্যানভাসের কয়েকটা খাটিয়া।

'অবাক লাগছে, লামা কী করে জানলেন এখানে এসেছি,' বলল ববি।

'এ মরুভূমি খুব বড় না,' বলল রানা। 'সেটাই ভয়ের কথা। সবার খবর সবাই জেনে যায়।'

'ভাল দিকটা হচ্ছে, মেঝেতে শুতে হবে না,' বলল ববি। 'প্রচুর বিশ্রাম নেব। না শুলে আর চলছেই না! ট্রাক আসতে দেরি আছে। দেখি এসব কটের ছারপোকাগুলো কতটা ডেঞ্জারাস।' দেরি না করে একটা খাটিয়ায় সটান হলো ও।

'শোয়ার আগে কিছু পড়তে পারলে ভাল লাগবে,' বলল রানা। দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল। অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই শুনল নাকের গুরুগম্ভীর গর্জন।

বাইরে সিঁড়ির ধাপে বসল রানা, চেয়ে রইল প্রাচীন প্যাগোডা ও সবুজ উপত্যকার দিকে। এই স্বর্গের ওপাশে আবারও রুক্ষ-বিরান মরুভূমি ও পাহাড়-টিলা। ওর জীবন যেন ঠিক তেমনই! সুনীল ঝর্না ও সবুজ অরণ্যের ওপাশে যেমন শুধু হাহাকারে ভরা ঊষর মরুভূমি। কোনও মরুদ্যানে ঘর বাঁধা হলো না। জীবনটা কোথাও স্থির হলো না, কেবল ছুটছে এখান থেকে ওখানে, তারপর আবার অন্য কোনওখানে। ছন্নছাড়া। ...অদ্ভুত!

কত মেয়ে পাশে এসে থমকে দাঁড়াল, আবার চলেও গেল। না পারল কাউকে আঁকড়ে ধরে রাখতে, না পারল থামতে। এ পথ ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে? কোথাও একটু মরুদ্যান, একটু স্বস্তি পাবে না? মাঝে মাঝেই বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস... শূন্য একটা অনুভূতি।

বুক-পকেট থেকে বের করল আর্কিওলজিস্ট হার্ভে পোলার্ডের ডায়েরি, পড়তে শুরু করল।

সাত

কয়েক লাফে সিঁড়ির ধাপ টপকাল গাণ্টামুর। 'আসি, মিস্টার রানা! আমার হয়ে মিস্টার মুরল্যাণ্ডকে বলবেন, বিদায়!'

ওর সঙ্গে হাত মেলাল রানা। অবাক হলো, ছোট্ট ছেলেটা কী করে যেন মনের দিক দিয়ে বড় হয়ে গেছে!

'হয়তো আবার দেখা হবে, গাণ্টামুর,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

'নিশ্চয়ই দেখা হবে!' হেসে ফেলল গাণ্টামুর। 'পরেরবার উটে চড়বেন মিস্টার মুরল্যাণ্ড।' একবার হাত নেড়ে ফিরতি পথ ধরল ও। ছুটে চলেছে বাসের দিকে। চট্ করে গিয়ে উঠে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সগর্জনে রওনা হলো বাস। টিলা বেয়ে দিগন্তে ঝুলে থাকা অস্তগামী সূর্যের দিকে চলেছে।

বাসের বিশ্রী আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে ববির, বেরিয়ে এল

বারান্দায়। আড়মোড়া ভাঙল। 'গান্টামুর বাচ্চাদের নিয়ে রওনা হলো?'

'বিদায় জানাতে এসেছিল। বলে গেল, পরের অভিযানে ওদের সেরা উটে তোমাকে চড়তে দেবে।' ডায়েরিতে নাক গুঁজে দিল রানা। প্রতি পাতায় বিস্মিত হচ্ছে।

'আর্কিওলজিস্টের প্রেম-জীবনের ইতিহাস?'

'না, অন্য এক অবশ্বাস্য ইতিহাস,' বলল রানা।

বন্ধুর চোখে গাম্ভীর্য দেখে পাশে বসল ববি। 'কী লিখেছেন?'

'এক সহকারী আর চায়নিজ একদল শ্রমিক নিয়ে হারিয়ে যাওয়া এক শহর খুঁজে বের করেন হার্ভে পোলার্ড। ওটার নাম ছিল শাং-তু।'

'নাম শুনিনি আগে।'

'পশ্চিমা বিশ্বের কবিরা রোমান্টিক নাম দিয়েছে... সানা-ডু।'

'ওই একটা নামই তো যথেষ্ট ছিল,' বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ববি। 'যতসব পাগলামি। যাকগে, ইনি আরেকটা শহর পান? সত্যিই আছে শহরটা?'

'আছে। ওটা তৈরি হয়েছিল কুবলাই খানের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য। ওখানে ছিল তাঁর প্রিয় প্রাসাদ। বেইজিং থেকে এক শ' বিশ মাইল উত্তরে। গরমকালে পালিয়ে যেতেন ওখানে। চারদিকে তৈরি করা হয়েছিল অপূর্ব সুন্দর বনভূমি। শিকার করবার জন্য ছেড়ে রাখা হতো নানান জন্তু-জানোয়ার। গড়ে উঠেছিল এক আধুনিক শহর। লোক সংখ্যা ছিল এক লাখ। তবে হার্ভে পোলার্ড ওটার ধ্বংস-স্তূপ পান। ধুলো, পাথর আর খোলা প্রান্তর ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।'

'প্লেনে যে আর্টিফ্যাক্ট ছিল, সব কুবলাই খানের আমলের?

ওরেব্বাপ! সে তো কোটি ডলারের কারবার। তবে সব ভেঙে চুর চুর। আর দাম নেই।'

'কিছু আছে, ভাঙেনি। ...ওগুলো পেয়ে সন্তুষ্ট হননি পোলার্ড। লিখেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাননি। কিন্তু চলে আসবার আগের দিন সত্যিই অন্য কিছু মিলেছিল।'

'কী সেটা?'

বারান্দার উপর বাক্সটা রেখেছে রানা, হাতে তুলে নিল। আস্তে করে খুলল। ভিতরে শুয়ে রয়েছে টিউব ও চিতার চামড়া। চামড়াটাই আগে তুলে নিল রানা। 'এটার কথা প্রায় কিছুই লেখেননি পোলার্ড। তবে খেয়াল করো।' জিনিসটার ভিতর অংশ মেঝের উপর বিছিয়ে দিল। চৌকো ঘর কেটে আঁকা হয়েছে আটটি ছোট ছবি। প্রথম ছবিতে বিরাট এক চায়নিজ জাঙ্ক নদীতে দাঁড় বেয়ে চলেছে, পিছনে ছোট দুটো জাঙ্ক। পরেরগুলোতে দেখা যাচ্ছে জাহাজ তিনটে সমুদ্রে ভেসে চলেছে। একটা ছবিতে নোঙর ফেলেছে ওগুলো কোনও এক উপসাগরে। শেষ ঘরে দেখা যাচ্ছে, আগুনে পুড়ছে বিরাট জাঙ্ক। মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে রাজকীয় পতাকা। জাহাজের পাশে, তীরে নামানো হয়েছে অসংখ্য বাক্স। চারপাশে লেলিহান আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে।

'দেখে মনে হচ্ছে, অভিযান শেষে জাহাজে আগুন ধরে যায়,' বলল ববি। 'প্রতিপক্ষের কাজ হয়তো। গ্রিক ফায়ার। হতে পারে দাবানলের কাছেই নোঙর ফেলেছিল জাহাজ। জঙ্গল জ্বলছিল। বাতাসে ভেসে আসছিল ছাই আর আগুন। ...এ-ব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা দেননি ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট?'

'না। মনে হয় খেয়াল করেননি ছবিগুলো।'

'আর এই বাক্স? কিছুই লেখেননি?'

'এ বাক্সের কোনও গুরুত্ব নেই। আসল এই টিউব। বা বলা উচিত, টিউবের ভিতরে যা ছিল, সেটা। ভিতরে মুড়িয়ে রাখা হয় সিল্কের একটা স্ক্রল। ওতে ছিল বিপুল গুপ্তধনের হদিস।'

'আমরা ফাঁকা টিউব পেয়েছি। তোমার কি মনে হয় জিনিসটা এখনও পোলার্ডের সঙ্গে? বা প্লেনে?'

'শেষ তিন পরিচ্ছেদে পোলার্ড কী লিখেছেন দেখো,' বন্ধুর দিকে ডায়েরিটা বাড়িয়ে দিল রানা।

একটু ঝুঁকে বসল ববি, পড়তে শুরু করল:

৯ আগস্ট, ১৯৩৭। প্লেনে চেপে চলেছিলাম উলানবাটোরে। ...ইশ্, ফেটে যাচ্ছে বুকটা আমার। ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। বেসুদাইর, আমার সহকারী, বিশ্বস্ত বন্ধু; শেষ পর্যন্ত আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সিল্কের স্ক্রলটা উধাও! ক্যানিস্টার থেকে ওটা বের করে নিয়েছে ও। আমি আর ও ছাড়া অন্য কেউ জানত না কী আছে ওতে। প্লেনে ওঠার আগে কীভাবে যেন ওটা সরিয়ে ফেলেছে বেসুদাইর। জি.কে-র সূত্র হারিয়ে ফেলেছি... যদি প্রতিশোধ নিতে পারতাম... গুলি করছে কারা যেন...

বাক্যটা অসমাপ্ত। তারপর আবারও লেখা হয়েছে কাঁপা হাতে। ধুলো ভরা পাতা। টপটপ করে ঝরেছে রক্ত।

তারিখ জানি না। জাপানি যুদ্ধ-বিমান আমাদের গুলি করে ফেলে দিয়েছে মরুভূমির উপর। দুই পাইলট মারা গেছে। বোধহয় আমার মেরুদণ্ড আর ডান পা-টা ভেঙে গেছে। নড়তে পারছি না। কারও সাহায্য পাব আশা করছি। বারবার ঈশ্বরের কাছে

প্রার্থনা করছি, যেন দ্রুত উদ্ধার করে। এত ব্যথা সহ্য করা যায় না।

শেষ পরিচ্ছদে আঁকাবাঁকা লেখা:

বোধহয় শেষবারের মত লিখছি। সব আশা শেষ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জিনিস পৌছে দিতে পারলাম না। আমি দুঃখিত। অনেক ভালবাসা রইল আমার প্রিয় স্ত্রীর জন্য। এমা, ভাল থেকো। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

'বেচারা,' ডায়েরি থেকে চোখ তুলল ববি। 'বুঝলাম কেন মেঝের উপর পড়ে ছিলেন। মারা যাওয়ার আগের কয়েকটা দিন খুবই কষ্ট করেছেন।'

'প্রচণ্ড ব্যথা, সেইসঙ্গে বুক-ভরা হাহাকার, বারবার ভেবেছেন কী হারিয়েছেন।'

'সিল্কের ম্যাপে কীসের গুপ্তধন? কে এই জি.কে.?'

'ডায়েরির মাঝামাঝি এসে স্ক্রলের বর্ণনা দিয়েছেন পোলার্ড। নিশ্চিত ছিলেন তিনি। বেসুদাইর-ও। ওটা ছিল গোপন সমাধিস্থলে যাওয়ার পথ-নির্দেশনা। জায়গাটা মঙ্গোলিয়ার খেনতি পর্বতে। ওই স্ক্রলে রাজকীয় চিহ্ন ছিল। শত শত বছর ধরে একটা কাহিনি চলে আসছে—এক উট ওই সমাধির ভিতর ঢুকে পড়ে। সন্তান মারা যায় ওটার, তাই কাঁদছিল। ওই সিল্কে লেখা ছিল কী ভাবে ঢোকা যায় চেঙ্গিস খানের সমাধি-ক্ষেত্রে।'

নিচু স্বরে শিস বাজাল ববি, আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'চেঙ্গিস খান, না? যে-ই হোক, সে পোলার্ডের হাতে নকল ম্যাপ

গছিয়ে দিয়েছে। বুড়ো চেঙ্গিসকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর্কিওলজিকাল ইতিহাস বলছে ওই সমাধি দুনিয়ার সব চেয়ে বড় রহস্য। ওটা কোথাও নেই।'

'যদি থাকে?

'থাকলে কী? আমার অংশের সব তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

'পরে কাঁদবে না তো?'

'কক্ষনো না,' মজা পেয়ে হেসে ফেলল ববি। 'আবিষ্কার করে নাও সমস্ত ধন-রত্ন। কোনও আপত্তি নেই। তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই চিতার চামড়া দিয়ে বানিয়ো দু' পাটি জুতো।'

'তা হলে আমার সংগ্রহে থাকবে ওটা।' উপত্যকা পেরিয়ে বহুদূরে চলে গেল রানার চোখদুটো। পাহাড়ের উপর উড়ছে ধুলো। অসংখ্য চিন্তা আসছে মনে। কয়েক মুহূর্ত পর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'একটু ভুল বললে, ববি। চেঙ্গিস খানের সমাধি পাওয়া গেছে।'

ফাঁকা চোখে বন্ধুর দিকে চাইল ববি। থমকে গেছে। ভাল করেই জানে, রানা বাজে কথা বলবার লোক নয়!

ডায়েরির শুরুতে একটা এণ্ট্রি খুঁজছে রানা। ওটা পেয়ে ববির হাতে দিল।

'পোলার্ডের সহকারী ছিল মঙ্গোলিয়ান, নাম বেসুদাইর। তার নামের শেষে ছিল তেমুজিন। চেঙ্গিস খানের বংশের নাম বোরজিন।'

'ওই লোক একই বংশের? মনে হয় না।' চমকে গেছে ববি। 'এই বেসুদাইর কি জালাইর তেমুজিনের দাদা?'

'সন্দেহ নেই। ক'দিন আগে তার কবর থেকে ঘুরে এসেছি আমরা।'

'ওই প্রাসাদের পিছনে পাথরের ছোট প্যাগোডা? ওখানে দুটো প্রকাণ্ড কবর দেখেছি। এ ছাড়াও কয়েকটা ছোট কবর...'

নিচু স্বরে বলল রানা, 'ওই সমাধির ভিতর ঘুমিয়ে আছেন সম্রাট চেঙ্গিস খান—জালাইর তেমুজিনের বাড়ির ঠিক পিছনে!'

খবরটা হজম করতে বেশ অনেকটা সময় নিল ববি। থম ধরে বসে থাকল কয়েক মিনিট।

সূর্য ডুবতে সাদা এক জারে নিয়ে যাওয়া হলো রানা ও ববিকে। অপেক্ষা করছিলেন লামা। ওরা বসতে পরিবেশিত হলো অতি সাধারণ খাবার—সামান্য সবজি, নুডল্‌স্ আর কড়া কালো চা। নিঃশব্দে মুখ নাড়ছেন ভিক্ষুরা। অনুসারীদের দু'এক কথা বলছেন লামা। জবাবে চলছে মাথা দুলুনি। এ ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ। খাওয়ার ফাঁকে সবাইকে দেখছে রানা। মানুষগুলো গম্ভীর, যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। বেশিরভাগ ষাটোর্ধ্ব, তবে খয়েরী চোখে অন্তর্ভেদী চাহনি। সবারই পরনে গেরুয়া পোশাক, এক যুবক ছাড়া সবার মাথা কামানো। দ্রুত খাওয়া শেষ করল যুবক, বার বার চাইছে ওদের দিকে, চোখে চোখ পড়লেই সরিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টি।

ধীরে-সুস্থে খাওয়া শেষ করল রানা। প্রার্থনা শুনতে আমন্ত্রণ জানালেন লামা। গিয়ে বসল ওরা প্যাগোডার ভিতর। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হলে ফিরল গুদাম-ঘরে। রানার মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে হার্ভে পোলার্ডের লেখাগুলো। যত দ্রুত সম্ভব উলানবাটোরে ফিরতে হবে এখন।

বদ্ধ ঘরে যে-যার চিন্তায় ডুবে রইল ওরা। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। ফিসফিস করছে হাওয়া। আর কোনও আওয়াজ নেই।

সবাই বোধহয় শুয়ে পড়েছে।

খানিক পর ওরা ঠিক করল, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে। দরজায় কোনও হুড়কো নেই। একটা কট দরজার কাছাকাছি টেনে নিয়ে রাখল রানা।

'মাথার উপর ছাত দেখে অস্বস্তি লাগছে?' ঠাট্টা করল ববি।

'না, জানিই তো শ্বেত-ভালুকের সঙ্গে খাঁচায় ঢুকেছি,' ববিকে একবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে চাইল রানা। 'অস্বস্তি অন্য কারণে।'

'গত ক'দিন ভাল-মন্দ কিছু খাইনি, এটা মনে রেখো,' কম্বলের ভিতর ঢুকে পড়ল ববি। ওখান থেকে জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'মাঝরাতে আমাকে নড়ে উঠতে দেখলেই কট থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় দিয়ো।'

তাক থেকে মাঝারি একটা বাক্স নামাল রানা। ভিতরে আগরবাতি ও অন্যান্য ধর্মীয় জিনিসপত্র। কী যেন খুঁজল কিছুক্ষণ, তারপর ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে রইল ওরা।

মাঝরাত পেরিয়ে যেতে এল সে। নিঃশব্দে স্টোর-রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। মেঝের উপর পড়ল চাঁদের চিকন আলো। দরজা বন্ধ করল না। চোখ সইয়ে নিতে অপেক্ষা করল আঁধারে। কিছুক্ষণ পর সামনের কটের দিকে এগোল। ঠুং করে কী যেন লাগল পায়ে! প্রার্থনার ছোট্ট একটা ঘণ্টি, গড়িয়ে পড়েছে। মৃদু শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো বদ্ধ ঘরে। শ্বাস আটকে অপেক্ষা করল আগন্তুক। প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক্কেকটা বছর! কান খাড়া করে রেখেছে। না, কোনও আওয়াজ নেই। থমথমে পরিবেশ।

জাগেনি কেউ।

উবু হয়ে বসে মেঝের উপর এক হাত বোলাল। ঘণ্টি পেয়ে আস্তে করে সরিয়ে রাখল। এবার পথ পরিষ্কার। ...না, তা নয়! তর্জনীর ডগায় আলতো ভাবে লেগেছে আরেকটা ঘণ্টি। ওটাও সরাল সে। আর একটু এগোলেই কট্। আবছা দেখা গেল কম্বল-মুড়ি দিয়ে এক লোক ঘুমিয়ে কাদা! উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগোল সে, দু'হাতে মাথার উপর তুলল তলোয়ার—পরক্ষণে স্যাৎ করে নামিয়ে আনল ওটা!

কী ব্যাপার! মানুষ কই? কম্বল ভেদ করে কটের ফ্রেম কেটে ভিতরে ঢুকে গেছে ফলা। আঁৎকে উঠল আততায়ী, বিস্ফারিত চোখে এদিক ওদিক খুঁজছে বিপদ।

ততক্ষণে আরেক কট থেকে লাফিয়ে নেমেছে রানা, ছুটে এসেছে—হাতে কাঠের হ্যাণ্ডেলওয়ালা ভারী কোদাল। দালান তৈরির জন্য বাইরে রাখা ছিল, সন্ধ্যায় ভেতরে নিয়ে এসেছে।

রুপালি জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলেছে গুপ্ত-আততায়ীর অবয়ব। তিন ফুট দূরে দাঁড়িয়ে উল্টো করে কোদালটা চালাল রানা। কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে মেরেছে, কিন্তু লাগাতে পারল না শত্রুর মাথায়, সে তখন কাঠে গেঁথে যাওয়া তলোয়ারটা টেনে খুলে আনবার জন্য নিচু হয়েছে।

রানার পদ-শব্দ আগেই শুনেছে সে, এখন কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে কিছু একটা চলে যেতেই সচকিত হয়ে একটানে কট থেকে খুলে নিল তলোয়ার। পরমুহূর্তে উপরে তুলেই নামিয়ে আনতে চাইল সামনে দাঁড়ানো ছায়ার মাথায়। কিন্তু আঁধারে বিদ্যুৎ-বেগে সরে গেছে রানা। কোদালের ভারী পাত প্রচণ্ড জোরে নামল লোকটার তলোয়ার ধরা মুঠোর উপর। বিশ্রী

মুটমুট আওয়াজ তুলে থেঁতলে গেল হাড়-মাংস। প্রাণ কাঁপিয়ে দেয়া বীভৎস এক চিৎকার বেরিয়ে এল লোকটার কণ্ঠ চিরে!

কাঠের মেঝের উপর ঠকাস্ করে পড়ল তলোয়ার। ভয়ঙ্কর চিৎকার থামছে না। বামহাতে ডান মুঠো ধরে পালাতে চাইল। ঘুরেই দৌড় দিল দরজার দিকে। আবারও কোদাল তুলল রানা, মাথা লক্ষ্য করে চালাল। তবে আওতার বাইরে চলে গেছে সে। একলাফে মাঝখানের কট্ পেরুল রানা, কোদাল ছুঁড়ল খুনির পিঠ লক্ষ্য করে। এবারও মিস্! ধীরে সুস্থে তলোয়ারটা তুলে নিল ববি। বুমেরাঙের ভঙ্গিতে ছুঁড়ল সে ওটা আগন্তুকের দিকে। এক লাফে দরজা ডিঙাতে যাচ্ছিল লোকটা, তলোয়ারের ফলা গেঁথে গেল ওর ডান গোড়ালির পিছনে।

বাচ্চা কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল খুনি, আঁধারে হারিয়েছে ভারসাম্য। পড়ে যাচ্ছে, তখনও আহত আঙুল ধরে রেখেছে ডান হাতে, বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ল গিয়ে ঘণ্টির উপর। ঠং করে কপালে লাগল ধাতব ঘণ্টির চোখা মাথা। ঠিক যেন ক্রিকেট ব্যাট ফাটল। জোরাল আওয়াজ পেল রানা। পরমুহূর্তে মেঝের উপর থ্যাপ্ করে পড়ল লোকটার শিথিল দেহ।

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ববি, এক লাথিতে খুলল দরজা। ভিতরে ঢুকল চাঁদের উজ্জ্বল আলো। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে আগন্তুক, ঘাড়টা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মোচড়ানো।

স্থির দেহটা পরীক্ষা করল ববি, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ঘাড় মটকে গেছে।'

'মারতে এসে নিজেই মরেছে,' কোদালটা তুলে নিল রানা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। কুড়িয়ে নিল তলোয়ার। বলল, 'ব্যাটা জালাইরের গার্ডদের একজন।'

বারান্দার উপর আলো পড়ল। লণ্ঠন হাতে লামা ও দুই ভিক্ষু এসে ঢুকলেন ঘরে।

'চিৎকার শুনতে পেয়েছি,' বললেন লামা। মেঝের উপর পড়ে থাকা দেহটা অবাক হয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। যুবকের জাফরানরঙা আলখেল্লা খানিকটা সরে যাওয়ায় নীচ থেকে বেরিয়ে পড়েছে গার্ডের পোশাক। এ তবে কপট সন্ন্যাসী। চেহারাটা ভাল করে দেখেই চিনে ফেললেন লামা। নীরস কণ্ঠে বললেন, 'বাটুশিগ। মারা গেছে।'

'আমাদের খুন করতে এসে নিজেই মরেছে,' বলল রানা, তলোয়ার বাড়িয়ে দেখাল। ইশারা করল কটের দিকে। কম্বল দুই টুকরো। 'পালাতে গিয়ে পড়েছে ঘণ্টির উপর। খুঁজলে হয়তো এর কাছে আরও অস্ত্র পাওয়া যাবে।'

এক ভিক্ষুকে কী যেন বললেন লামা। উবু হয়ে বসলেন তিনি, লাশের আলখেল্লা চাপড়ে দেখছেন। কাপড়ের এক অংশে থেমে গেল হাত, বের করে আনলেন একটা ড্যাগার ও ছোট্ট একটা অটোমেটিক পিস্তল।

'আমাদের ধর্ম এসব সঙ্গে রাখতে বারণ করে,' আহত কণ্ঠে বললেন লামা।

'এই লোক কবে আশ্রমে এসেছে?' জানতে চাইল রানা।

'এই তো, আপনারা আসার কয়েক ঘণ্টা আগে। বলল: উত্তর প্রদেশের ওরহোন থেকে এসেছে। মনের শান্তির জন্য গোবি মরু পেরিয়ে চলেছে বহু দূর।'

'সত্যি, বহু দূরেই গেছে,' তিক্ত স্বরে বলল ববি।

একটা প্রসঙ্গ মনে পড়েছে লামার, সন্দেহ নিয়ে রানা ও ববির দিকে চাইলেন। 'এ যখন আসে, জানতে চায় দুইজন

বিদেশি মরু পেরিয়ে এদিকে এসেছিল কি না। বলি: আসেনি, তবে জোর সম্ভাবনা আছে, আসবে। শহরে ফিরতে হলে ট্রাকে চেপে যেতে হবে। সে ট্রাক আসে শুধু এখানে। কথাগুলো শুনবার পর বলল, কয়েকদিনের জন্য এখানে থামতে চায়।'

'কাজেই আপনি জানতেন আমরা এখানে আসব,' বলল ববি।

'হ্যাঁ, তা-ই। কিন্তু আপনাদের খুন করতে চাইল কেন?'

রানা সংক্ষেপে জানাল, কয়েকজন সঙ্গীকে খুঁজতে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের এলাকায় ঢোকে ওরা, তারপর পালাতে বাধ্য হয়। 'এ নিশ্চয়ই জালাইর তেমুজিনের লোক।'

'অর্থাৎ ভিক্ষু নয়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'খুনের চেষ্টা অন্য কথা বলে, তা-ই না?'

'আমাদের নিয়ম-কানুনের অনেক কিছুই জানত না,' বললেন লামা। ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছেন। সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন, 'আশ্রমে খুন বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে। কর্তৃপক্ষের কাছে কী বলব আমরা? হাজারো কথা তুলবে পুলিশ।'

'বলবেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে,' বলল রানা।

'আমরা তদন্ত এড়াতে পারলে ভাল হতো,' জানাল ববি।

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন লামা। 'এটা তো সত্যিই দুর্ঘটনা। তা-ই বলব পুলিশকে। তবে আপনারা চলে যাওয়ার পর।' দুই ভিক্ষুকে কী যেন বললেন। তারা একটা কম্বল দিয়ে লাশ মুড়িয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল প্রধান প্যাগোডায়।

লামা বললেন, 'আপনারা এখানে এসে মরতে বসেছিলেন, এটা মেনে নেয়া কঠিন। আমি সত্যি দুঃখিত।'

'এ আশ্রমে এসে আপনাদের বিপদে ফেলে দিয়েছি, সেজন্য আমরাই বরং ক্ষমাপ্রার্থী,' বলল রানা।

'বাকি রাত শান্তিতে কাটুক আপনাদের,' বললেন লামা। প্যাগোডার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। মৃতের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করবেন সবাইকে নিয়ে।

'ভাল গোয়েন্দাগিরি দেখিয়েছ,' বলল ববি। দরজা বন্ধ করল ও। 'জানলে কী করে ভিক্ষুদের মধ্যে নকল কেউ আছে?'

'আন্দাজ করেছি। অন্যদের সঙ্গে ওর অনেক তফাৎ ছিল। রাতের খাওয়ার সময় আর সবার মত ভাবগম্ভীর আচরণ ছিল না, ধূর্ত চোখে চাইছিল এদিক ওদিক। এখানে জালাইর তেমুজিনের আরও লোক থাকতে পারে।'

'মনে হয় না, তবে বাকি রাত আমার। চলে?' ভ্রূ নাচাল ববি।

'কীসের চলাচলি?'

'কোদালের গুরু-দায়িত্ব আমি নিচ্ছি,' জিনিসটা হাতে তুলে নিল ববি, নিজের কটের নীচে রেখে শুয়ে পড়ল।

সকাল প্রায় বিদায় নিয়েছে, এমনসময় হাজির হলো রসদের ট্রাক। ওটা থেকে নামানো হলো কাঁচা সব্জি ও শুকনো মালামালের কয়েকটা ক্রেট। বেশির ভাগ জিনিস ঠাঁই পেল গুদাম-ঘরে। কাজ শেষে প্যাগোডায় চলে গেলেন ভিক্ষুরা ধ্যান করতে। লামা যাননি, ট্রাকের ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করছেন। তৈরি হয়ে তাঁর পাশে এসে থামল রানা ও ববি।

'ড্রাইভার বলছে আপনারা সঙ্গে গেলে ভালই লাগবে তার। উলানবাটোর এখান থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ।'

'আতিথেয়তার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ,' বলল রানা। একবার প্যাগোডার দিকে চাইল। বারান্দার উপর

শুইয়ে রাখা হয়েছে কম্বল মোড়ানো লাশ। 'ওর খোঁজে কেউ এসেছে?'

'না,' মাথা নাড়লেন লামা। 'চারদিন পর সৎকার করা হবে লাশ। তবে ছাইগুলো এই আশ্রমে ঠাঁই পাবে না। সত্য-মুনির পবিত্র জ্ঞান ওর মনে গাঁথেনি। জ্ঞানী বুদ্ধ ওর জন্য নেই।' রানা ও ববির দিকে চাইলেন তিনি। 'আমার অন্তর বলছে আপনারা সজ্জন, সম্মানিত ভদ্রলোক। আশা করি ঠিক পথে চলবেন, আর অন্তর যা বলে তা মেনে নেবেন, তবেই পাবেন, যা খুঁজছেন।' মাথা ঝুঁকিয়ে মস্ত এক বাউ করলেন তিনি।

তাঁর সম্মানে পাল্টা মাথা ঝোঁকাল রানা ও ববি, তারপর উঠে পড়ল ট্রাকের ক্যাবে। পরস্পরের দিকে চাইল একবার ওরা। ঠোঁটে করুণ হাসি দেখা দিল। রানা ভাবছে, যদি ববির চেহারার এই অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তো ওরই মত! ড্রাইভারকে দেখে একটু স্বস্তি পেল। মঙ্গোলিয়ান মানুষটা প্রৌঢ়, সামনের দু' পাটির ছ'টা দাঁত নেই। ফোকলা হাসি দিল সে, ইঞ্জিন চালু করে ঘুরিয়ে নিল ট্রাক, ফিরতি পথে চলেছে।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন লামা, মাথা হেঁট হয়ে রয়েছে। ট্রাকের ধুলো লাগছে আলখেল্লা ও চটিতে। মাটির দিকে চেয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ।

টিলা বেয়ে উঠছে ট্রাক। চুপচাপ বসে রইল রানা ও ববি। ভাবছে কী বলেছেন বৃদ্ধ লামা। উনি যেন জানেন ওরা কেন এসেছে। এবং মানুষটি মন থেকে সায় দিয়েছেন।

'আবার ফিরব,' অনেকক্ষণ পর বলল রানা।

'কোথায়?' জানতে চাইল ববি।

আনমনে মাথা দোলাল রানা, 'নতুন সানা-ডু।'

আট

সারা গায়ে নীলের ছিট, যেন নীল সাজ পরেছে গ্রুপারটা, স্থির চোখে দেখছে সামনের ওই বড়সড় প্রাণীটাকে। ওটা বড় ধীরে নড়ছে। হাঙর হতে পারে না। চকচকে কালো চামড়া। ডলফিনও নয়। বিদঘুটে ভঙ্গিতে আসছে। লেজ বলতে কিচ্ছু নেই! বন্ধু বা শত্রু নয়, সিদ্ধান্ত নিল গ্রুপার। নিশ্চিন্ত মনে খাবারের খোঁজে রিফের আরেক দিকে চলল সে।

গ্রুপার মাছের দিকে খেয়াল নেই মেয়েটির। সাগরের মেঝেতে বিছিয়ে থাকা হলুদ নাইলন দড়ির উপর চোখ। ওটা অনুসরণ করবে সে। প্রবাল-প্রাচীরের পাশে থমকে গেছে হঠাৎ। একহাতে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা, ছবি তুলছে রঙিন রিফের। তবে মন অন্য কোথাও। ভাবছে, কোথায় গেল মানুষটা?

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রবাল-প্রাচীরের উপর গবেষণা করছে নুমা। দ্বীপগুলোর সেডিমেণ্টেশন, অতিরিক্ত মাছ-শিকার ও অ্যালজির আক্রমণে কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখছে এ সংগঠন। বিশ্বের তাপ বেড়ে যাওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে কোরাল রিফগুলো। অস্ট্রেলিয়া, ওকিনাওয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার চারদিকে ধ্বংস হচ্ছে প্রবাল-প্রাচীর। অবশ্য হাওয়াই-এর রিফগুলো ভালই আছে। তবে ক'দিন টিকবে, বলা যায় না।

মেয়েটি এ নিয়ে ভাবছে না। যমজ ভাইয়ের সঙ্গে এখানে এসেছে ও বেশ কয়েকদিন হলো। কিন্তু যার জন্য মন উতলা হয়ে উঠছে, সে মানুষটিই আসেনি! অবশ্য চুপচাপ বসে থাকবার মেয়ে নয় ও, নিজ কাজ করে চলেছে। সাগরের নীচে ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছে। ওগুলো কাজে লাগবে আগামী বছর। সে সময়ের রিফের সঙ্গে আজকের রিফ তুলনা করে দেখা হবে।

মিতা যার কথা ভাবছে, সে এক আশ্চর্য মানুষ। এ মানুষটিকে কখনও কখনও মনে হয় তার বড় কাছের কেউ, আবার কখনও মনে হয় বহুদূরের... কোমল-অনুভূতি বিবর্জিত কোনও রোবট বা কম্পিউটার। আশ্চর্য! কোনও মানুষ এত কাজ করতে পারে? হয়তো পলকে চলে যাবে দুনিয়ার অন্য কোনও প্রান্তে। ক'দিন পর আবার অন্য কোথাও! বা হয়তো মানুষটির খোঁজই পাওয়া যাবে না দিনের পর দিন, মাসের পর মাস!

সাগর-তলে ডুব দিয়ে থমকে গেছে মিতা, একই সঙ্গে ডুব দিয়েছে নিজ মনের গভীরেও। ওদের দুই ভাই-বোনের কী হতো ওই মানুষটি না থাকলে? বাবা মারা গেলেন হঠাৎ করে। মা তো আগেই গেছেন ক্যানসারে। আমেরিকায় এসেছে ওরা তিনবছর হয়নি তখন। বাবা মারা যাওয়ায় পার্টনার তাঁর সমস্ত সর্বস্ব আত্মসাৎ করল। ডিড অভ এগ্রিমেন্ট রেজিস্ট্রি হওয়ার আগেই টাকা ঢেলেছিলেন তিনি বিশ্বাস করে। সব দেশেই টাকাওয়ালা মানুষ আইনকে প্রভাবিত করতে পারে, আমেরিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। পুলিশ বা আদালত ওদের কথা শুনতে চাইল না। পথে নামল ওরা দুই ভাই-বোন। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। একটা শপিং মলে চাকরি নিতে হলো। ঠিক তখনই ওর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো বাঙালি ওই মানুষটির। বাংলাদেশি এবং ছাত্র

শুনে ওর ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন তিনি অনেক কিছু। তার ঠিক দু'দিন পর হাজির হলেন ওদের ছোট্ট ভাড়া ঘরে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব নিয়ে। শর্ত মাত্র একটা—যদি ওটাকে শর্ত বলা যায়—অনেক টাকা বেতন দেয়া হবে, চারঘণ্টা করে রিসেপশনে বসবে ওরা লস অ্যাঞ্জেলেসের রানা এজেন্সির দপ্তরে। তার বদলে, মন দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে নিতে হবে। ইউনিভার্সিটির প্রতি সেমিস্টারের বেতন তারা পেয়ে যাবে আগেই! এ প্রস্তাবে ওরা এত হতভম্ব হয়ে যায় যে প্রথমে বিশ্বাস করেনি। চলে যাওয়ার আগে মানুষটি বলেন, ওরা যদি রাজি থাকে, যেন রানা এজেন্সির ঠিকানায় যোগাযোগ করে। দু'দিন পর ফোন করল ওরা এজেন্সির শাখায়। তিনি ছিলেন না, তবে ওখানে সবাইকে সব বলা ছিল—চাকরিতে যোগ দিল ওরা পরের সপ্তাহে। এর পর থেকে মাসুদ ভাই যতবার এসেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসে, ওদের সঙ্গে দেখা করেছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন, কানও সমস্যা আছে কি না জানতে চেয়েছেন। ততদিনে দু'ভাইবোনের সীমাহীন শ্রদ্ধা জন্মে গেছে তাঁর প্রতি।

তার ঠিক চারবছর পর লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোরনিয়া থেকে বেরিয়ে এল ওরা মেরিন বায়োলজিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে। খুবই ভাল রেজাল্ট করেছে ওরা, তাই বেশ কয়েক জায়গা থেকে ভাল চাকরির অফার পেল—কিন্তু রানা এজেন্সির চাকরি তো চট্ করে ছেড়ে দেওয়া যায় না। দু'মাস অপেক্ষা করল ওরা মাসুদ ভাইয়ের জন্য। অফিসের কেউ বলতে পারে না তিনি কোথায়। রিসেপশনিস্টের চাকরিটা চালিয়ে গেল ওরা আরও আড়াই মাস। তারপর দুটো চিঠি পেয়ে চমকে গেল ওরা, ওগুলো এসেছে পৃথিবীর সেরা মেরিনলাইফ গবেষণা

প্রতিষ্ঠান নুমা থেকে—ইন্টারভিউ কার্ড। অথচ এখনও ওরা কোথাও অ্যাপ্লাই-ই করেনি!

মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল ওরা আবারও, তাঁর পরামর্শ চাইবে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অরূপ কামাল বললেন: খবর পেয়েছেন, শীঘ্রি আসছেন মাসুদ ভাই। পরামর্শ দিলেন, 'যাও না কেন, গিয়ে দেখো নুমা কী চায়।'

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ইণ্টারভিউ দিতে গেল মিতা ও রাশেদ। সকালে পরীক্ষা দিতে হবে রিটেন, বিকেলে ভাইভা ভোচি। রিটেন পরীক্ষায় অনেকে বাদ পড়ল। আর ওরা দুজন দুই নম্বরের তফাতে হলো প্রথম ও দ্বিতীয়। বিকেলে ভাইভায় সবার শেষে ওদের দুজনকে ডাকা হলো একসঙ্গে। রুমে ঢুকেই চমকে গেল ওরা—বিচারকদের মধ্যে বসে রয়েছেন মাসুদ ভাই! ভাব দেখে মনে হলো তিনি চেনেনই না ওদের, জীবনে দেখেননি কোনদিন। পাঁচজন বিচারক রয়েছেন, আরও কয়েকজন আছেন পর্যবেক্ষক। তাঁরাও এক-আধটা প্রশ্ন করলেন। কঠিন কয়েকটি প্রশ্ন করলেন মাসুদ ভাই, একটা ওকে, পরেরটা রাশেদকে। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল যমজ ভাই-বোন। কিন্তু ভাইভা শেষ করে সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটা কথা কানে এলো, যার ফলে মনের খুশি উবে গেল ওদের।

নিচুগলায় বিচারকদের একজন কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন। 'কী! ওই নিগার দুটো? ওদের নিচ্ছেন? আর আমার রিকমেণ্ডেড ক্যাণ্ডিডেট চাকরি পাবে না? আপনারা জানেন, আমি ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর? আমি চাইলে...'

'স্যার, প্লিজ, উত্তেজিত হবেন না।'

'চুপ্ করুন! আমাকে কী মনে করেছেন আপনারা? আমার কথার কোনও দাম নেই? যাকে খুশি...'

নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে কেউ কিছু বললেন। আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন সিনেটর, 'প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের কাছে যাব আমি!'

যা বুঝবার বুঝে নিল মিতা ও রাশেদ। চাকরি হবে না ওদের। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। কিন্তু দুদিন বাদেই আরেকবার বিস্মিত হতে হলো। ওদের ঠিকানায় এসে পৌঁছল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

কী ঘটেছিল সেটা পরে নুমার কলিগদের কাছে শুনেছে মিতা।

সিনেটরের চোটপাট দেখে ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রায় সবাই মেনেই নিয়েছিলেন, ওই যোগ্য ছেলে-মেয়েদুটোকে নেয়া গেল না। কিন্তু বেঁকে বসেন মাসুদ ভাই। কারও কথায় এক পা পিছিয়ে যাননি উনি। কড়া কিছু কথা বলেন তিনি সিনেটরকে। লোকটা রাগে উন্মাদ হয়ে দেখে নেব বলে ফোঁস-ফোঁস করতে করতে বেরিয়ে যাওয়ার পর যোগাযোগ করেন মাসুদ ভাই নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। সব শুনে তিনি শুধু বলেন, 'তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, মাই বয়। আমিও চিনি প্রেসিডেন্টকে। ভাল প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য কাউকে নেব না আমরা আমাদের সংগঠনে।'

মিতা ও রাশেদ পরে মাসুদ ভাইয়ের কাছে শুনেছে কী ঘটেছিল সেদিন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফোনে কথা বলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে। দুঃখ প্রকাশ করেন দলীয় সিনেটরের বাজে আচরণের জন্য।

ওরা দুই ভাই-বোন আগেই জানত, বিশাল হৃদয়ের মানুষ মাসুদ ভাই। সেদিন এটাও বুঝল, কেন উনি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে এত শ্রদ্ধা করেন!

এরপর পাঁচ মাস ট্রেইনিং শেষে কাজে যোগ দিল ওরা নুমায়। মিতা বারবার মনে মনে বলে, ওদের এই অর্জন আসলে ওদের নয়, এর নব্বই ভাগ কৃতিত্ব ওই দুঃসাহসী বাঙালি মানুষটার। ইদানীং বারবার একটা প্রশ্ন আসে ওর মনে, আমি কি মাসুদ ভাইকে ভালবাসি? কখনও মনে হয়েছে, হ্যাঁ, তা-ই! কখনও মনে হয়, না, সে যোগ্যতা আমার নেই। কখনও মুখ ফুটে মানুষটাকে বলতে পারবে না কিছু।

ফ্লিপার নাড়ল মিতা আহমেদ, গতি তুলে নেমে যেতে লাগল, পৌঁছে গেল পাথুরে গিরিখাতের শেষ-মাথায়। সাগর-তলে নেমে এল। বালির মেঝের বুকে গেঁথে দেয়া হয়েছে এক স্টিলের পিন, সঙ্গে ঝুলছে প্ল্যাস্টিকের কার্ড। ওটা ক্যামেরার সামনে তুলে ধরল ও। ডেযিগনেটেড লাইন ও ওয়েপয়েন্ট ছবি হয়ে রইল। কাজ শেষে ক্যামেরা বন্ধ করল, হাত থেকে ছেড়ে দিল কার্ড। এবার ফেরা যায়। কিন্তু একটু দূরে বালির মেঝেতে কী যেন ঝিকমিক করছে!

নীল ফ্লিপার দুটো নেড়ে এগিয়ে গেল মিতা, ছোট কিছু পাথরের কাছে চলে এসেছে। ওখানে শীর্ণ হয়ে আবার নতুন উদ্যমে ফুলছে এক খুদে অক্টোপাস, ঝিল্লি দিয়ে টানছে অক্সিজেন। বিরাট এক প্রাণী আসতে দেখে তার আত্মা চমকে গেল—মুহূর্তে রং পাল্টে প্রায় স্বচ্ছ হয়ে উঠল, তারপর আট হাত-পা নেড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল প্রবাল-প্রাচীরের দিকে। মন দিয়ে পাথরগুলো দেখছে মিতা। ওই তো বালির মধ্যে ওটা।

হাসি-মুখে ওর দিকেই চেয়ে! যেন কেউ আবিষ্কার করছে বলে খুশি। বালির কাছে বাতাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ও, সরে গেল বালির পাতলা স্তর। ছোট্ট জিনিসটা তুলে নিয়ে ধরল মাস্কের কাছে।

কোনও মেয়ের পোর্সেলিনের ফিগারিন। লাল আলখেল্লা, কালো চুলগুলো উঁচু করে খোঁপা বেঁধেছে। গালদুটো লাজে রক্তিম, সরু চোখদুটো বলছে, ও চায়নিজ। শৈল্পিক পুতুল, তবে যত্ন করে পালিশ দেয়া হয়নি। পোশাক যা পরানো হয়েছে, সেটা প্রাচীন আমলের। দাঁড়ানোর ভঙ্গি বহু কাল আগের। আরও মনোযোগ দিল মিতা, উল্টেপাল্টে দেখল খুদে পুতুল। নীচে লেখা নেই: মেইড ইন হংকং। নরম বালির ভিতর হাত ঢুকিয়ে নাড়া দিল। নাহ্, অমন আর একটিও নেই!

কয়েক গজ দূরে রুপালি বুদ্বুদ উঠছে। রিফের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সেডিমেন্টের স্যাম্পল নিচ্ছে ওর ভাই।

তার সামনে চলে গেল মিতা, বাড়িয়ে দিল ফিগারিন।

কৌতূহলী চোখে জিনিসটা দেখল রাশেদ, ডাইভ ব্যাগে সেডিমেন্ট রেখে ইশারা করল। জানতে চাইছে এ পুতুল কোথায় পেয়েছে।

রিফ থেকে সরে গেল মিতা, যমজ ভাইকে নিয়ে চলেছে বালির বাঁধের দিকে। ওখানে পৌঁছে চারপাশ খুঁজতে শুরু করল রাশেদ। খানিক যেতে বালির মেঝে শেষ হলো, সামনে শুধু এবড়ো-খেবড়ো লাভার স্তর। একটু দূরে থেমেছে মেঝে। ওখানে শুরু হয়েছে খাড়া এক খাদ। সোজা নেমেছে পনেরো হাজার ফুট গভীরে। তার খানিক আগে বালিতে গজিয়ে উঠেছে প্রবালের সারি। একবার লাভার মেঝের দিকে চাইল রাশেদ,

মাথা নাড়ল। ওদিকে কিছু থাকবে না।

মাথা দোলাল মিতা, ও প্রবাল-প্রাচীর দেখতে চায়।

পিছু নিল রাশেদ।

দশ ফুট এঁকেবেঁকে গেছে প্রবালের দেয়াল, তারপর হারিয়ে গেছে বালিতে। ওই অংশের রং কালচে, খেয়াল করেছে মিতা। বালির মেঝের শেষে লাভার স্তর শুরু হয়েছে। ওখানে গোলাকার স্তম্ভের মত লাভা, ওটার পাশে থামল মিতা। ওর লক্ষ্য চারকোনা বর্মের মত এক পাথর। হাতের ইশারায় ভাইকে এসে দেখতে বলছে।

ক'বার ফ্লিপার নেড়ে পাশে পৌঁছে গেল রাশেদ। ছ'ফুটি চ্যাপ্টা পাথরটি পেরিয়ে এসেছে। মিতা হাত তুলে দেখাতে নেমে পড়ল মেঝেতে। পাথরের গায়ে পিটে রয়েছে গুল্ম ও শামুক-ঝিনুক। ক'বার টোকা দেবার পর সাবধানে হাত বোলাল। রুক্ষ অনুভূতি। মরা শামুক-ঝিনুক সরিয়ে বোনের দিকে চাইল রাশেদ।

কাছ থেকে ছবি তুলবে বলে ক্যামেরা চালু করেছে মিতা। কাজ শেষে পরস্পরের দিকে চাইল। চারপাশে আর কিছু নেই। ফিরতি পথ ধরল ওরা, দ্রুত উঠে চলেছে।

ঝকঝকে নীল পানিতে ভুশ্ করে ভেসে উঠল ওরা দু'জন। ওরা রয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপে, কেলিউলি বে-র কাছে এক বিরাট কোভ-এ। কয়েক শ' গজ দূরে পাথুরে তীর। কালো লাভার উঁচু টিলা দিয়ে তিনদিক ঘেরা কোভ। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, ফিরবার সময় সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিয়ে ফিরছে।

নোঙর ফেলা ছোট্ট ইনফ্লেটেবল বোটের পাশে চলে গেল

রাশেদ, দু'হাতে কিনারায় চাপ দিয়ে উঠে পড়ল। ট্যাঙ্ক ও ওয়েট বেল্ট খুলে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বোনকে।

একটুও ক্লান্ত হয়নি মিতা, মুখ থেকে রেগুলেটর খুলল। স্বাভাবিক স্বরে জানতে চাইল, 'তোর কী মনে হয় রে? স্যাণ্ডবারের মধ্যে প্রবালের দেয়াল কেন?'

'সাধারণত এমন হয় না।'

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে। ওখানে আবার নামব আমি। বোধহয় প্রবাল ছেয়ে ফেলেছে অন্য কিছুকে।' ডাইভ ব্যাগ থেকে ফিগারিন বের করল মিতা, ভাল করে দেখল সূর্যের আলোয়।

'তুই ভাবছিস ওখানে কোনও জাহাজ ডুবেছে?' হালকা ঠাট্টার সুরে জানতে চাইল রাশেদ, বো-লাইন খুলে চালু করল খুদে আউটবোর্ড মোটর।

'এটা কোথা থেকে এল, জানতে চাই।' পুতুলটা দেখছে মিতা। 'তোর কী মনে হয়? এটার বয়স কত?'

'জানি না,' বলল রাশেদ। 'তবে বেশি টানছে আমাকে ওই চারকোনা পাথর।'

'কোনও থিয়োরি?'

'একটা আছে,' বলল রাশেদ। 'তবে বাড়তি কিছু বলতে চাই না। আগে জাহাজের রিসার্চ কম্পিউটার দেখব, তারপর অন্য কথা।'

থ্রটল খুলে দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে রওনা হলো বোট। আধ মাইল দূরে নোঙর ফেলেছে নুমার রিসার্চ ভেসেল লিংকন। মেঘহীন সুনীল আকাশ, প্রায় একই রঙের নীল সাগর, তার মাঝে অদ্ভুত লাগছে হালকা নীল জাহাজ। কিছুক্ষণ পর গন্তব্যে পৌঁছে গেল বোট, জাহাজের পোর্টসাইডের এক ক্রেনের নীচে

গিয়ে থামল। ডেকে ক্রেন থেকে ঝুলছে দুটো কেবল। রাবারের বোটের দু'মাথায় ডি-হুক, দুই ভাই-বোন ওগুলোর সঙ্গে আটকে দিল কেবলের আংটা। জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে নীচে চাইল এক লোক। পেটা শরীর, কিন্তু তার চেয়ে বেশি চোখে পড়ে চওড়া গোঁফ। নীল দু'চোখে ইস্পাতকঠিন চাহনি। ওয়েস্টার্ন কাহিনির পোকারা একে দেখলে বলবে, এই লোকই ওয়ায়েট আর্প, নতুন করে জন্মেছে, কিন্তু উচ্চারণ টেক্সানদের মত।

'বাছারা, চুপচাপ বসে থাকো,' গলা চড়িয়ে বলল রন ফকম্যান। হাইড্রলিক উইঞ্চের কণ্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। কয়েক সেকেণ্ড পর সাগর ছেড়ে উঠে এল বোট, নামিয়ে দেয়া হলো জাহাজের ডেকে। দুই যমজকে সাহায্য করল ফকম্যান, ডাইভ ইকুইপমেণ্ট সরিয়ে রাখতে শুরু করল। কাজের ফাঁকে মিতাকে বলল, 'এদিকের রিফের ছবি তুলেছ? ক্যাপ্টেন জানতে চেয়েছেন পরের সার্ভে এরিয়ায় যাবেন কি না। লেলেইয়ুই পয়েণ্ট দ্বীপের পুবদিকে।'

'জবাবটা হ্যাঁ, এবং একইসঙ্গে না,' বলল মিতা। 'আমাদের ডেটা সংগ্রহ শেষ, তবে এই সাইটে আরেকবার ডাইভ দেব।'

পোর্সেলিনের পুতুল উঁচু করে দেখাল রাশেদ। 'মিতার ধারণা কোনও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছে। ওটার পেট ভরা সাত রাজার ধন, সোনাদানা, মণি-মাণিক্য।'

'আমি মোটেই এ কথা বলিনি,' আপত্তি তুলল মিতা। 'তবে সাংস্কৃতিক সম্পদ পেতে পারি।'

'বলো দেখি কী ধরনের জাহাজ?' জানতে চাইল ফকম্যান।

'কোন্ ধরনের জাহাজ তা এখনও বলা যাবে না,' বলল রাশেদ। 'তবে ইন্টারেস্টিং একটা পাথর পেয়েছি।'

'ভিডিও-টেপ দেখতে চাইছে ও,' বলল মিতা।

যে-যার রুমে ফিরল ওরা, শাওয়ার শেষে পোশাক পাল্টে চলে গেল জাহাজের ল্যাবোরেটরিতে। রন ফকম্যান একটা মনিটরের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভিডিও ক্যামেরা, প্রকাণ্ড স্ক্রিনে ফুটে উঠছে ইমেজ। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল চারকোনা পাথরটা। ঝুঁকে পয বাটন টিপল রাশেদ। 'আমি আগেও দেখেছি এ জিনিস,' শান্ত স্বরে বলল। উঠে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসল। কী-বোর্ডে বিদ্যুদ্বেগে চলছে আঙুলগুলো। 'কিছুদিন আগে এক আণ্ডারওয়াটার আর্কিওলজি কনফারেন্সে যোগ দিই। ওখানেই দেখেছি।'

কিছুক্ষণ খুঁজেই নির্দিষ্ট ওয়েব-সাইট পেয়ে গেল রাশেদ, ফুটে উঠল সায়েন্টিফিক পেপার। সঙ্গে এক্সকেভেশনের ছবি। স্ক্রল করে থামল এক আণ্ডারওয়াটার ছবির উপর। জিনিসটা চৌকো এক পাথর। গ্র্যানিটের। একদিক পাতলা, মাঝখানে দুটো গর্ত।

'উপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে ফেললে আমরা ঠিক এই জিনিস পাব,' বলল রাশেদ। 'মিতার পাথর আর এটা একই।'

ভিডিও-টেপ ও ইমেজ দেখছে রন ফকম্যান।

'জিনিসদুটো আকৃতির দিক দিয়ে একই,' বলল রাশেদ। 'আকারেও সমান।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু জিনিসটা কী?' জানতে চাইল ফকম্যান।

'এটা একটা নোঙর,' বলল রাশেদ। 'এ পাথরের সঙ্গে মিলে গেছে মিতার নোঙর। অনেক কাল আগে সীসা ও লোহার বদলে কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি হতো এসব নোঙর।'

'তুমি তো প্রাচীন আমলের কথা বলছ,' বলল ফকম্যান।

আস্তে করে মাথা দোলাল রাশেদ। 'আর তা-ই মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে আমার। মিতার নোঙর ঠিক এই ইমেজের মত।' স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করল ও।

'একইরকম, সন্দেহ নেই,' বলল ফকম্যান।

জানতে চাইল মিতা, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওটা এল কোথা থেকে। ওরা মালয়েশিয়ায় কোন্ ধরনের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছে?'

'নিজ চোখে দেখাই ভাল,' স্ক্রল করে স্ক্রিনে কম্পিউটারাইজ্‌ড ড্রইং নিয়ে এল রাশেদ। জাহাজটি চার মাস্তুলওয়ালা, বিশাল। 'বিশ্বাস হয়, যা আবিষ্কার করতে চাই তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর? ওটা ছিল চিনাদের প্রকাণ্ড এক জাঙ্ক—প্রাচীন জাহাজ।'

নয়

এক সপ্তাহ হলো রাস তানুরার দুর্যোগ প্রবল ঝাঁকি দিয়েছে দুনিয়াকে। ইরান উপকূলে ওটা একখণ্ড লাইম-স্টোন, রাস তানুরা থেকে এক শ' আশি মাইল দূরে। আকাশে-বাতাসে ভাসছে কটুগন্ধী বাদামি ধোঁয়া। পারস্য উপসাগর থেকে তেল-পোড়া হাওয়া সরছে না। যে-কারও দম আটকে আসে, মুখে

জড়িয়ে থাকে পেট্রল ও গ্রিজের স্বাদ।

এটা ইরানিদের গর্ব, খার্গ দ্বীপ। এখানে একে টক্সিক বাতাস, সঙ্গে যোগ দিয়েছে দ্বীপের পুব দিকের বিশ্রী পরিবেশ—পানিতে ভাসছে তেলের পুরু আস্তর। খানিক দূরে ক্রুড অয়েল ট্র্যান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি। T আকৃতির জেটির বিশাল বার্থগুলো ঠাঁই দিতে পারে দশটি আলট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার সুপারট্যাঙ্কারকে। মানুষের তৈরি দ্বীপ এটা। স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলো খার্গ দ্বীপের উঁচু অংশ থেকে নিয়মিত যোগান দিচ্ছে পেট্রোলিয়াম।

খার্গ দ্বীপ ইরানিদের সবচেয়ে বড় অয়েল এক্সপোর্ট টার্মিনাল। একইসঙ্গে ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অয়েল ট্র্যান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিরও অন্যতম।

দিন শেষে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, এমন সময় পুবদিকের সুপারট্যাঙ্কারগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল কালো একটা তোবড়ানো ড্রিল শিপ। খার্গ দ্বীপের উত্তর অংশের টিলাগুলোর কাছে গিয়ে ফেলল নোঙর। উপকূল পাহারা দিচ্ছে ইরানিয়ান মিলিটারি বোট, পুরানো জাহাজ পাশ কাটিয়ে গেল, দ্বিতীয়বার চাইল না কেউ। ড্রিল শিপের মাস্তুলে উড়ছে মালয়েশিয়ার পতাকা।

এ জাহাজের দিকে মনোযোগ দিল না তেল কর্মীরা, বিশেষ করে মাঝরাত হওয়ার পর। আর ঠিক তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠল জাহাজের নাবিকরা। ড্রিল শিপ সামনে-পিছনে সরছে, সাগরের কালো পানি সার্ভে করছে। নাকি অন্য কিছু করছে? নির্দিষ্ট জায়গায় থামল ড্রিল শিপ। ফোর, অ্যাফ্ট আর সাইড থ্রাস্টার কাজ করছে। স্রোত বা হাওয়া আর জাহাজটাকে সরিয়ে নেবে

না। নিচু ওয়াটের বাতিগুলো জ্বলে উঠল ডেকে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে ক্রুরা। কালো জাম্পসুট পরনে। ডেরিক থেকে খাটো এক ড্রিল স্ট্রিং নামিয়ে দেয়া হলো মুন পুলে। স্ট্রিঙের শেষে রোলার-কোন্ ড্রিল-বিট নেই। আসলে ড্রিল করবে না ওরা। ড্রিলের বদলে ওখানে ত্রিকোণ এক জিনিস লাগানো রয়েছে। ওটার তিন সিলিণ্ডার একইসঙ্গে একটা ট্রাইপডে আটকানো।

সাগর তলে নামিয়ে দেয়া হলো ট্রাইপড। একে একে ডেক থেকে সরে গেল নাবিকরা। থমথম করতে লাগল জাহাজ। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। কিন্তু বিশ মিনিট পর জাহাজের নীচ থেকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুরু হলো। পানির উপর থেকে মনে হলো ওটা যেন বহু দূরে বাজ পড়বার আওয়াজ। চারদিকের জাহাজ ও তীরের সবাই আওয়াজটা পেল। কিন্তু কেউ জানে না, ড্রিল শিপের পঞ্চাশ ফুট নীচে শুরু হয়েছে হাই পাওয়ারের সাউণ্ড ওয়েভ! উপসাগরের নীচে পাথুরে জমি, সে পাথর ভেদ করে নীচের দিকে ছুটছে সাইসমিক ওয়েভ। তিন সিলিণ্ডারের একত্রিত শক্তি ছুটে গেল নির্দিষ্ট গভীরতায়—সাউণ্ডের এই প্রচণ্ড শক্তি ছুটছে ম্যাপে চিহ্নিত একটি ফল্ট লাইনকে তাক করে।

অ্যাকুস্টিক বার্স্ট শেষ হতে না হতে ফল্ট লাইনের উপর দ্বিতীয় দফা চার্জ হলো। এর পরপর আবারও! তিনটি সংমিশ্রিত আওয়াজের বিস্ফোরণ পানির নীচের ফল্টকে প্রবল এক নাড়া দিল। সাইসমিক ওয়েভ এত তীব্র হয়ে উঠল, সহ্য করতে পারল না জমির দুর্বল অংশ। আধ মাইল নীচের ফল্ট ফেটে প্রচণ্ড নাড়া দিল গোটা এলাকাটাকে।

ওই ফাটলের কারণে চারপাশ থরথর করে কাঁপতে লাগল। পরে ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে বলবে, রিখটার স্কেল অনুযায়ী ভূমিকম্প ছিল ৭.২ মাত্রার। এক কথায় ওটা ছিল খুনি কোয়েক। তবে মানুষ মারা পড়ল কমই। শুধু খার্গ দ্বীপের কাছাকাছি ইরানি গ্রামগুলো বিধ্বস্ত হলো। পারস্য উপসাগর অগভীর, ফলে সুনামি হলো না। কিন্তু ইরান উপকূলের শেষমাথা ও খার্গ দ্বীপ ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

ছোট্ট ওই দ্বীপ প্রায় ধ্বংসই হয়ে গেল। নিউক্লিয়ার বোমা পড়লে ঠিক এমনই হতো। আকাশে লাফিয়ে উঠল খার্গ দ্বীপ। তেরোটা বিশাল ট্যাঙ্ক ফেটে গেল বেলুনের মত। নদীতে পড়ল ক্রুড অয়েল, ছড়িয়ে গেল টিলার তীরে, কুলকুল করে নামল সাগরে। পুবদিকের স্থির অয়েল টার্মিনাল দু টুকরো হয়ে ভাসতে লাগল সাগরে। নোঙর ফেলা সুপার ট্যাঙ্কারগুলোর কয়েকটা ডুবে গেল। খার্গের পশ্চিম টার্মিনাল মুহূর্তে হারিয়ে গেল সাগর-তলে।

কালো ড্রিল শিপের কাজ শেষ, দক্ষিণ দিকে রওনা হলো ওটা ধীরে-সুস্থে। ততক্ষণে পাথুরে দ্বীপ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে হেলিকপ্টার ও রেসকিউ জাহাজগুলো। কেউ খেয়াল করল না কালো জাহাজ ধ্বংস-স্তূপ ছেড়ে দূরে সরছে। কারও জানা হলো না ওই জাহাজটা মুহূর্তের মধ্যে ইরানি তেলের রপ্তানি স্তব্ধ করে দিয়েছে। ওটার কারণে আবারও হোঁচট খাবে তেলের অস্থির বাজার। এবার পাগল হয়ে উঠবে প্রতিটি দেশের সরকার।

খার্গ দ্বীপের এ ভয়ঙ্কর দুর্যোগের খবর প্রকাশ পেতেই উন্মাদ হয়ে উঠল দুনিয়া। তেলের বাজার আকাশ স্পর্শ করল। এর বদলে কোনও আনবিক বোমা ফাটলে বোধহয় কম ভয় পেত

মানুষ। তেলের কোম্পানিগুলো তুমুল ব্যবসার সুযোগ পেল। তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বড় ব্যবসায়ীরা। মাত্র কয়েক মিনিটে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম উঠল দু' শ পঞ্চাশ ডলারে। দু' ঘণ্টায় ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজার থমকে গেল। সূচক নামল সাত শ' পয়েন্ট। বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো স্টক মার্কেট।

সাধারণ আমেরিকানরা গাড়ি নিয়ে ছুটল কাছের গ্যাস স্টেশনে। কম পয়সায় ফিউয়েল কিনতে চাইল সবাই। কিন্তু শীঘ্রি তেলের স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল স্টেশনগুলো। এখনই জানা গেল বাড়তি রিফাইণ্ড গ্যাসোলিন নেই, প্রতি অঙ্গরাজ্যে শুরু হলো হই-হল্লা, হাঙ্গামা।

হোয়াইট হাউসে জরুরি মিটিং ডাকলেন প্রেসিডেন্ট। উঁচু পর্যায়ের সিকিউরিটি ও ইকোনমিক অ্যাডভাইযাররা জড়ো হলেন ক্যাবিনেট রুমে।

প্রেসিডেন্টের আহ্বানে প্রথমে বক্তব্য শুরু করলেন চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, 'একইমাসে তেলের দাম দু'বার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া একটা অবিশ্বাস্য অবস্থা।' তাঁর চোখে পুরু গ্লাসের চশমা। একবার টাক চুলকে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমাদের ট্র্যান্সপোর্টেশন সেক্টরের কথা বাদই দিই, পেট্রোলিয়ামের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অসংখ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রি, কল-কারখানা—মোটকথা সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য; প্ল্যাস্টিক, কেমিক্যাল, পেইন্ট, টেক্সটাইল... এমনি হাজারো কর্মকাণ্ড রয়েছে, যেসবের ওপর পেট্রোলিয়ামের এই মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়বে। সবকিছুর দাম এবার হু-হু করে বাড়বে। উৎপাদকদের পর পরই হাঁটু মুড়ে বসে পড়বে কাস্টোমাররা।

গ্যাস স্টেশনে গিয়ে এখনই বুঝতে পারছে, নাগালের বাইরে চলে গেছে ফিউয়েল। এর ফলাফল অকল্পনীয়। ২০০৯-এর রিসেশন আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি, আবার শুরু হতে চলেছে আরেক বিশাল, ভয়াবহ মন্দা। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা গভীর এক খাদের পাশে। এবার একেবারে নীচে গিয়ে পড়তে পারি। কেবল আমরাই নই, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে এই প্রচণ্ড ধাক্কায়।'

'ফিউয়েলের দাম বাড়ছে আমরা জানি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু কতটা বাড়তে পারে? আমরা কিন্তু এক ফোঁটা তেলও ইরান থেকে কিনি না।'

'তেল বাজারের সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় মানুষের আতঙ্ক। তাতেই ডুবছি আমরা সবাই। খার্গ দ্বীপের বিপর্যয় পুরো বিশ্বকে বিপদে ফেলেছে। আমাদের নিজেদের তেলের আমদানি যদি ঠিক ভাবে চলেও অন্যান্য দেশের ক্ষতি হবে, ফলে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব। আগে থেকেই জানি রাস টানুরার কারণে ক্রুড অয়েল কম মিলবে। তবে খার্গ দ্বীপ বিধ্বস্ত হওয়ায় বাজার আবারও অস্থির হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয়েছে তেল নিয়ে কাড়াকাড়ি। নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু ব্যবসায়ী বলছে, পার্শিয়ান গালফের ফ্যাসিলিটি দুটো ধ্বংস করেছে একদল টেরোরিস্ট।'

'এর সত্যতা কতটুকু?' ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

উনি গম্ভীর চেহারার মানুষ। একহাতে টাই সোজা করে নিয়ে শুরু করলেন, 'তেমন কোনও আলামত পাইনি আমরা, মিস্টার

প্রেসিডেন্ট।' ফ্যাঁসফেঁসে স্বর। 'আমি ল্যাংলিকে আরও ভালভাবে খোঁজ নিতে বলেছি। এখন পর্যন্ত জানি, ওই দুই ফ্যাসিলিটি ধ্বংস হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে।'

'সেটা হতেই পারে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'অন্তত এই কাজটায় মানুষের কোনও হাত নেই বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের নিজেদের দেশের কোনও ফ্যানাটিক যেন এর সুযোগ না নেয়। অলিভার, আমি চাই হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি পুরোপুরি সতর্ক থাকুক। আমাদের সমস্ত বন্দরে নজরদারি বাড়াতে হবে। এ দেশে কোনও টেরোরিস্ট যেন উৎপাত করতে না পারে। সর্বক্ষণ আমাদের অয়েল টার্মিনালগুলো পাহারা দিতে হবে। বিশেষ করে উপ-সাগরের টার্মিনালগুলো।'

'এখনই নির্দেশ পৌঁছে যাবে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন হোমল্যাণ্ড সিকিরিউরিটি ডিরেক্টর। প্রেসিডেন্টের উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছেন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার মনে হয় এখনই স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ থেকে স্টক ছাড়া শুরু করা দরকার,' বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। খুব কম মানুষই জানে, তিনি প্রেসিডেন্টের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ঠিকই বলেছেন,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'আজ হোক বা কাল, তেলের বাজার শান্ত হতে বাধ্য। কিন্তু তার আগে রিজার্ভের এক অংশ ছাড়লে পাবলিকের ভয় কমবে। এদিকে বাজারের উপর আস্থা ফিরবে সবার।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। এক এইডকে বললেন, 'প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার লিখে ফেলুন।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আলাস্কার পাইপ লাইন পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়েছে। এবার আমরা বিদেশি রপ্তানিকারকদের অনুরোধ করতে পারি, যাতে প্রোডাকশন বৃদ্ধি করে।'

'প্রথমে নিজেদের ফিউয়েল কম দামে ছাড়া উচিত,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'তা-ই করব,' আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'কেবল নেটওয়ার্কগুলোকে জানিয়ে দিতে হবে, আজ রাতে ভাষণ দেব আমি। আগামী এক মাসের জন্য ফিউয়েল রেশনিং শুরু হবে। আজ থেকে রিফাইনারিগুলো চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকবে। প্রথমে আমরা জনগণকে শান্ত করব, তারপর খুঁজে বের করব কী ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় এ অবস্থা থেকে।'

প্রেসিডেন্ট থেমে যেতে নীরবতা নেমে এল ঘরে। পাক্কা এক মিনিট চুপচাপ বসে রইলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর নিচু স্বরে বললেন, 'আর কোনও অয়েল টার্মিনালে ভূমিকম্প মানেই, ধসে পড়বে বিশ্বের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা!'

দশ

সাগর-তলে বালির বাঁধে যেখানে পাওয়া গেছে পুতুল, সেই এলাকা দেখলে এখন মনে হয়, দ্রুত চলছে কনস্ট্রাকশানের

কাজ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অ্যালুমিনিয়াম গ্রিড ও হলুদ দড়ি। সাগরের মেঝের এদিক-ওদিক কমলা রঙের পতাকা। বালি-জমিতে ছোট্ট এক গর্ত খুঁড়বার মাধ্যমে এই যজ্ঞ শুরু হয়। কিন্তু শীঘ্রি ওটা হয়ে উঠেছে বড়সড় এক এক্সকেভেশন প্রজেক্ট। বালির দু' ফুট নীচে বড় এক টুকরো কাঠ পেয়েছে রাশেদ ও মিতা। এর পর বেশ কিছু গর্ত খুঁড়ে জানা গেছে, একই জায়গা থেকে এসেছে পোর্সেলিনের পুতুল ও পাথরের নোঙর—অবহেলা করে কেউ জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলেনি ওসব। সুদূর অতীতে দুই প্রবাল-প্রাচীরের মাঝে সত্যি ডুবেছিল একটা জাহাজ!

বালির নীচে পাওয়া গেছে নীল-সাদা পোর্সেলিনের প্লেট ও বোউল। প্রতিটি জিনিস জেড পাথরে কারুকার্য-খচিত। সব কিছুতেই স্পষ্ট ইঙ্গিত, ডুবে যাওয়া জাহাজটি চৈনিক। কাঠের টুকরোর ডিজাইন থেকে আন্দাজ করা গেছে, ওটা ছিল বিশাল আকারের চিনা জাঙ্ক। বহুকাল আগে হাওয়াই দ্বীপের কাছে এ জিনিস এসেছে, তা বিপুল প্রচার পেয়েছে। রাশেদ ও মিতা যতই আপত্তি তুলুক, জমজমাট গল্পের খোঁজে ছুটে এসেছে সাংবাদিকরা। একের পর এক ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে ওদের। তবে কপাল ভাল, একই কাহিনি ক' দিন প্রচার করার পর ক্ষান্ত দিয়েছে লোকগুলো। দুই ভাই-বোন জানত এমনই হবে, নতুন কিছু না পেয়ে বিদায় নিয়েছে ওরা। এর পর নিশ্চিন্তে এক্সকেভেশনের কাজে নেমে পড়েছে ভাই-বোন।

গ্রিডগুলোর উপর ভাসছে মিতা, দু'জন ডুবুরীকে পাশ কাটাল। তারা একখণ্ড কাঠ থেকে বালি সরাচ্ছে। ওটা জাহাজের স্টার্নপোস্ট ছিল। আরেকটু দূরে ম্যানুয়াল প্রোবগুলো বালির ভিতর গেঁথে দেয়া হয়েছে। ওখানে রয়েছে বিরাট কাঠের খণ্ড।

বোধহয় ওটা ছিল হাল। এক্সকেভেশন সাইটের পাশে চলে গেল মিতা, উঠতে শুরু করল। নীচে নামিয়ে দেওয়া লাইন এড়িয়ে উঠে এল সাগর-সমতলে।

সাইটের কাছে নোঙর করেছে বাদামি রঙের ছোট এক বার্জ। সাঁতরে গিয়ে ওটার পাশে থামল মিতা, এক হাতে মই ধরে ফিন্‌দুটো খুলে ডেকের উপর ফেলল। উঠে এল মই বেয়ে। এ বার্জকে বড়জোর খোলা একটা ডেক বলা যায়। এক পাশে টিন দিয়ে তৈরি ছোট্ট এক ঘর। ভিতরে ক'টা র‍্যাকে রাখা হয়েছে নানারকম ডাইভ গিয়ার। ডেকের রেলিঙের পাশে জেনারেটর, ওয়াটার পাম্প ও দুটো কমপ্রেসার। টিনের ঘরের চালে দুটো সার্ফবোর্ড, রাশেদ ও মিতার—কাজের ফাঁকে খানিকটা আনন্দ পাওয়ার ব্যবস্থা।

'পানির অবস্থা কেমন?' জানতে চাইল রন ফকম্যান। একটা কমপ্রেসরের উপর ঝুঁকে রয়েছে, হাতে স্ক্রু-ড্রাইভার।

ট্যাঙ্ক ও ডাইভ গিয়ার র‍্যাকে রাখল মিতা, মৃদু হেসে বলল, 'হাওয়াই-এ যেমন থাকে, দারুণ!' চুল মুছবার ফাঁকে ফকম্যানের পাশে এসে থামল। 'কেন, নামবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। লিংকন কখন ফিউয়েল আর সাপ্লাই নিয়ে আসে সেই অপেক্ষায় আছি। আমাদের একনম্বর কমপ্রেসর এয়ারলিফ্‌টের কাজ করছে। অন্যটা পানির নীচে পৌঁছে দেবে বাতাস। অগভীর পানি, আরামে কাজ করব।'

এয়ারলিফ্‌ট্ ফাঁপা এক টিউব, কমপ্রেসর একটা পাইপের মাধ্যমে ওটার নীচের দিকে ঠেসে দেবে জোরালো বাতাস। টিউবের নীচের অংশ প্রেশারাইয্‌ড্ হাওয়া নিয়ে দ্রুত উঠে আসবে। ফলে তৈরি হবে ভ্যাকিউয়াম এফেক্ট। টিউবের নীচের মুখ

সাইট থেকে বালি ও আবর্জনা টেনে সরিয়ে নেবে।

'লিংকন থেকে ম্যাডেলিন স্টোন,' কড়কড় করে উঠল রেডিও। রেলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা ওটা। কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল, ও-প্রান্তে রয়েছে রাশেদ আহমেদ।

'ম্যাডেলিন স্টোন বলছি,' বলল ফকম্যান। 'জলদি চলে এসো।'

'রন, আমরা ফিউয়েল নিয়েছি, হট-ডগ গরমা-গরম, আমরা আছি আর দশ মাইল দূরে। ক্যাপ্টেন বলেছেন ফিউয়েল নামিয়ে দেবেন স্টারবোর্ডে।'

'তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি,' দিগন্তের দিকে চাইল ফকম্যান। বহুদূরে নীলচে ছোট্ট ফোঁটা। বার্জের দিকেই আসছে।

'রন, মিতাকে বলুন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এক অতিথি। চিনা জাহাজ নিয়ে আলাপ করবেন। আউট, লিংকন।'

'আবারও সেই সাংবাদিক!' চেহারা বিকৃত করল মিতা।

হাসছে ফকম্যান, মাইক্রোফোনে বলল, 'ও বলছে ইন্টারভিউ দেয়ার সুযোগ পেলে খুবই খুশি হবে। ম্যাডেলিন স্টোন আউট।'

পঁচিশ মিনিট পর হাজির হলো নুমার জাহাজ, ভিড়ল বার্জের পাশে। ব্যস্ত হয়ে উঠল ফকম্যান, পঞ্চাশ গ্যালনের গ্যাসোলিন তুলছে ডেকে। লিংকনে গিয়ে উঠল মিতা, চলে গেল ওয়ার্ডরুমে। ওখানে কফি নিয়ে বসেছে ওর যমজ ভাই। সঙ্গে নাক বোঁচা এক লোক। চুলগুলো বাদামি, রুক্ষ। পরনে স্ল্যাক্স ও নেভি পোলো শার্ট।

'মিতা, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি ডক্টর শিয়োং ঈ,' বলল রাশেদ।

উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করলেন ডক্টর, তারপর মিতার হাত ধরে

ঝাঁকিয়ে দিলেন। কব্জিতে জোর রাখেন। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি, মিস আহমেদ।' বাদামি চোখে চাইলেন মেয়েটির দিকে। সূর্যের নীচে বহুদিন কাজ করেছেন, ত্বকের রং গাঢ়। বাম গালে লম্বা একটা কাটা দাগ।

'আর আমি ভেবেছি আবারও টিভি রিপোর্টার বুঝি,' মৃদু হাসল মিতা।

'একটু জ্বালাতন তো করবেই,' মাথা দোলালেন ডক্টর ঈ।

'ডক্টর মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল মিউজিয়ামের কনজারভেটর,' বলল রাশেদ।

'জী,' ঘনঘন ক'বার মাথা দোলালেন ডক্টর। ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'হাওয়াই ইউনিভার্সিটিতে এসেছি এক সেমিনারে যোগ দিতে। তখনই শুনলাম আপনারা কী আবিষ্কার করেছেন। ইউনিভার্সিটির এক অ্যাসোশিয়েট নুমার স্থানীয় রিপ্রেযেণ্টেটিভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেন ও আপনার ভাই খুবই অমায়িক মানুষ। তাঁরাই বললেন, আজ এসে ঘুরে যেতে।'

'সময়টা মিলে গেল,' বলল রাশেদ। 'ফিউয়েল আর সাপ্লাই নেয়ার জন্য হিলোয় ছিলাম। বিকেলে আবার ফিরবে লিংকন।'

'ওই জাহাজের ব্যাপারে ঠিক কী জানতে চান আপনি?' বলল মিতা।

'দক্ষিণ-পুব এশিয়ার প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট আমাদের মিউজিয়ামে রয়েছে। যেমন ধরুন স্ট্রেইট অভ মালাক্কা থেকে এক্সকেভেট করে পাওয়া গেছে চোদ্দ শতাব্দীর চিনা জাহাজের পুরো এক বহর। আমি অবশ্য ওই ব্যাপারে এক্সপার্ট নই। তবে ওয়াইউয়ান ও মিং ডাইন্যাস্টির পটারির ব্যাপারে সামান্য কিছু জানি। আমি

আসলে দেখতে চেয়েছি, আপনারা কী পেয়েছেন। ওসব দেখে হয়তো বলতে পারব, জিনিসগুলো কোন্ আমলের। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজকীয় জাহাজ মিললে আর সবার মত আমিও খুব আনন্দিত হব।'

'আমাদের প্রথম কাজ ওই জাহাজের বয়স আন্দাজ করা,' বলল মিতা। 'দুঃখের কথা, আমরা তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারিনি। মাত্র কিছু সিরামিক আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছি। ওগুলোর বেশির ভাগ অ্যানালাইসিসের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে। যেগুলো রয়ে গেছে, সেগুলো দেখাতে পারি।'

বাউ করলেন ডক্টর ঈ। 'আর্টিফ্যাক্টের ইতিহাস আন্দাজ করতে পারলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। আপনারা কি বলতে পারেন ওই জাহাজ এখন কী অবস্থায় রয়েছে?'

টেবিল থেকে মোড়ানো স্ক্রিপ্ট তুলে নিল রাশেদ। 'মিতা আসার আগে এটার কথাই ভাবছিলাম, এ স্ক্রিপ্ট দেখলে আপনি পরিস্থিতি বুঝবেন।'

টেবিল ঘিরে বসে পড়ল তিনজন, মনোযোগ দিয়ে চার্ট দেখছে। কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ডায়াগ্রাম। উপর থেকে দেখানো হয়েছে নিমজ্জিত জাহাজকে। লাভার স্তরের পাশে অর্ধচন্দ্রের মত জায়গা, যেন ঘোড়ার নাল। ছিটিয়ে রয়েছে জাহাজের কাঠ ও আর্টিফ্যাক্ট। ওখানে এত কম জিনিস দেখে বিস্মিত হলেন ডক্টর ঈ। ড্রইঙে অল্প কয়েকটা আর্টিফ্যাক্ট মাত্র। বিশ্বাস হতে চায় না ওখানে ছিল কোনও জাহাজ

'আমরা হাওয়াই ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজিস্টদের সঙ্গে কাজ করেছি,' বলল রাশেদ। 'এক্সকেভেশন করতে গিয়ে

বুঝেছি, জাহাজের বেশিরভাগ অংশ হারিয়ে গেছে। রয়েছে মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ।'

'বাকি অংশ প্রবাল-প্রাচীরের নীচে?'

'না,' বলল মিতা। 'ওটা ডুবেছে দুটো প্রাচীরের মাঝে। বালির বাঁধের নীচে হারিয়ে গেছে জাহাজ। ওটার বো তাক করা ছিল তীরের দিকে।' ডায়াগ্রাম দেখাল ও। দুই প্রবাল প্রাচীরের মাঝখানে পড়েছে এক্সকেভেশন এরিয়া। 'ওই বালির নীচে ছিল এসব আর্টিফ্যাক্ট, নইলে সবই গ্রাস করত প্রবাল। আমার ধারণা, বহু আগে বালির বাঁধের ওই অংশ ছিল কোনও নদীর চ্যানেল। টিলা থেকে নামত ওই নদী। সে সময় সাগরের উচ্চতা কম ছিল।'

'প্রবাল-প্রাচীর যদি জাহাজ গ্রাসই না করে, তা হলে বাকি অংশ কোথায়?'

'লাভার নীচে,' আঙুল তাক করে ঘোড়ার নালের অংশ দেখাল মিতা। ওখানে পাথরের মেঝে চলে গেছে তীরের দিকে। 'আপনি জানালা দিয়ে চাইলে দেখবেন, ওদিকের জমি লাভার বিরাট এক ক্ষেত্র। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ওই জাহাজ চাপা পড়েছে লাভার নীচে।'

'অবিশ্বাস্য,' এক ভ্রূ উঁচু করলেন ডক্টর ঈ। 'তা হলে জাহাজের অন্য সমস্ত মালামাল চাপা পড়েছে লাভার তলে?'

'তা-ই হবে। জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর ওটাকে ঢেকে দেয় বালির বাঁধ। এর পর যদি লাভার স্রোত বয়ে থাকে, ওই জাহাজ এখনও ভাল অবস্থায় রয়েছে। লাভার ম্যাঠের কাছে যে কাঠগুলো আমরা পেয়েছি, সব বালির নীচে ছিল। সে-কারণে মনে হয়, পুরো জাহাজটাই ওখানে রয়েছে।'

'কিন্তু খারাপ দিকটা হচ্ছে জাহাজকে আরও প্রাচীন করে তুলবে ওই লাভা, উদ্ধার করা যাবে না,' বলল রাশেদ। 'স্থানীয় এক ভলক্যানোলজিস্টের সঙ্গে আলাপ করেছি। উনি লাভা উদ্গিরণের রেকর্ড রাখেন। বলেছেন, দ্বীপের এদিকে গত দু' শ' বছরের মধ্যে কোনও অগ্নি উদ্গিরণ হয়নি। আশা করছি আগামী ক'দিনে এ ব্যাপারে আরও ভাল তথ্য পাব।'

'ওটা কোন্ জাহাজ, তা জানা গেছে?'

'মাত্র কয়েকটা কাঠ পেয়েছি আমরা। সেগুলো স্টার্নের অংশ। তক্তাগুলো পুরুত্ব দেখে বুঝেছি, জাহাজটা ছিল প্রকাণ্ড। দৈর্ঘ্যে ছিল দু' শ ফুটের বেশি। এ ছাড়াও রয়েছে নোঙরের পাথর। ওটা চিনা ডিজাইনে তৈরি।'

'অত বড় জাহাজ যখন, নিশ্চয় ওটা ছিল চিনাদেরই,' বললেন ডক্টর ঈ।

'তা-ই আসলে,' বলল রাশেদ। 'সে আমলে ইউরোপিয়ানরা এর অর্ধেক আকারের জাহাজ তৈরি করত। কিংবদন্তীর চায়নিজ অ্যাডমিরাল জেহেং হে-র কথা পড়েছি। উনি চোদ্দ শ' পাঁচ সালে বিশ্ব জয় করতে রত্ন-মানিক ভরা জাহাজের বিরাট এক বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেগুলো ছিল পাঁচ শ' ফুট দীর্ঘ ছ' মাস্তুলওয়ালা বিশাল জাহাজ। এখানে যে জাহাজ, সেটা অত বিশাল কিছু নয়।'

'বেশিরভাগ সময় বাড়িয়ে লেখা হয় ইতিহাসে,' বললেন ডক্টর ঈ। 'তবে অ্যাডমিরাল জেহেং হে যদি মাত্র তিন শ' বছর আগেও প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেন, সেটাকে বলতে হবে অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব।'

'এখানে যে সিরামিকের আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে, তা থেকে

বোঝা যায় জাহাজটা অনেক আগের,' বলল মিতা। 'আমরা তুলনামূলক ডিজাইন প্যাটার্ন রিসার্চ করে যা পেয়েছি, তাতে বোঝা যায়, এই জাহাজ ছিল তেরো শ' বা চোদ্দ শ' শতাব্দীর। সিরামিকগুলো দেখে বোধহয় বলতে পারবেন, আমাদের আন্দাজ সঠিক কি না।'

'আপনারা যা পেয়েছেন, সব খুশি মনে দেখব।'

পথ দেখাল মিতা, তিনজনের দলটি এক ডেক নীচে নেমে এল। ল্যাবোরেটরিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ভিতরে ঢুকে এক সারি র‍্যাকের সামনে থামল ওরা। পিছনের বাল্কহেডের সঙ্গে রয়েছে প্লাস্টিকের বিন। ভিতরে মিষ্টি পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়েছে নানা আর্টিফ্যাক্ট।

'আইটেম বলতে বেশির ভাগ কাঠের টুকরো,' জানাল মিতা। 'কার্গো হোল্ড আর লিভিং কোয়ার্টার বোধহয় ঢাকা পড়েছে লাভার নীচে নাবিকদের কিছু আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছি। বেশির ভাগ রান্নার তৈজসপত্র। যেমন বড় হাঁড়ি।' একটা র‍্যাক দেখাল মিতা। 'এখানে কিছু আর্টিফ্যাক্ট আপনি দেখতে চাইতে পারেন।' র‍্যাক থেকে দুটো ট্রে টেনে বের করল, স্টেইনলেস স্টিলের টেবিলে রাখল।

ট্রে-তে কিছু বাসন, একটি বোউল ও কিছু পোর্সেলিনের টুকরো। বেশির ভাগ অফ হোয়াইট রঙের। বোউল অবশ্য কুচকুচে কালো মাটির। পকেট থেকে চশমা বের করলেন ডক্টর ঈ, আর্টিফ্যাক্ট দেখে চকচকে হয়ে উঠল চোখদুটো। 'হ্যাঁ, গুড, খুবই ভাল,' বিড়বিড় করে বললেন। একটা একটা করে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন সব।

'ডিজাইন দেখে কী মনে হয় আপনার, ডক্টর?' জানতে চাইল

মিতা।

'কাঁচামাল আর প্যাটার্ন বলছে এগুলো চিনের জিঙ্দেযহেন ও জিয়ানাইয়াঙ্গের। প্রতিটার নির্মাণ যথেষ্ট উঁচু মানের, তবে মিং ডাইন্যাস্টির সময় আরও দক্ষ হয়ে ওঠে কারিগররা। মাছের এই এমব্লেম লক্ষ করুন,' একটা বাসন তুলে নিলেন ডক্টর। 'ওয়াইউয়ান আমলের বোউলে এ ধরনের কাজ দেখেছি। আপনাদের সঙ্গে আমি একমত, এসব সিরামিক তৈরি হয় সং ও ওয়াইউয়ান ডাইন্যাস্টির আমলে। অর্থাৎ বারো বা তেরো শতকের জিনিস।'

খুশি হয়ে ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা। ট্রে থেকে শেষ আর্টিফ্যাক্ট তুলে নিলেন ডক্টর ঈ। ওটা টিল ও সাদা রঙের একটা বাসন, কিনারা সামান্য ভাঙা। মাঝখানে কোটিং দেয়া সুন্দর এক ময়ূর। এ ছাড়া কিনারা ঘিরে ছোট কিছু কোটিং, এক পাল হরিণকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে চিতা। সাগ্রহে ওটা দেখলেন ডক্টর। বারবার চোখ চলে গেল ময়ূর, চিতা ও হরিণের উপর।

'আমাদের ল্যাবে এক কনজারভেটর বলেছে, এ জিনিস আগেও দেখেছে,' বলল রাশেদ। 'এগুলো নাকি ব্যবহার করত ওয়াইউয়ান রাজ-পরিবার।'

'তা-ই আসলে,' বিড়বিড় করে বললেন ডক্টর ঈ। আস্তে করে রেখে দিলেন বাসন, এক পা পিছিয়ে গেলেন। 'দেখতে প্রায় ওরকমই লাগে। তবে এগুলো রাজকীয় তৈজস নয়। কাছাকাছি ডিজাইন, ব্যবহার করত সাধারণ মানুষ।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'কোনও সন্দেহ নেই, এগুলো এসেছে ওয়াইউয়ান আমল থেকে। আপনারা হয়তো জানেন, তাঁদের আমল ছিল বারো শ' চৌষট্টি থেকে তেরো শ' আটষট্টি সাল পর্যন্ত।'

'সেকালে চিনা জাহাজ এসেছে হাওয়াই দ্বীপে, ভাবলে অবাক লাগে,' বলল মিতা।

ল্যাবোরেটরির দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকলেন লিংকনের ক্যাপ্টেন। জেমস্ পার্কার পাহাড়ের মত উঁচু, চুলগুলো আধ পাকা। সৎ ও বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে পরিচিত। 'তোমাদের সমস্ত মাল ফাইভ স্টার হোটেলে তুলেছে রন। এবার তোমরা নেমে পড়লে হিলোয় ফিরব।'

'আমরা থাকতে আসিনি, ক্যাপ্টেন,' ঠাট্টার সুরে বলল রাশেদ। 'দরকারী কিছু জিনিস নিয়ে বার্জে নেমে পড়ব।'

'ওই জাহাজ নিয়ে এখনও ব্যস্ত আপনারা?' জানতে চাইলেন ডক্টর ঈ।

'কাঠের বড় একটা খণ্ড প্রায় বেরিয়ে এসেছে,' বলল মিতা। 'আমাদের ধারণা ওটা জাহাজের হাল। যদি তা-ই হয়, আরও ভাল করে বুঝব, কেমন ছিল জাহাজ। দ্বীপের উল্টোদিকের রিফে সার্ভে করবে লিংকন। এদিকে রাশেদ, ফকম্যান আর আমি থাকছি বার্জে। আশা করি দু'চার দিনে এক্সকেভেশন শেষ হবে।'

'গুড, গুড,' মৃদু হাসলেন ডক্টর ঈ। 'আপনাদের আর্টিফ্যাক্ট দেখতে দিয়েছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ। মিউজিয়ামের রেকর্ড ঘেঁটে দেখব দেশে ফিরে। এসব সিরামিক সম্বন্ধে যদি কোনও তথ্য পাই, আপনাদের জানাব।'

'সময় করে এসেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ,' বলল মিতা। 'জানা গেল, ভুল ভাবিনি আমরা, এ জাহাজ সেই কালেরই।'

ডক্টরের কাছ থেকে বিদায় নিল রাশেদ ও মিতা, যে যার কেবিন থেকে ব্যক্তিগত টুকটাক জিনিস নিয়ে নেমে গেল বার্জে। ব্যস্ত হয়ে জাহাজের মুরিং লাইন খুলছে রন ফকম্যান। ক' মুহূর্ত

পর দু'বার ভেঁপু বাজাল লিংকন, তারপর ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

'কী জানলে?' জিজ্ঞেস করল ফকম্যান। 'লাভার ভিতর ওটা চিনা রাজকীয় জাহাজ?' কুলারের ভিতর হাত ভরে দিল সে।

'ডক্টর ঈ যা বললেন, আমাদের সঙ্গে মিলে গেছে,' বলল মিতা। 'এ জাহাজ এসেছে সাত শ' বা আট শ' বছর আগে!'

'ডক্টরকে বেশ আগ্রহী মনে হলো,' বলল রাশেদ। 'বাসনগুলো খুব মন দিয়ে দেখেছেন। আমাদের ল্যাবের ছেলেরা বলেছে বাসনে রয়্যাল মার্কিং আছে, কিন্তু উনি তা মানতে রাজি নন।'

'ওটা বোধহয় ওঁর প্রফেশনাল জেলাসি,' হেসে ফেলল মিতা। 'আমার মন বলছে, এ জাহাজ রাজকীয় বাহনই ছিল।'

'হতেও পারে, কী জানি!' ক্যানভাসের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল রন ফকম্যান, আংটা খুলে চুমুক দিল বিয়ারে। 'রাজা-গজার ব্যাপারই আলাদা!'

এগারো

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাঁচ হাজার মাইল পুবে, উলানবাটোরের কন্টিনেন্টাল হোটেল। আঁৎকে উঠল ম্যানেজার। লবিতে ঢুকেছে দুই ভিক্ষুক। ধুলো-কাদা মাখা নোংরা পোশাক। এলোমেলো

চুল-দাড়ি দেখে মনে হয়, বদ্ধ পাগল। পায়ে আবার জুতো! গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেশ মানাতো চারপাশে মাছি ভনভন করলে।

ভীষণ বিরক্ত হলো ম্যানেজার, নাক উঁচু করে সেই বরাবর চাইল লোকদুটোর দিকে। আসছে আবার তার ডেস্কের দিকে! ঝাপসা নেশাতুর চোখ! হোটেলে এসব আপদকে ঢুকতে দেয় কারা! গার্ডগুলো করেটা কী?

'রুম নম্বর পাঁচ শ' নয় বা পাঁচ শ' সাত-এ কোনও মেসেজ এসেছে?' জানতে চাইল রানা। শুকনো ঠোঁটের কারণে একটু জড়িয়ে গেল কথা।

এক ভ্রূ আকাশে তুলল ম্যানেজার। এবার হঠাৎ চিনে ফেলল গেস্টদের। 'আছে, স্যর,' বলে চট্ করে চেয়ার ছাড়ল সে, পিছন রুমে গিয়ে ঢুকল। একমিনিট পর বেরিয়ে এল ছোট এক বাক্স ও চিঠি নিয়ে। 'স্যর, এই একটাই ডেলিভারি, সঙ্গে এই চিঠি।'

চিঠি নিল রানা। হাত বাড়িয়ে প্যাকেট নিল ববি, বন্ধুর পাশে হেঁটে ডেস্ক ছেড়ে সরে এল। ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে চেয়ে রইল বিস্মিত ম্যানেজার।

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ানের চিঠি,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'পড়ে শোনাও দেখি কেজিবির এজেন্ট কী বলতে চায়।'

'আন্দ্রেই আভেতিসিয়ানকে ইরকুতস্কে ডেকে নিয়েছে ফরেন মিনিস্ট্রি। শুভকামনা জানিয়েছে। লিখেছে, আশা করছে দক্ষিণে যে কাজে গেছি, সেটা শেষ করে ফিরতে পেরেছি। ক'দিন পর ফিরে যোগাযোগ করবে।'

'খুব ভদ্রলোকের মত লিখেছে,' নাক কুঁচকে ফেলল ববি। 'সে কবে ফিরবে তার অপেক্ষায় বেঁচে থাকতে হবে গ্রেসি আর

বিল উইলসনকে?'

রানার কামরায় গিয়ে ঢুকল ওরা দু'জন। একহাতে বাক্সটা ধরল ববি, ফড়াৎ করে ছিঁড়ল বাইরের কাগজ। বেরিয়ে এল চৌকো একটা কাঠের বাক্স। বাইরের দিকে সাদা-কালো ছক আঁকা। বাক্সের ক্যাচ খুলে টেবিলে বিছালেই এটা হয়ে যাবে দাবার বোর্ড। এগুলোর ভিতর থাকে ম্যাগনেটিক গুটি। রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে বাক্সটা। ওটার সঙ্গে একটা কার্ড ছিল, পড়ে গেছে। উবু হয়ে মেঝে থেকে তুলল ববি, বন্ধুর হাতে দিল। 'কে এই লোক? হঠাৎ তোমার সঙ্গে দাবা খেলতে চায়?'

কার্ড ইংরেজিতে লেখা। নিঃশব্দে পড়ল রানা।

মাসুদ ভাই, আপনার শরীর খারাপ, তা-ই মন খারাপ সোহেল ভাইয়েরও। যোগাযোগ করেছেন। আপনার খোঁজ পেতে পাক্কা দু'দিন লাগল।

বুড়ো সিংহ তুমুল গর্জন ছাড়ছে! থাবা খেয়ে গুহা ছেড়ে পালাতে চাইছে শাবকরা!

আপনার প্রিয় দাবার বোর্ড উলানবাটোরে নেই যখন, এই বোর্ড দিয়েই খেলুন। সঙ্গে এক কৌটা ভিটামিনও দিলাম। ভাল থাকুন।

সৈয়দ আরিফুর রহমান
সেকেণ্ড অফিসার
বাংলাদেশ এমব্যাসি
উলানবাটোর, মঙ্গোলিয়া।

ঝুঁকে কার্ড পড়েছে ববি। 'দাবার বোর্ড, সঙ্গে ভিটামিন? তুমি

আনফিট বলে মন খারাপ সোহেলের? এর সঙ্গে মিল কোথায় বুড়ো সিংহের গর্জনের? শাবকরা পালাতে চায়? কিছুই বুঝলাম না!'

কেমন যেন দুলে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। ওর খোঁজ নিচ্ছে সোহেল। ও কোথায় গেছে তা কেন কেউ জানে না, তা-ই রাগারাগি করছেন বুড়ো। ওকে এতই ভালবাসেন উনি! বাজে মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পরও? মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল ওর। বোর্ডের পেটের দিকের ক্লিপ খুলল। একটু ফাঁক করে দেখল, দাবার গুটি নেই একটাও। মাঝখানে গ্যাঁট মেরে বসে আছে একটা .৪৫ কোল্ট অটোম্যাটিক। পাশে ভিটামিনের বড় এক কৌটো ভরা বুলেট।

উঁকি দিয়ে বলল ববি, 'আমি জানি এই দাবা তুমি ভাল জানো। কিন্তু কথা হচ্ছে, তা হলে আন্দ্রেই ব্যাটার অপেক্ষায় বসে আছি কেন?'

'কে বসে আছে? আমরা দুজনেই তো দাঁড়িয়ে,' বলল রানা। 'সম্ভবত জালাইর জেনে গেছে, আশ্রমে তার লোক আমাদের খুন করতে পারেনি। কাজেই সাবধানে এগোতে হবে আমাদের।'

'ব্যস, গোসল সেরেই একটা বিয়ার নিয়ে বসব পরিকল্পনায়, তা-ই না?' জানতে চাইল ববি।

'হ্যাঁ। তুমি তোমার রুমে চলে যাও, আমি একটা কাজ সেরে আসি,' নীচে নেমে লবির বিজনেস সেন্টারের দিকে রওনা হলো রানা। জালাইর তেমুজিনের ল্যাবোরেটরি থেকে যে রুপালি লকেট পেয়েছে, সেটা পকেট থেকে বের করল। একটা ফটোকপি মেশিনে রাখল ওটা। দু'দিক ফোটোকপি করে দ্রুত হাতে একটা নোট লিখল প্রথম পাতার উপর, তারপর পাশের

ফ্যাক্স মেশিনে রাখল। ডায়াল করল লং ডিসট্যান্স নম্বর। এবার দ্বিতীয় আরেকটা নম্বরে ফ্যাক্স করল সাইসমিক ইমেজিং ম্যানুয়ালের পাতাগুলো।

আর কোনও কাজ নেই। এবার দুই বান্দার ব্যস্ত চার হাত ইবলিশের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবে, নেমে পড়বে কাজে। লিফটের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

জর্জ টাউনের ছোট্ট বাড়িটা লম্বাটে, লাল ইঁট দিয়ে তৈরি। এক পলক দেখলে মনে হয়, গত দেড় শ' বছর রং হয়নি। তবে কাঁচের সরু জানালাগুলো ঝকঝকে। চারদিকে এক চিলতে করে ফাঁকা জমি, তাতে সুন্দর করে সাজানো পরিপাটি বাগান। এর ঠিক উল্টো দৃশ্য বাড়ির ভিতর মহলে। বাড়িটা যেন নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি! প্রতিটা ঘরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পলিশ্‌ড্ কাঠের অগণিত বুক-শেল্‌ফ্। বেশিরভাগই তার জাহাজ বিষয়ক ইতিহাসের বই, জার্নাল। ডাইনিং ও কিচেন টেবিলে শত শত পুঁথি। প্রায় দেখাই যায় না ঘরগুলোর মেঝে, সেখানেও চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র বইয়ের উঁচু উঁচু স্তূপ।

বাড়ির মালিক আপনভোলা মানুষ। তবে প্রতিবেশীরা বলে, লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু যে-যাই বলুক, বিউ মরটন তা নয়। সে সিল্কের পা'জামা পরে পুরো চার শ' পাউণ্ড ওজনের প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে বইয়ের গাদার মাঝে ডুবে থাকে। প্রাচীন নৌ-পথ ও নৌ-যান সম্বন্ধে তার সমান জ্ঞান এই দুনিয়ায় আর কারও নেই। সেকালের মানুষ, জাহাজ আর সাগর সম্পর্কে সচল এনসাইক্লোপিডিয়া সে।

ইয়া বিশাল এক চামড়া-মোড়া চেয়ারে, প্রায় তারই সমান

মোটা এক বই হাতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিউ মরটন। কিন্তু টুটে গেল মৌজের নিদ। হুইর-হুইর করে কী যেন বলতে চায় ফ্যাক্স মেশিনটা! চোখ খুলে একবার হাতের বইটা দেখল সে। আপাতত বাদ থাকুক ভুতুড়ে জাহাজ মেরি সেলেস্তে। ধীরেসুস্থে চেয়ার ছাড়ল সে, ডেনে এসে ফ্যাক্সটা নিল। পেট ছাড়িয়ে যাওয়া দাড়িতে এক হাত বুলাল, আরেক হাতে নাকের কাছে কভার নোট তুলে পড়ল:

বিউ মরটন,

যদি বলতে পারো এ জিনিস কী, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মঙ্গোলিয়ার এক বোতল টাটকা এইরেগ।

মাসুদ রানা।

'এইরেগ? বদমাশ! আমার সঙ্গে ব্ল্যাকমেইলিং?' বিড়বিড় করে বলল বিউ মরটন। ঠোঁটে ফুটে উঠল বিস্তৃত হাসি। ভাল বইয়ের পর প্রিয় জিনিস তার লোভনীয় খাবার ও স্বাদু পানীয়। তার সেই দুর্বলতার বুকেই ছুরি বসিয়েছে মাসুদ রানা! গাধার ফারমেন্টেড দুধ? মঙ্গোলিয়া থেকে উড়ে আসবে? ফ্যাক্সে মনোযোগ দিল। একটি লকেটের দু' দিকের ছবি পাঠিয়েছে। আস্তে করে মাথা দোলাল বিউ মরটন। 'আমি জুয়েলার নই, রানা। তবে আমি বোধহয় জানি, এটার কথা কে জানে।' ফোনে একটা নম্বর টিপল। ওদিক থেকে 'হ্যালো' আসতেই বলল, 'ডেনিস? বিউ মরটন। মঙ্গলবার দুপুরে এক সাথে খাওয়ার কথা ছিল না? কিন্তু জরুরি সাহায্য দরকার, বুঝলে? কোনও সমস্যা না থাকলে আজ দুপুরেই বসি, কী বলো? ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। রিজার্ভেশন করছি। দুপুরে তা হলে দেখা হবে।'

ফোন ছেড়ে ছবিদুটো আবার দেখল মরটন। মাসুদ রানা

পাঠিয়েছে মানেই, অদ্ভুত কোনও কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে! বিপদ ও রোমাঞ্চকর কিছু, সন্দেহ নেই!

ক্যাপিটল হিলের মনোকল রেস্টুরেন্টে গিজগিজ করছে মানুষ। চওড়া দরজার বেশির ভাগ ফাঁক বুজিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল বিউ মরটন। রাজনৈতিক নেতাদের কারণে বিখ্যাত এই রেস্টুরেন্ট। আসে সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, লবিইস্ট ও হিলের স্টাফরা। বেশির ভাগের পরনে নীল সুট। নির্দিষ্ট সাইড বুথে ঢুকে পড়ল মরটন। ডেনিস আগেই এসেছে।

'দোস্তো, ব্যাপারটা কী?' বলল ডেনিস স্টেনসেথ। সে মরটনের মত ভয়ঙ্কর মোটা তো নয়ই, বরং উল্টোটা—কাঠির মত হিলহিলে চিকন। ঠোঁটে সর্বক্ষণ হাসি। খেয়াল করলে বোঝা যায়, চোখদুটো সবকিছু লক্ষ করছে।

'তুমি আমাকে হারিয়ে দিতে চাও?' টেবিল থেকে চোখ তুলে বন্ধুর দিকে চাইল মরটন। মার্টিনির গ্লাস প্রায় খালি করে এনেছে ডেনিস। হাতের ইশারায় বারটেণ্ডারকে ডাকল মরটন, জানিয়ে দিল সেরা জিন চাই। ওয়েইটার আসতেই অর্ডার দিল লাঞ্চের। এবার পকেট থেকে বেরুলো ফ্যাক্সের পাতা। 'সবসময় খাওয়ার আগে কাজ, কী বলো? আমার এক বন্ধু এ জিনিস পেয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। জানতে চাইছে এটার আগা-মাথা।'

পাতাদুটো হাতে নিয়ে পাকা জহুরির মত নিস্পৃহ হয়ে গেল ডেনিসের চেহারা। বিখ্যাত সথ্‌বি নিলাম হাউসের উঁচু স্তরের কর্মকর্তা সে, তার কাজ ঐতিহাসিক আর্টিফ্যাক্টগুলো নিলামের আগে ভালমত পরখ করা। বিউ মরটনের ছোটবেলার বন্ধু সে, নিলামে কোনও ঐতিহাসিক জাহাজের যা-ই উঠুক, আগেই

জানিয়ে দেয় বন্ধুকে।

'এ জিনিসের কোয়ালিটি বোঝা কঠিন,' বলল সে। 'ফ্যাক্সের কপি দেখে কী করে বলি!'

'আমার এ বন্ধু দাম নিয়ে ভাবছে না। আসলে জানতে চাইছে ওটা কত আগের, বা ঐতিহাসিক কি না।'

'আগে বলবে তো!' ফোঁশ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ডেনিস।

'চেনো এই জিনিস?'

'তা-ই তো মনে হয়। ক' মাস আগে নিলামে প্রচুর তুলেছি এ জিনিস। তবে নিজ চোখে না দেখে বলা কঠিন, ওটা আসল কি না।'

'একটু খুলে বলো দেখি।' চেয়ারে ঝুঁকে বসল মরটন, হাতে চলে এসেছে নোটবুক।

'এটা বোধহয় সত্যিকারের সেলজুক। দুই মাথাওয়ালা ঈগল তো দেখছই। ইউনিক মোটিফ। ওটা ওই ডাইন্যাস্টির প্রিয় সিম্বল।'

'যতটুকু মনে পড়ছে, সেলজুকরা ছিল টার্কিশ মুসলিম,' বলল বিউ। 'বেশ কিছু দিনের জন্য বাইজ্যানটিয়ামের একটা বড় অংশ দখলে রাখে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এক হাজার খ্রিষ্টাব্দে ইরান শাসন করত। দু' শ' বছরে তাদের ক্ষমতা আরও অনেক বাড়ে। তবে এরপর খোয়ারেজমিদ সাম্রাজ্য শুরু হয়। ক্ষমতায় বসেন আলাউদ্দীন মাহমুদ। তাঁর কারণে মাটিতে মিশে যায় সেলজুকরা। ওরা আসলে ছিল শিল্প-মনা, বিশেষ করে দামি পাথরে অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ করত। ধাতুর কাজও পারত। কিছু দিনের জন্য রূপা আর তামার কয়েন চালু করে।'

'এ লকেট এরা তৈরি করতে পারে?'

'তা তো বটেই। সেলজুকদের মাঝে ক্যালিগ্রাফি চালু ছিল। পরের দিকে কয়েনে ইসলামী দোয়া খোদাই করত। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর রয়েছেন, তুমি চাইলে তোমার লকেটের কথাগুলো অনুবাদ করে দেবেন উনি। ভাষাটা বোধহয় কুফিক। হতে পারে, খোদ সুলতানকে প্রশংসা করে উপহার দেয়া হয়েছে।'

'আর কিছু?'

'বলার মত আর কিছু নেই। শিল্পে সাধারণত রূপা বা সোনা ব্যবহার করত না সেলজুকরা। ইসলাম ধর্মের সহজ-সরল পথ মেনে চলত। ভাবত, বিলাস-বহুল দ্রব্য দুনিয়ার জন্য নয়। তবে এসব মানত না সুলতানরা। ...এখন কথা হলো, এই লকেট যদি রূপার হয়ে থাকে, দেখে তো মনে হচ্ছে তা-ই, তা হলে এটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে কোনও সুলতানের ইতিহাস।'

'সেলজুকদের লকেট যখন, নিশ্চয়ই এগারো শ' বা বারো শ' সালের কোনও সুলতানের?' নোটবুকে দ্রুত লিখছে মরটন।

'তা-ই ধারণা করছি। কিছুদিন আগে আমরা এ ধরনের জিনিস পাই। ওগুলো ছিল মালিক শাহ্-র। এই সুলতান মারা যান এক হাজার বিরানব্বুই সালে। একটু অবাক লাগছে যে তোমার বন্ধু লকেট পেয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। আগেই বলেছি, আলাউদ্দীন মাহমুদ সেলজুকদের হারিয়ে দেন। তিনি আবার বারো শ' বিশ সালে যুদ্ধে হারেন চেঙ্গিস খানের কাছে। বোধহয় এই লকেট চেঙ্গিস খানের সঙ্গে চলে যায় মঙ্গোলিয়ায়।'

এক ওয়েইটার ট্রে নিয়ে হাজির হয়েছে, টেবিলে নামিয়ে দিল লাঞ্চ। ডেনিসের জন্য রিব-আই স্টেক, বিউ মরটনের জন্য

বাছুরের কলিজা।

'বহু কিছু শিখলাম, ডেনিস,' বলল সে। 'বলো দেখি, সত্যি বারো শ' তেরো শ' সালের এশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট প্রায়ই মেলে?'

'শুনলে অবাক হবে। আগে সে-সময়ের আর্টিফ্যাক্ট পেতাম না বললেই চলে। কিন্তু আট-নয় বছর আগে হঠাৎ মালয়েশিয়া থেকে এক ব্রোকার যোগাযোগ করল আমাদের সঙ্গে। তারপর থেকে একের পর এক কনসাইনমেণ্ট আসছে আর্টিফ্যাক্টের। বাজি ধরে বলতে পারি, আমরা গত ক'বছরে অন্তত এক শ' মিলিয়ন ডলারের আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করেছি। আমি এটাও জানি, ওই একই পরিমান আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করেছে ক্রিস্টি অকশন হাউজও।'

'বলো কী! জিনিসগুলো আসে কোথা থেকে?'

'শুধু আন্দাজ করতে পারি,' স্টেকে কামড় দিল ডেনিস, খানিকক্ষণ চিবিয়ে নিল। 'মালয়েশিয়ার ওই ব্রোকার খুব গোপনে ব্যবসা করে। আমাদের বলেনি কোথা থেকে আসে এত আর্টিফ্যাক্ট। এ লোকের সঙ্গে দেখাও করা যায় না। তবে আজ পর্যন্ত একটা জিনিসও নকল দেয়নি। এর কনসাইনমেণ্টের প্রতিটি আর্টিফ্যাক্ট খাঁটি!'

'ভাবতে অবাক লাগছে, এগুলো আসছে মালয়েশিয়া থেকে।'

'তা-ই আসলে, কিন্তু জিনিসগুলো দুনিয়ার যে-কোনও এলাকা থেকে আসতে পারে। লোকটা তো শুধু ব্রোকার। তবে তার নাম বা ফার্মের নাম, কোনওটাই মালয়েশিয়ান মনে হয়নি।'

'ফার্মের নামটা বলো শুনি?' কাঁটা-চামচ রেখে নোটবুক বাগিয়ে ধরল আবার বিউ মরটন।

'ফার্মের নাম বরজিন ট্রেডিং কোম্পানি।'

বারো

দরজা খুলে যেতেই স্বস্তির শ্বাস ফেলল গ্রেসি। হাতের ইশারায় করিডোরে বেরুতে বলছে প্রহরী। লোকটার চেহারা নিষ্ঠুর। চোখদুটো মরা মাছের চোখের মত। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। মনে মনে বলল গ্রেসি, এডির মত মেরেই তো ফেলবে? এখানে দম আটকে মরি কেন! বাইরে নিয়েই মারো!

গত ক'দিন হলো এ ঘরে বন্দি করে রেখেছে ওকে। কোনও ব্যাখ্যা চায়নি গ্রেসি, পাবে না জেনেই। দেখা করতে আসেনি কেউ। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ে এসেছে খাবারের ট্রে। ওর জানা নেই, এসে ঘুরে গেছে চিনা ডেলিগেশন। তখন গাড়ির আওয়াজ পেয়েছে। ওগুলো চলে যেতেই গোলাগুলির আওয়াজ বেড়েছে। ওর ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে, সরু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছে—তুমুল ধূলি-ঝড়ে কিছুই চোখে পড়েনি। তবে পরদিন খেয়াল করেছে, কমে গেছে প্রহরীর সংখ্যা।

করিডোরে বেরিয়ে এল গ্রেসি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ—লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিল উইলসন। ওকে দেখে উষ্ণ হাসলেন।

'ছুটি শেষ, গ্রেসি,' বললেন। 'এবার কাজে নামতে হবে।'

ভদ্রলোক মিথ্যা বলেননি, ওদের নিয়ে যাওয়া হলো স্টাডি-

রুমে। ওখানে বসে আছে জালাইর তেমুজিন, ঠোঁটে সরু সিগার। গতবার গ্রেসির খ্যাপা মনে হয়েছে একে। তবে এখন শান্ত। চেহারা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কর্তৃত্ব।

'আসুন, বসুন এসে,' পাশের চেয়ার দেখাল সে। 'যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'তা তো বটেই,' বললেন উইলসন। 'দিনের পর দিন চার-দেয়াল দেখলে মনে প্রশান্তি এসে যায়।'

এ মন্তব্য পাত্তা দিল না জালাইর তেমুজিন, টেবিলে পড়ে থাকা সাইসমিক রিপোর্টগুলো একহাতে দেখাল। 'আপনাদের কাজ তো প্রায় শেষ। এবার জরুরি আরেকটা কাজ করবেন। আপনাদের দেখিয়ে দিতে হবে এদিকে কোথায় কূপ খনন করা যায়।' একটা টপোগ্রাফিক ম্যাপ বিছিয়ে দিল সে। দু' শ বর্গ মাইল এলাকার ম্যাপ ওটা। মার্কিংগুলো চোখে পড়েছে গ্রেসি ও উইলসনের। ওদিকটা চিনা গোবি মরুভূমির দক্ষিণ-পুব অংশ, মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত থেকে খানিক দূরে।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, যথেষ্ট ভাল কাজ দেখিয়েছেন,' লোকটার কণ্ঠে এটাই প্রশংসার সুর। 'আরও কূপ কোথায় খুঁড়তে হবে, দেখিয়ে দেবেন আপনারা। আগেরগুলো মানচিত্রে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, অন্যগুলো চিহ্নিত করুন। এ কাজে যত্ন নেবেন, যাতে প্রতি ফোঁটা পেট্রোলিয়াম তোলা যায়।'

'এ সাইট চিনে, তা-ই না?' খোঁচা মারতে চাইলেন উইলসন।

'হ্যাঁ, তা-ই, ঠিকই বলেছেন,' সোজা-সাপ্টা ভঙ্গিতে বলল জালাইর। বাড়তি কোনও ব্যাখ্যা দিল না।

'আপনি বোধহয় জানেন সম্ভাবনা খুব বেশি,' অনেক গভীরে

রয়েছে ওখানে পেট্রোলিয়াম,' বললেন উইলসন।

'হ্যাঁ, জানি। আমাদের প্রয়োজনীয় ইকুইপমেণ্টও আছে, ওই গভীরতায় ড্রিল করতে পারব,' জালাইর তেমুজিন অধৈর্য হয়ে উঠছে। 'আমি আগামী ছ' মাসের মধ্যে দুই শ' হাই প্রোডিউসিং কূপ চাই। খুঁজে বের করুন ওগুলো।'

লোকটার ত্যাড়া ভঙ্গি রাগিয়ে দিল বিল উইলসনকে। গ্রেসি খেয়াল করেছে, রাগে লালচে হয়ে উঠছে ওঁর গাল। যে-কোনও সময়ে কড়া কিছু বলে বসবেন। তাড়াতাড়ি করে বলল গ্রেসি, 'তা খুঁজে বের করা যাবে। কাজটা শেষ করতে তিন থেকে চারদিন লাগবে।' ইচ্ছা করে বাড়তি সময় চাইছে।

'কালকের দিনটা পাবেন। আগামীকাল বিকেলে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে আমার ফিল্ড ম্যানেজার। অ্যানালাইসিসগুলো তাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'কাজ শেষে নিশ্চয়ই আমাদের উলানবাটোরে পৌছে দেয়া হবে?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'পরশু একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।'

'তা হলে বরং তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়ি,' টেবিল থেকে একটা ফোল্ডার তুলে নিল গ্রেসি। স্পষ্ট অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে চাইল জালাইর তেমুজিন, গম্ভীর চেহারায় চলে গেল ঘর ছেড়ে।

দরজার দিকে চেয়ে রইলেন উইলসন, হুঁশ ফিরতে গ্রেসির দিকে চাইলেন, আস্তে করে নাড়লেন মাথা। নিচু স্বরে বললেন, 'সহায়তার দুয়ার একেবারে খুলে দিয়েছ, ব্যাপার কী?'

একটা রিপোর্ট মুখের কাছে তুলল গ্রেসি। 'লোকটা মনে করুক তাকে বিশ্বাস করছি। আর একটু হলেই তো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন আপনি। তাতে আমরা দু'জনই খুন হতাম।'

লাজুক হাসলেন উইলসন। ঠিকই বলেছে মেয়েটি, আরেকটু হলে সত্যিই খারাপ কিছু ঘটত।

সিকিউরিটি ক্যামেরার কথা মনে রেখেছে গ্রেসি, একটা মানচিত্র নিয়ে ঘাঁটতে শুরু করল। কলম নিয়ে ওটার উল্টো পাতায় লিখল, 'পালানোর কথা ভাবছি।' নীচে একটা নোট লিখে মানচিত্র ঠেলে দিল উইলসনের দিকে। ওটা নিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। চোখে-মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল। মানচিত্রের দিকটা চোখে পড়ল গ্রেসির। ওটা পারস্য উপসাগরের। ওখানে দুটো বৃত্তাকার লাল দাগ। তার নীচ দিয়ে গেছে ভারী একটা লাইন। আরও মনোযোগ দিল গ্রেসি। একটা বৃত্ত ঠিক রাস তানুরা শহরের উপর। অন্যটা ছোট একটা দ্বীপ, ইরানের উপকূলে।

'বিল, আপনার ম্যাপটা দেখুন,' স্বাভাবিক স্বরে বলল ও। বলে একটা চার্ট বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে।

তিরিশ সেকেণ্ড পর বললেন উইলসন, 'এটা ফল্টের ম্যাপ। টেকটোনিক প্লেটগুলো ওদিক দিয়ে গেছে। পার্শিয়ান গালফের বড় ফল্টগুলো দেখিয়েছে।'

দুনিয়ায় কী ঘটছে, ওরা কিছুই জানে না। লাল বৃত্ত দুটো দেখছেন উইলসন, সে-সুযোগে ম্যাপগুলো ঘাঁটতে শুরু করল গ্রেসি। কিছুক্ষণ পর আগেরটার মত আরও দুটো ম্যাপ পেয়ে গেল। দেখানো হয়েছে টেকটোনিক ফল্ট। প্রথমটাতে বড় করে দেখানো হয়েছে বৈকাল হ্রদ এলাকা।

'সর্বনাশ, এটা দেখুন, বিল,' মানচিত্রে আঙুল রাখল গ্রেসি। ওটা হ্রদের উত্তর-প্রান্ত। গাঢ় লাল রঙে ফল্ট লাইন দেখিয়েছে। হ্রদের মাইলখানেক ভিতরের অংশ। আস্তে করে বলল গ্রেসি, 'বিল, আপনার কি মনে হয় এরা ফল্ট লাইন নিয়ে কিছু করছে?

তা-ই কি তৈরি হয়েছিল সেইশ ওয়েভ?'

আলাপের সুরে বললেন উইলসন, 'ভূমিকম্প অথবা সেইশ ওয়েভ প্রায় নিউক্লিয়ার বোমা ফেলার মতই ভয়াবহ। মানুষ নিউক্লিয়ার বোমা ফেলতে পারে, কিন্তু চাইলে ভূমিকম্প বা সেইশ ওয়েভ তৈরি করতে পারে না। ...অন্য ম্যাপে কী আছে?'

অন্যগুলোর উপর দ্বিতীয় মানচিত্র বিছিয়ে দিল গ্রেসি। ওটা আলাস্কা উপকূলের। অ্যাঙ্কোরেজ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া দেখিয়েছে। হলুদ কালিতে টেনে নেয়া হয়েছে আলাস্কা পাইপ-লাইন। ওটা গেছে বন্দর-নগরী ভেল্ডেজ-এ। তেলের ওই লাইন আমেরিকার স্থানীয় বাজারে প্রতিদিন দশ লাখ ব্যারেল যোগান দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে সবই বুঝছে গ্রেসি, তর্জনী রাখল মোটা একটা ফল্ট লাইনের উপর। ওটা উপকূল ঘেঁষে গেছে। বন্দর-নগরী ভেল্ডেজের উপর লাল একটা বৃত্ত।

পরস্পরকে দেখল বিল উইলসন ও গ্রেসি।

গ্রিন টি দিয়ে গ্রিল্ড-চিকেন স্যাণ্ডউইচ গিলছে ল্যারি কিং, কয়েক গ্রাসে সব শেষ করে বেরিয়ে এল ক্যাফেটেরিয়া ছেড়ে। নুমার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এই কালো মানিক, প্রায় কখনো নিজ গুহা ছেড়ে বেরুতে চায় না। এগারো তলায় অফিস, বলতে গেলে সেটাই তার বাড়ি-ঘর-পৃথিবী। অফিসের দিকে রওনা হয়ে খেয়াল করল, পরিচিত দু'জন রাজনৈতিক নেতা ওর দিকে ত্যাড়ছা চোখে তাকিয়ে পেরিয়ে গেল। বোধহয় ভেবেছে, রোলিং-স্টোনের গেঞ্জি পরা উন্মাদটা কোত্থেকে উদয় হয়েছে!

হিলহিলে চিকন মানুষ ল্যারি কিং। সর্বক্ষণ পরনে থাকে

মোটা জিন্স, পায়ে কাউবয় বুট। দীর্ঘ চুলগুলো পোনিটেইল করে বেঁধে রাখে। কিন্তু যারা চেনে, তারা তাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়, পোশাককে ধর্তব্যে নেয় না। অনেক মাথা খাটিয়ে নিজ হাতে নির্মাণ করেছে সে বিশাল এক কম্পিউটার কমপ্লেক্স। ওখানে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডেটা বেস। সাগর সংক্রান্ত এমন কিছু নাই, যা ওখানে নেই। পুরো বিশ্ব জুড়ে ল্যারি কিঙের রয়েছে কয়েক শ' কম্পিউটার মনিটরিং সেণ্টার। ওগুলো দেখছে সাগরে কী ধরনের বাস্তব বিপদ আসতে পারে, বা কেমন থাকবে আবহাওয়া। কাজে নামবার কিছুদিনের মধ্যে কিং টের পায়, ওর হাতে চলে এসেছে দু' দিকে ধার দেয়া তীক্ষ্ণধার এক তলোয়ার। এই সেণ্টারের কম্পিউটিং ক্ষমতা অবিশ্বাস্য। অহরহ নুমার শতখানেক রিসার্চ-সায়েণ্টিস্ট তাদের অজস্র প্রজেক্টে ল্যারির কম্পিউটারের সাহায্য নিচ্ছে। আজ পর্যন্ত নুমার কেউ বলতে পারেনি, সাহায্য চেয়ে পায়নি ল্যারির কাছে।

এ কম্পিউটার ল্যাব বিশাল এক গুহার মত। এগারো তলায় এলিভেটর খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকল ল্যারি কিং। সামনেই পড়ল ঘোড়ার নালের মত অর্ধ-চন্দ্রাকার কন্সোল। হাসি-খুশি গাঁট্টাগোট্টা এক লোক কন্সোলের পাশে সুইভেল চেয়ারে বসে রয়েছেন। ল্যারিকে দেখে বললেন, 'নিজ চোখকে বিশ্বাস হয়? আমি তো জানতাম সারাদিন এখানে বসে ডিমে তা দাও তুমি।'

'তা-ই যদি পারতাম! কিন্তু কম্পিউটারগুলো ফেলে মাঝে মাঝে যেতেই হয় খাবারের খোঁজে,' হাত বাড়িয়ে দিল ল্যারি। 'কেমন আছেন জেরেমি? নুড়ি-পাথর ভরা পাতকুয়া ছেড়ে হঠাৎ এই স্বর্গে?'

কিঙের হাত জোরেশোরে নেড়ে দিলেন ডক্টর জেরেমি

হাইন্স, হেসে ফেললেন। ইনি নুমার মেরিন জিওলজির রেসিডেন্ট এক্সপার্ট। তাঁর কাজ সাগরের তলার সেডিমেন্ট পরীক্ষা করা। নুমা হেডকোয়ার্টারের ভূ-গর্ভস্থ একটি তলায় তাঁর ডিপার্টমেন্ট। মাটি-সমতলে পৌঁছতে তাঁকে পাঁচ তলা পেরিয়ে আসতে হয়।

'আজও সেই পাথরই ভেঙে চলেছি,' মাথা দুলিয়ে বললেন। তবে কম্পিউটার দিয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারো তুমি।'

'আমার এ রাজত্ব নিজের বলে মনে করুন,' হাত নেড়ে চারপাশের কম্পিউটার সেন্টার দেখিয়ে দিল ল্যারি। দশটি সুপার কম্পিউটারকে যোগ করলে যে ক্ষমতা, তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখে ওর তৈরি করা কম্পিউটার সেন্টার।

'তোমার দুর্গ বেশিক্ষণ দখলে রাখব না। ল্যাংলির এক অফিসার আন-অফিশিয়ালি একটা অনুরোধ জানিয়েছে। কিছু সাইসমিক ডেটা চাইছে। আমার মনে হয় পার্শিয়ান গালফে যে-দুটো ভূমিকম্প হলো, সে ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে সিআইএ।'

'ব্যাপার দুটো কো-ইনসিডেন্স মনে হয় না,' বলল ল্যারি। কাছাকাছি এলাকায় পরপর দুটো বড় ভূমিকম্প হলো, আর বন্ধ হয়ে গেল তেলের যোগান। কেমনই যেন লাগে। গ্যাসোলিনের দাম আর বাড়লে সাইকেল চালিয়ে অফিসে যাবে বহু লোক।'

'তা-ই আসলে।'

কাজের কথায় এল ল্যারি, 'ওই লোক আমাদের কাছে ঠিক কী চাইছে?'

'কলোরাডো, গোল্ডেনের ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেন্টারের কাছে গত পাঁচ বছরে পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়েছে, তার রেকর্ড চেয়েছে ওরা,' বললেন হাইন্স। এক পাতা ভরা তথ্য ওঙের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'আমার এক অ্যানালিস্ট তৈরি

করেছে একটা সফটওয়্যার। গালফের দুই ভূমিকম্পের তুলনামূলক চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাবে ওতে। আমাদের শেষ কাজ পুরো পৃথিবীর সাইসমিক ডেটার সঙ্গে ওটাকে তুলনা করে দেখা। হয়তো এতে বেরিয়ে আসবে অন্য কোথাও এরকম ঘটনা ঘটেছে কি না।'

'আপনার ধারণা ব্যাপারটা সন্দেহজনক?'

'না। হয় কী করে? কিন্তু সিআইএ সাহায্য চাইছে যখন, কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে আপত্তি তুলবে?'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন জানেন?'

'এখনও না। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লাঞ্চে বসেছেন।'

'ঠিক আছে, নুমার কোনও ক্ষতি নেই সিআইএকে সাহায্য করলে। দুপুরে ভিনাসকে বলব গোল্ডেন থেকে ডেটা নিতে। তার আগেই আপনার অ্যানালিস্টের সফ্টওয়্যারটা পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। আশা করি কাল সকালে কোনও জবাব দিতে পারব।'

'অনেক ধন্যবাদ, কিং,' উঠে পড়লেন হাইন্স। 'সফটওয়্যার এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এলিভেটরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

কি-বোর্ড ও মনিটরের দিকে ফিরল ল্যারি, দু'হাতের আঙুলগুলো উড়তে শুরু করেছে। একের পর এক কমাণ্ড দিয়ে চলেছে। কাজটা শেষ করে পাশ ফিরে দেখল ইন-বাস্কেটে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ফ্যাক্স। উপরেরটা দেখেই গুঙিয়ে উঠল সে। ওটা এসেছে উলানবাটোরের কণ্টিনেণ্টাল হোটেল থেকে।

বিড়বিড় করে বলল ল্যারি, 'জানের দোস্তো, এসো, তোমার কাজটাই আগে সারি। এবার কী কাণ্ড করছ কে জানে!' ফ্যাক্সের

উপর চোখ বোলাল সে, তারপর কি-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কন্সোলের পাশে হাজির হলো এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। পরনে কব্জি ঢাকা সাদা ব্লাউজ, গোড়ালি পর্যন্ত নেমেছে উলের স্কার্ট। রক্তিম হয়ে উঠল রূপসীর দুই কপোল। লাজুক স্বরে বলল, 'গুড মর্নিং, ল্যারি। আমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি ডাকবেই না।'

'আমি তোমাকে ছাড়া থাকতেই পারি না, তুমি তো জানো,' আদুরে স্বরে বলল কিং। এ মেয়ে হলোগ্র্যাফিক দৃষ্টিভ্রম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অপারেট করার জন্য তৈরি করেছে সে দেখতে এতই বাস্তব যে, নতুন কেউ বোঝে না ভিনাস বাস্তবে রক্ত-মাংসের নারী নয়। নুমার সবাই তার কৃত্রিম বুদ্ধিসত্তার কথা জানে। অতি জটিল সমস্যার সমাধানে জুড়ি নেই ওর।

'আমরা মেয়েরা একটু প্রশংসা পেলেই পটে যাই,' কোকিল কণ্ঠে কু-উ-উ গেয়ে উঠল যেন ভিনাস। 'আজকের সমস্যা কী? বড় কিছু, না ছোট?'

'ছোটও আছে, বড়ও আছে,' বলল ল্যারি। 'তোমার বোধহয় সারারাত আজ কাজ করতে হবে।'

'তাতে কী? তুমি তো জানো তোমার জন্য কী না পারি! তা ছাড়া, আমি তো কখনও ঘুমাই না।' ব্লাউজের আস্তিন গুটিয়ে নিল ভিনাস। 'কোনটা দিয়ে শুরু করব?'

'আগে আমার বন্ধুর কাজ।' মাসুদ রানার পাঠানো ফ্যাক্সের পাতা তুলে নিল ল্যারি।

গ্রীষ্মের সূর্য লাভায় ছাওয়া টিলা বেয়ে উঠে এল, ঝলমলিয়ে দিল

নারকেল বীথিগুলোকে, এরপর সোনালী তাপ ফেলল নোঙর করা বার্জের উপর। ওই নৌ-যানের বুম-বক্সটা জোরেশোরে বাজিয়ে চলেছে হাওয়াইয়ান স্টিল গিটার। পরাজয় মেনে নিয়েছে পোর্টেবল জেনারেটর।

ছোট্ট কুঁড়ের ভিতর এরইমধ্যে খাটিয়া ছেড়েছে রাশেদ, মিতা ও রন ফকম্যান। সারাদিন পানির নীচে থাকবে, তাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে। কমপ্রেসরগুলো দিয়ে গ্যাসের ট্যাঙ্কগুলোয় অক্সিজেন পূর্ণ করে নিচ্ছে রাশেদ। পাকা পেঁপে ও সাগর কলা দিয়ে নাস্তা সেরেছে মিতা, শুকিয়ে আসা গলা ভিজিয়ে নিল পেয়ারার জুস দিয়ে। সকালের শান্ত সাগরে চোখ বুলিয়ে অবাক হলো—এত নীল হতে পারে পানি! চারপাশে কী শান্ত সমাহিত একটা ভাব! মাসুদ ভাইয়ের মনটাও কি এমনি? চট্ করে ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা—ও আবার কিছু বুঝে ফেলল না তো! তাকে অন্যমনস্ক দেখে আশ্বস্ত হয়ে জানতে চাইল, 'আজ আগে নামবে কে?'

'ক্যাপ্টেন ফকম্যান একটু আগে একটা স্কেজিয়ুল করেছেন,' ফকম্যানের দিকে ইশারা করল রাশেদ।

সুইম শর্ট পরেছে রন ফকম্যান, গায়ে চড়িয়েছে হাওয়াইন শার্ট। ঝুঁকে পড়ে ডাইভ হেলমেটগুলোর রেগুলেটর পরীক্ষা করছে। মাথায় পরেছে নীল একটা হ্যাট। ক্যাপ্টেনদের এই হ্যাট একসময় ক্লাসিক স্টাইল হয়ে ওঠে, মস্ত বড়লোক ইয়ট মালিকরা ধরে নেয়, এ না পরলে আর সম্মান থাকে কই। তবে ক্যাপ্টেন হয়ে খাতির পাওয়ার পথ ফকম্যানের বন্ধ, তার হ্যাট অতি পুরনো। দেখে যে-কেউ হলফ করে বলবে: কোনও সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এম-ওয়ান ট্যাঙ্কের নীচে পড়েছিল ওটা।

'আই-আই, তা-ই করেছি,' কড়কড়ে কর্কশ কণ্ঠে প্রায় ধমকে উঠল রন ফকম্যান। 'দু'জন করে নব্বই মিনিট পানির নীচে থাকব আমরা। বিশ্রামের পর পালা বদল হবে। রাশেদ আর আমি প্রথম দফা নামছি। দ্বিতীয়বারে আমার সঙ্গে নামবে তুমি, মিতা। রাশেদ তখন আরাম করে সূর্যের নীচে শরীর ট্যান করবে।'

'সেক্ষেত্রে এ বার্জে অন্তত তিন পেগ রেশার থাকা উচিত,' হেসে ফেলল রাশেদ।

'দুঃখের কথা, এক ফোঁটাও নেই। গতরাতেই খতম রামের ওই শেষ কয়েক ফোঁটা। অবশ্য ওষুধ হিসাবেই ব্যবহার হয়েছে।' বারকয়েক কেশে উঠল ফকম্যান।

একটু ঘাবড়ে গেল রাশেদ। মানুষটা কীভাবে গেলে অত মদ! আকাশে চোখ তুলল মিতা, তাড়া দিল, 'তৈরি হয়ে নাও তোমরা! কপাল ভাল থাকলে আজই খুঁজে পাব হাল। তারপর অনেক কাজ রয়েছে। লিংকন আবারও সার্ভে করতে আসার আগেই সরিয়ে নিতে হবে গ্রিড মার্কারগুলো। তার ফাঁকে একটু বিশ্রামও দরকার। জলদি!'

উঠে দাঁড়াল রন ফকম্যান, একটানে খুলে ডেকের উপর দিয়ে ভাসিয়ে দিল হ্যাটটা। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে সঙ্গিনীর মাথায় বসল ওটা। চমকে গেছে মিতা। হাসিমুখে বাউ করল রন ফকম্যান, 'কী বুঝলে, সুন্দরী?'

হাসছে রাশেদ। লাল হয়ে উঠল মিতার দুই গাল। রেগে গিয়ে বলল, 'সাবধান, বুড়ো ভাম, ভুলে যেয়ো নাঃ তুমি যখন পানির নীচে, ঠিক তখনই সারফেস এয়ার বন্ধ করে দিতে পারি আমি।'

দুই কমপ্রেসর চালু করেছে রাশেদ। পরে নিল ওয়ার্ম-ওয়াটার ওয়েট সুট। একটা কমপ্রেসর থেকে নীচে পৌঁছুবে ওদের বাতাস। ভারী এয়ার-ট্যাঙ্ক নিয়ে কাজ করতে হবে না, থাকতেও পারবে বহুক্ষণ। ওরা যেখানে নামছে, সেখানে পানির গভীরতা মাত্র তিরিশ ফুট। থিয়োরি অনুযায়ী, যে-কেউ সারাদিন ওখানে ডুবে থাকতে পারবে, বেণ্ডের ভয় নেই।

এয়ার-লিফটের লম্বা, মোটা পিভিসি পাইপ বার্জের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিল মিতা। দ্বিতীয় কমপ্রেসর-এ যুক্ত হয়েছে হোস-পাইপ, সঙ্গে এয়ার-ফিড নিয়ন্ত্রণের ভালভ। এয়ার-হোসের ভিতর দিয়ে সাবধানে পাইপ নামিয়ে চলেছে মিতা। একটু পর নীচের জমিতে ঠেকল ওটা, ঢিল পড়ল লাইনে।

ফিন পরে নিয়ে ঘড়ি দেখল রাশেদ। বোনের উদ্দেশে বলল, 'নব্বই মিনিট পর দেখা হবে।' ডাইভ হেলমেট পরে নিল মাথায়।

কমপ্রেসরের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল মিতা, 'আমি বাতি জ্বেলে দিচ্ছি।' রেলিঙের পাশে চলে গেল, বাতাসের তিনটে পাইপ বেছে নিল। পাইপগুলো না থাকলে পানির নীচে কাজ করা অসম্ভব। একবার বোনের উদ্দেশে হাত নাড়ল রাশেদ, তারপর বার্জ ছেড়ে নেমে পড়ল পানিতে। পরের সেকেণ্ডে পিছু নিল রন ফকম্যান।

পানির নীচে তলিয়ে যেতেই টের পেল রাশেদ, হারিয়ে গেছে কমপ্রেসরের আওয়াজ। চারপাশে চাইল, সব স্বচ্ছ নীল। নীচের দিকে তাক করল মাথা, দ্রুত নেমে গেল নীচের জমিতে। দেরি হলো না এয়ার-লিফট খুঁজে নিতে। ওটা নিয়ে সঙ্গীর পিছু নিল আরও গভীর পানির দিকে চলেছে রন ফকম্যান। কমলা রঙে

দুটো পতাকার কাছে গিয়ে থামল ওরা। পায়ের নীচে বালি-জমি। ঋজু হয়ে দাঁড়াল রাশেদ, দু'হাতে শক্ত করে ধরল এয়ার-লিফট। কণ্ট্রোল লিভার টেনে চালু করল বাতাসের পাইপ। কমপ্রেসরের বাতাসের দাপট প্রচণ্ড হয়ে উঠল, পৌঁছে গেল পাইপের নীচের অংশে—গড়গড়ার আওয়াজে তুলছে বালি ও পানি। এয়ার-লিফটের নীচের অংশ জমির দিকে তাক করেছে রাশেদ। ভাবটা এমন, ঝাড়ু দেবে। কিন্তু আসলে পতাকার কাছে তৈরি হচ্ছে ছোট এক গর্ত।

ক' মুহূর্ত রাশেদের কাজ লক্ষ করল রন ফকম্যান, তারপর খানিকটা দূরে গিয়ে থামল। এক হাতে ক্রস হ্যাণ্ডেলওয়ালা স্টেইনলেস স্টিলের শাফট্। বালির ভিতর মুচড়ে ভরতে চাইল দণ্ড বালির দু' ফুট গভীরে ঠেসে দিল ওটা। নীচ থেকে শক্ত বাধা আসতেই বুঝল, যা চাইছে তার কাছে পৌঁছে গেছে শাফট। পাকা হাত, আওয়াজটা জানিয়ে দিল, নীচে রয়েছে কাঠের কিছু। এক টানে দণ্ড বের করল ফকম্যান, আরেক পা গিয়ে আবারও থামল। নীচে যতক্ষণ কাঠ থাকবে এভাবে এগুবে। কয়েকবার শাফট্ চালিয়ে বুঝল, জিনিসটা কোথায়। ছোট্ট কমলা পতাকা পুঁতে দিল বালির উপর।

এয়ার-লিফট দিয়ে ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি করছে রাশেদ। বালির নীচের সমতল অংশ বেরিয়ে আসছে ক্রমে। পানির নীচে বহুকাল থেকেছে এ জিনিস, ক্রাস্ট পড়েছে। মার্কার পতাকা দিয়ে যেখানে চিহ্ন দিয়েছে রন, সেদিকে চাইল রাশেদ। সন্দেহ নেই, নীচের জিনিসটা প্রকাণ্ড। সম্ভবত জাহাজের খোল। তা-ই যদি হয়, ওদের ধারণা পাল্টে নিতে হবে। বালির নীচে যে জাহাজটা রয়েছে, সেটা হয়তো আরও অনেক বড়!

বার্জের ডেকে কমপ্রেসর আরেকবার পরীক্ষা করল মিতা, সব ঠিকঠাক চলছে। তবে বাতাসের লাইনের কাছ থেকে সরল না, বসে পড়ল বিচ চেয়ারে। সাগর ছুঁয়ে আসা শীতল হাওয়া কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ওর শরীরে। মিতা ভাবল, কপাল ভাল যে সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে রয়েছে ডেক!

চুপচাপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। পাথুরে হাওয়াই উপকূল, রুক্ষ, উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো—এরও আলাদা সৌন্দর্য নেই, তা নয়। সবুজ এ দ্বীপ থেকে ভেসে আসছে ফল ও ফুলের নানান রকম সুবাস। সাগরের দিকে চাইল মিতা, ওদিকে যতদূর চোখ যায়, একের পর এক ঢেউ এগিয়ে চলেছে কোথাও হারিয়ে যেতে। নীলের বিভিন্ন শেড পড়ছে সাগরে, ওদিকে চাইলে মনে হয়, এর গভীরতার শেষ নেই। মাসুদ ভাইয়ের মনটার মত। আনমনা হয়ে গেল মিতা! কিছুক্ষণ পর খেয়াল করল, এদিকে এগিয়ে আসছে কালো রঙের একটা জাহাজ। সাগরের তাজা হাওয়া বুক ভরে নিল ও, হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। ভাবল, একে যদি বলে কাজ, ও বাকি জীবন তা-ই করতে চায়, কখনও ছুটি চাইবে না।

ওদিকে কালো জাহাজটা তরতরিয়ে এগিয়ে আসছে ওদের বার্জের দিকে।

তেরো

সকাল সাতটা।

হোটেল কন্টিনেন্টাল, উলানবাটোর।

একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে মাসুদ রানা, দশ মিনিটে বাথরুম সেরে জামা-কাপড় পরে তৈরি। ঝরঝরে লাগছে দেহ-মন। নাস্তার জন্য নীচে নামবে, নাকি রুম-সার্ভিসকে ডাকবে, ভাবছে। এমন সময় হঠাৎ জোর টোকার আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠল। ধীর পায়ে চলে গেল দরজার পাশে। বাম হাতে ধরল নব, আস্তে করে খুলল দরজা।

হাসি-হাসি চেহারা করে জানতে চাইল ববি মুরল্যাণ্ড, 'বলো তো কে এসেছে?'

'আর কে? সেই পুরানো পাবলিক, তুমি।' দরজা হাট করে খুলে দিল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল ববি। 'ভুল বললে। আর কেউ... গেস্ করো!' দরজার খানিকটা জায়গা ছাড়ল সে, বাম হাতে টানছে কাকে যেন! 'তুমি বোধহয় চেনো একে?'

ববির চওড়া দেহের পাশে সাক্ষাৎ দিল লম্বামত এক লোক। উস্কোখুস্কো চুল, চোখদুটো লালচে, গাল ভরা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ববি মুরল্যাণ্ড ঘরে ঢুকতেই পিছু নিল সে।

বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'কী করে!'

'তাড়া খেয়ে!' বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ভাঙা স্বরে বলল তিন কদম এগিয়ে ধপ করে বসল সোফায়। 'তুই-ই বল্, মরতে চায় কেউ?'

'মরার কথা আসছে কেন? কীসের তাড়া খেয়ে পালিয়েছিস?' দরজা বন্ধ করে ঘুরে চাইল রানা প্রাণের বন্ধুর দিকে। 'তুই এখানে কেন?'

'বাঁচতে রে, শালা! কে না বাঁচতে চায়? দুলাভাইকে দেখে খুশি হোসনি?' টেবিল থেকে এক থাবায় রানার সিগারেটের প্যাকেট দখলে নিয়ে নিল সোহেল। এক শলা বের করে ঝুলিয়ে নিল ঠোঁটে, লাইটার দিয়ে ধরিয়ে ভুস করে ছাড়ল ধোঁয়া।

'খুলে বল্!' খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে রানা।

'প্রতিদিন ডাকে আমাকে বুড়ো। উসিলা বের করে এমন চেহারা করে, চোখ পাকায়, এই মারে তো সেই মারে। সবার এই একই অবস্থা। সবার সঙ্গে খ্যাচম্যাচ। একমাত্র সোহানা ছাড়া। অ্যাসাইমেন্টে আছে তো, বেঁচে গেছে ছেমড়ি।'

'কী বলিস, বস্ এমন নয়! কোনদিন কারও সঙ্গে...

'আপনি কী জানেন, স্যর?' প্রায় খেপে উঠল সোহেল, রাগের ঠেলায় *আপনি* বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। 'সেই কটমটে লাল চোখ যদি দেখতি! ক' দিন খুশি রাখতে গিয়ে বুঝলাম, ওই বুড়ো সত্যিই খুন করবে আমাকে! ঠিক তখনই বুদ্ধি এল, সোজা গিয়ে বললাম, আমাকে ছুটি দিতে হবে, স্যর। বুড়ো চোখ সরু করে চাইল, ঝুঁকে জানতে চাইল, "কোথায় যাবে ভাবছ?" যেই বলেছি বৈকাল হ্রদ, ব্যস, হাসি-হাসি হয়ে উঠল ব্যাটার চেহারা।

এক কথায় জানিয়ে দিল, "যাও। বৈকাল হ্রদ তো চমৎকার জায়গা। খুবই ভাল। ওদিকে যাচ্ছ যখন, উলানবাটোরও একপাক ঘুরে এসো। ওখানে রানা আছে।"' রাগ-রাগ ভঙ্গিতে বসের উচ্চারণ নকল করে শোনাল সোহেল। 'ইশ্‌শ্‌! ওখানে চকলেট আছে... আমরা যেন কেউ না!'

'বলিস্ কীরে?' শুনবার ফাঁকে তাক করে ছিল রানা, এক ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সিগারেটের প্যাকেট। এক হাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সোহেল।

'আহ্-হা! পেয়েও হারালাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'আজকাল আমার কপালটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে রে! অবশ্য বাঁচলে এ জিনিস আবারও হাতে পাব।'

দূরের সোফায় গিয়ে বসল রানা। রবি-সোহেল আগেই নাস্তা সেরেছে শুনে রুম সার্ভিসকে বলে দিল ওর জন্য গোটা ছয়েক বাটার-টোস্ট, পোয়াটেক পনির, চারটে ডিমসেদ্ধ আর তিন কাপ কফি পাঠাতে। সোহেলের দিকে ফিরে ভ্রূ নাচাল, 'আর কী হয়েছে?'

'আরও জানতে চাস? খ্যাপা বুড়ো বলল লিস্তভিয়াঙ্কায় গেলেই মিলবে এক লোক। সে উলানবাটোরে চলেছে একটা ট্রাক নিয়ে। ওটাতে উঠলেই পৌঁছে যাব তোর কাছে। ওই লিস্তভিয়াঙ্কা প্রায় চষে ফেললাম তাকে খুঁজে বের করতে। আমাদের এই ববি মুরল্যাণ্ডের লোক। নুমার। হোটেল-কামরায় কোঁ-কোঁ করছে এখন নিউমোনিয়ায়। অনুরোধ করে বলল, "আপনি যখন যাচ্ছেন, ট্রাকটা নিয়ে যান।" নিলাম। জানতাম না এ দেশে পাকা রাস্তা বলতে কিছুই নেই।'

'কে বলেছে নেই?'

'অ্যাইয়ো! চোপ!' চোখ পাকিয়ে ধমক মারল সোহেল। 'সারারাত কীসের উপর দিয়ে এলাম, সেটা আমি জানি! আমার ইয়ে বলতে কিছুই থাকল না, আর ইনি বলেন...'

ইন রুম পট দেখে ওদিকে চলে গেল ববি, ঢেলে নিয়ে এল দু' কাপ কফি। সোহেলের হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'কপাল ভাল যে মিস্টার আহমেদ আমাদের রিসার্চ গিয়ার আর ডাইভ ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছেন।'

'ওই ট্রাক এক ইন্সটিটিউটের,' বলল সোহেল। 'ওরা আমাকে ওটা ধার দিল, নাকি আমার কাছে বিক্রি করল, ঠিক বুঝলাম না। বোধহয় টাকা দেবে নুমা। রাশান বর্ডার গার্ড মঙ্গোলিয়ায় ঢুকবার আগেই আমার সব রুবল কেড়ে নিল। আমেরিকান যন্ত্রপাতি দেখে ভেবেছে, আমি সিআইএর লোক।'

'না, তা ভাববে না,' বিড়বিড় করে বলল ববি। 'আপনার চেহারা অত খারাপ না।'

'ভোরে এখানে এসে নাস্তা সেরে যোগাযোগ করতে চাইলাম,' বলল সোহেল। 'ভুল নম্বরে ইণ্টারকম করল রিসেপশনিস্ট, ডেকে তুলল মিস্টার মুরল্যাণ্ডকে। ওঁর কাছেই শুনলাম গোবি মরুভূমির কাহিনি।'

'পিকনিক ছিল না, এটুকু বলতে পারি,' বলল ববি।

'প্রত্যন্ত এলাকা দেখতে আর আদিবাসীদের আতিথেয়তা পেতে চাইলে হাঁটা ছাড়া পথ নেই,' মুচকি হাসল রানা।

বেয়ারা নাস্তা সাজিয়ে দিয়ে গেল, সেটির সামনে নিচু টেবিলে। একটা টোস্ট তুলে কামড় দিল রানা।

'সানা-ভুর ওই সাড়ে হারামজাদা এখনও অয়েল সার্ভে

টিমকে আটকে রেখেছে,' বলল ববি। 'এডি খতম, অন্য দু'জনকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে কি না, কে জানে!'

আলাপ থমকে গেল টেলিফোন বেজে উঠতে। উঠে গিয়ে ধরল রানা। দশ সেকেণ্ড চুপচাপ শুনল, তারপর ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল ফোন। স্পিকারটা চালু করতে বেরিয়ে এল ল্যারি কিঙের জোরাল কণ্ঠ, 'ওয়াশিংটন থেকে তোমাদের খোঁজা হচ্ছে, রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন জানতে চান তোমরা দুষ্টু ছেলেরা কোথায় গিয়ে কী করছ!'

'পিকনিক করছি গ্রেটার মঙ্গোলিয়ায়,' তিক্ত স্বরে বলল ববি। 'পানির নীচে খুঁজে মরছি অতুলনীয় এক গুপ্তধন!'

'শুনলাম তোমাদেরকে বিপদে ফেলে বেশ খানিকটা ভেঙে পড়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?' স্বগতোক্তি করল কিং।

রানার দিকে চাইল সোহেল, নিচু স্বরে বলল, 'আমাদের বুড়োও। খুব ঝেড়েছেন অ্যাডমিরালকে।'

'দুনিয়ার ওই অংশে তোমরা, নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জানো রাজনীতিকদের হুলুস্থুল কাণ্ড?' জানতে চাইল ল্যারি কিং।

রানা, সোহেল ও ববি পরস্পরের দিকে চাইল।

রানা বলল, 'আমরা জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কীসের হুলুস্থুল কাণ্ড, ল্যারি?'

'আজ সকালে অদ্ভুত এক ঘোষণা দিয়েছে চিন। কোনও শর্ত ছাড়াই। মঙ্গোলিয়াকে ফিরিয়ে দেবে আস্ত ইনার মঙ্গোলিয়া!'

'তাই তো নাস্তার পর ট্রাক সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখি স্কয়্যারে বহু লোকে জড় হয়েছে,' বলল সোহেল। 'উৎসব চলছে। আমার মনে হয়েছে, স্থানীয় কোনও ছুটির দিন বুঝি আজ।'

'প্রতিবেশী দেশকে এই যে রাজনৈতিক বদান্যতা দেখিয়েছে চিন, এ জন্য চিন সরকারের প্রচুর প্রশংসা চলছে ইউনাইটেড নেশনস্-এ। পশ্চিমা নেতারা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছেন চিনা নেতাদের। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, বহুদিন ধরে ইনার মঙ্গোলিয়ার মানুষ স্বাধীনতা চাইছে চিনের কাছ থেকে। তাদের কথা ছিল, হয় আমাদের মুক্তি দাও, নয়তো মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে দাও। এতদিন ওই এলাকার মানুষ গোপনে লড়াই করেছে চিনের বিরুদ্ধে। এখন অ্যানালিস্টরা বলছে, চিনের এটা রাজনৈতিক চাল। চিন আশা করছে, মঙ্গোলিয়ার কাছ থেকে বিপুল অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাবে। কেউ কেউ বলছে, এই রাজনৈতিক চুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক পাইপ-লাইন চুক্তি। মঙ্গোলিয়া পেট্রোলিয়াম বা এ ধরনের কোনও সম্পদ দেবে, এটা আশা করছে মহাচিন। কিন্তু আমরা সবাই জানি, মঙ্গোলিয়ায় আসলে মূল্যবান কিছুই নেই, পেট্রোলিয়াম তো বহু দূরের কথা!'

'এদের পেট্রোলিয়াম আছে কি না, জানি না; তবে ববি আর আমি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক তেল চুক্তির সঙ্গে জড়িত ছিলাম,' বলল রানা। একবার ববির দিকে চাইল।

'জানি তো, কিছুর সঙ্গে না জড়ালে তোমাদের চলে না,' হাসল ল্যারি কিং।

'ওই চুক্তির সঙ্গে জড়িত বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম ও জালাইর তেমুজিন,' বলল রানা। 'তার কিছু সম্পদ দেখেছি আমরা। একেবারে সীমান্তের কাছে। স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি।'

'ভাবতে পারিনি এত দ্রুত রাজত্ব পাবে,' বলল ববি। 'হাতে বোধহয় তুরুপের টেক্কা।'

'অথবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে খেলছে,' বলল রানা। 'ল্যারি,

তোমার কাছে যে মেসেজ পাঠিয়েছি, সেগুলো ঘেঁটে দেখেছ?'

'ভিনাস আর আমি সারারাত জেগেছি তোমার ওই তথ্যগুলো খুঁজতে। যতদূর জানা গেল, জালাইর তেমুজিন আর তার তেল কোম্পানিকে একটা মস্ত ঝামেলা বলা যায়। ওই কোম্পানির রিজার্ভ ক্যাপিটাল অনেক, কিন্তু ব্যবস্থাপনা পুরানো চালে চলে।'

'স্থানীয় এক রাশানের কাছ থেকেও তা-ই জেনেছি,' বলল ববি। 'এদের তেলের হোল্ডিং কেমন?'

'এমন কোনও রেকর্ড নেই যে মঙ্গোলিযা কোথাও তেল রপ্তানি করছে। এ কথা যখন উঠল, এখন পর্যন্ত মঙ্গোলিয়া প্রায় কিছুই রপ্তানি করে না। তবে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম রাশার কয়েকটা কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম তুলছে।'

'তার মানে এত তোলে না যে চিনের বিশাল চাহিদা মেটাতে পারবে,' বলল রানা। 'অন্য কোনও দেশে রপ্তানি করে?'

'না। তেমন কোনও প্রমাণ পাইনি। অবাক লেগেছে আরেকটা কারণে। পশ্চিমা কয়েকটা অয়েলফিল্ড ইকুইপমেণ্ট সাপ্লায়ারের সঙ্গে চুক্তি করেছে এরা। গ্যাসোলিনের দাম আকাশ ফুটো করে স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছে, তেল কোম্পানিগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নতুন তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করতে, ড্রিল করতে; কাজেই এসব ইকুইপমেণ্ট সরবরাহকারীদের এখন পোয়া বারো। তাদের হাতে এখন লম্বা লিস্টি। নতুন করে যারা যন্ত্রপাতি কিনতে চাইছে, তাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে লিস্টির উপর দিকে রয়েছে বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম। ঘেঁটে দেখলাম, এরা প্রচুর পরিমানে স্পেশালাইয্ড্ ড্রিলিং ও পাইপ-লাইন ইকুইপমেণ্ট নিয়েছে গত তিন বছর ধরে। এসব যন্ত্রপাতি সোজা গেছে মঙ্গোলিয়ায়।'

'তার খানিকটা দেখেছি আমরা উলানবাটোর থেকে কিছু দূরে ওদের কারখানায়,' বলল রানা।

'সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত লেগেছে একটা টানেল বোরিং ডিভাইস,' বলল ল্যারি। 'বিশেষ মডেলের জিনিস ওটা। রপ্তানি করা হয় মালয়েশিয়ায়।'

'বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের ফ্রন্ট কোম্পানি?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভবত। তোমরা এদের যে মডেলের বোরিং ডিভাইস দেখেছ, ওটা ছিল অগভীর পাইপ-লাইন খুঁড়বার জন্য। এক কথায়, ওটা দিয়ে গোবি মরুভূমির নরম বালি খুঁড়ে পাইপ-লাইন বসিয়েছে। একটা ব্যাপার আমি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি—কীভাবে জালাইর তেমুজিন পেল এত টাকা। এত দামি ইকুইপমেন্ট এদের, কিন্তু টাকাটা এল কোথা থেকে?'

'চেঙ্গিস খান সাহায্য করছে তাকে,' বলল রানা।

ওর দিকে চাইল সোহেল। 'ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা করেনি,' বলল ববি। 'ওই লোক ঘুমিয়ে আছে জালাইর তেমুজিনের বাড়ির পিছনে। কবরে।' সংক্ষেপে জানাল ও কোথায় আছে চেঙ্গিস খানের কবর, কীভাবে ঢুকে পড়ে ওরা জালাইর তেমুজিনের কম্পাউণ্ডে।

পকেট থেকে দশ পাতা ফ্যাক্স বের করল রানা, গত রাতে পেয়েছে বিউ মরটনের কাছ থেকে। 'আমার সঙ্গে একমত বিউ,' বলল ও, 'সথ্‌বি আর অন্যান্য বড় অকশন হাউসগুলো গত আট-নয় বছর ধরে নিয়মিত একের পর এক কনসাইনমেন্ট পেয়ে আসছে। সব বারো শ' বা তেরো শ' সালের আর্টিফ্যাক্ট। ওগুলো যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে।'

'চেঙ্গিস খানের সঙ্গে কবরে দেয়া হয়?' বিড়বিড় করে বলল সোহেল। উত্তেজিত হয়ে উঠে আনমনে প্লেট থেকে একজোড়া বাটার-টোস্ট তুলে নিয়ে কামড় দিল।

'সব মিলে কয়েক শ' মিলিয়ন ডলারের জিনিস। ভূগোল ও ইতিহাসের বই ঘেঁটে বিউ জানিয়েছে, যেসব আর্টিফ্যাক্ট পশ্চিমে গেছে, সব চেঙ্গিস খানের সেই আমলের। তখন রাজত্ব বাড়িয়ে চলেছে সে। মনের খুশিতে লুটপাট করছে। কিন্তু কয়েক শ' বছর পর তার সব লুটে নিয়ে গেল জালাইর তেমুজিন ও তার সহযোগীরা। এসব আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করেছে ছায়ায় লুকিয়ে থাকা এক মালয়েশিয়ান কোম্পানি। নামঃ বরজিন ট্রেডিং কোম্পানি।'

'ওই একই কোম্পানি সুড়ঙ্গ খুঁড়বার মেশিন কিনেছে,' বলল ল্যারি কিং।

'দুনিয়া বড্ডো ছোট জায়গা, কী বলো?' আস্তে করে মাথা নাড়ল ববি।

'ল্যারি, একবার ভিনাসকে নিয়ে খুঁজে দেখবে, ওই কোম্পানি আর কী কী করছে?' বলল রানা।

'নিশ্চয়ই দেখব। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। তুমি জার্মানির এক ইকুইপমেন্টের কথা লিখেছ। একটা ইলেকট্রিকাল ডিভাইস?'

'হ্যাঁ। ওটার সঙ্গের ডকুমেন্ট খুবই জটিল মনে হয়েছে আমার। ভিনাস কিছু পেল?'

'খানিকটা। তোমার দেয়া পাতাগুলো হাইলি টেকনিকাল অপারেটিং ম্যানুয়াল।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ওই ঘর ভরা ছিল কম্পিউটিং ইকুইপমেন্ট,' বলল ববি।

'তিন সিলিণ্ডারওয়ালা একটা ডিভাইসকে চালায় ওগুলো। পায়ের কাছ থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত দশ ফুট উঁচু ছিল। পারলে বলো দেখি, ল্যারি, ওটা কী?'

'আমাকে যথেষ্ট ডেটা দেয়া হয়নি, কাজেই বলতে পারব না ডিভাইসটা কীসের। পাতাগুলো শুধু অপারেটরের ইন্সট্রাকশান। ওগুলো বলছে, ডিভাইসটা এক ধরনের অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে।'

'অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে?' এক ভ্রূ আকাশে তুলল ববি। 'একটু সহজ ইংরেজি দিয়ে বোঝাও তো বাপ আমার!'

'ওই জিনিস ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা করতে গিয়ে অ্যালবার্ট বোমার ওটার কাজের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে নেন।'

'বোমারু বিমান আবার কোত্থেকে?' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ববি।

'অ্যালবার্ট বোমার কে, ল্যারি?' জানতে চাইল রানা।

'ডক্টর অ্যালবার্ট ফন বোমার। আ প্রফেসর অভ্ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অভ হাইডেলবার্গ। অ্যাকুস্টিক ও সাইসমিক ইমেজারির ওপর রিসার্চ করে দারুণ নাম করেন। ভিনাস খুঁজে বের করেছে, এই প্রফেসরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে। তাঁর শেষ কিছু পেপারে লিখেছেন, থিয়োরিটিকালি অ্যাকুস্টিক অ্যারেকে প্যারামেট্রিক ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব সাবসারফেস ইমেজারিতে।'

আরও কফি দরকার, কাপ নিয়ে উঠতে গিয়েও উঠল না ববি। স্পিকারফোনে বলে চলেছে ল্যারি কিং, মনোযোগ দিল ওরা সবাই।

'তথ্য খুব বেশি পায়নি ভিনাস। তবে ধারণা করছি, বাস্তবে

কাজ করে এমন এক অ্যাকুস্টিক সাইসমিক ইমেজারির মডেল তৈরি করেন ডক্টর অ্যালবার্ট ফন বোমার। তোমরা বোধহয় জানো, তেল আবিষ্কার করতে চাইলে সাইসমিক ইমেজারি ব্যবহার করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত মেকানিকাল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়—যেমন ডিনামাইট। কখনও থাম্বার ট্রাকও ব্যবহার চলে। ব্যাপারটা দুরমুজ করবার মত। মাটিতে ছড়িয়ে যায় শক ওয়েভ। ওই সাইসমিক ওয়েভ ফিরে এলে তা রেকর্ড করা হয়। পরে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি হয় সাবসারফেস ইমেজ।'

'খানিক বুঝলাম,' বলল ববি। 'যেমন এয়ার-গান দিয়ে শক ওয়েভ তৈরি করে মেরিন সার্ভে জাহাজ।'

'ফন বোমার বোধহয় বিস্ফোরণের বদলে ইলেকট্রনিক শক ওয়েভ আবিষ্কার করেন। অ্যাকুস্টিক অ্যারে বলতে যতটুকু বুঝছি, হাই-ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ ছুঁড়ে মারে ওটা। মাটির নীচে ওটা সাইসমিক ওয়েভ হয়ে ওঠে।'

'আমাদের সার্ভে সোনার সিস্টেম হাই-ফ্রিকোয়েন্সির হয়, কিন্তু ও দিয়ে বেশি দূর ভেদ করা যায় না,' বলল ববি।

'ঠিকই বলেছ। মাটির বেশি নীচে যায় না বেশির ভাগ ওয়েভ। কিন্তু, ফন বোমারের কনসেনট্রেটেড বার্স্ট কাজ করে সত্যিকারের বোমার মত। সোজা কথায়, ওই সাউণ্ড ওয়েভ অতি কার্যকর। ঘন এই প্রচণ্ড আওয়াজ মাটির অনেক গভীরে পৌঁছে যায়। ম্যানুয়াল থেকে প্রাথমিক ডেটা ও তোমাদের বর্ণনা অনুযায়ী, ফন বোমার তিনটি বিরাট অ্যারে ব্যবহার করেন, মাটির অনেক নীচে পৌঁছে দেন সাউণ্ড ওয়েভকে।'

'কে জানে ওটা দিয়েই হয়তো খুঁজে বের করেছে চেঙ্গিস

খানকে,' বলল ববি। 'ইতিহাস তো বলে, তার কবর লুকিয়ে রাখা হয়েছে এক পাহাড়ি এলাকায়। তার সঙ্গে ছিল কুবলাই খানও, একগাদা বউ নিয়ে।'

'সাইসমিক অ্যারে দিয়ে পেট্রোলিয়াম খুঁজছে!' রানার দিকে চাইল সোহেল।

'এ জিনিস পেলে শত কোটি টাকা দিতে রাজি হবে অয়েল কোম্পানিগুলো,' বলল ববি। 'ডক্টর অ্যালবার্ট ফন বোমার নিশ্চয়ই বিরাট বড়লোক?'

'দুঃখজনক, অ্যালবার্ট ফন বোমার আর বেঁচে নেই। তিনি ও তাঁর সঙ্গের জার্মান ইঞ্জিনিয়াররা গতবছর মারা যান মঙ্গোলিয়ায়, একটা ভূমি-ধসে।'

'খুবই দুঃখ এবং সন্দেহ-জনক,' বলল ববি।

'একটা কথা বোধহয় বলা বাহুল্য হবে, এঁরা কাজ করতেন বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়ামের হয়ে,' বলল ল্যারি।

'বহু মানুষের রক্ত হাতে মেখেছে জালাইর তেমুজিন,' বলল রানা।

'সব মিলে কী পাই আমরা?' বলল ববি। 'একটা সাইসমিক সার্ভে টিম খুন হলো। আরেকটা কিডন্যাপড হলো। সুড়ঙ্গ খুঁড়বার একটা মেশিন দেখলাম। ওটা দিয়ে বিশেষ ড্রিলিং চলে। গোবির মাঝখানে পেলাম ছদ্মবেশী কিছু স্টোরেজ ট্যাঙ্ক। আমাদের পরিচিত উট-পালকের কাছ থেকে জানলাম, অমন গ্রাম আরও আছে। বালির নীচ দিয়ে গেছে লুকানো পাইপ-লাইন। কোথায় কে জানে! কীসের জন্য?'

নীরব হয়ে গেল ঘর। ভাবছে ওরা যে-যার মত। কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'তেলের জন্য, এটা তো জানা কথাই। কিন্তু

তেল যেখানে আছে, সেখানে এতদিন ড্রিল করতে পারেনি।'

'জালাইর তেমুজিনের টাকার অভাব নেই, ইচ্ছা করলেই মঙ্গোলিয়ান আমলাদের কিনে নিতে পারত,' আপত্তি তুলল ববি।

কিন্তু তেল যদি মঙ্গোলিয়ায় না থাকে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। 'বুঝলাম। লোকটা তেল খুঁজে পেয়েছে চিনে। তার মানে, তেল আছে ইনার মঙ্গোলিয়ায়!' রানার দিকে চাইল সোহেল। 'চিনা কর্তৃপক্ষ রাজি হয় কী করে? অধিকৃত জমি দিয়েই দিল একেবারে?'

'যাতে জমি দেয়, সেজন্য ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা নিয়েছে,' বলল ল্যারি। 'পারস্য উপসাগরে ঘটেছে দুই-দুইটা ভূমিকম্প, এদিকে শাংহাইয়ে আগুনে পুড়ে গেল চিনের প্রধান তেল আমদানি টার্মিনাল। একদিনে দেশের অর্ধেক পেট্রোলিয়াম শেষ! পরিস্থিতি এতই নাজুক, চিনের মাথা গরম। ঠিক তখনই পলিটিশিয়ানদের প্রস্তাব দিল বরজিন অয়েল কনসোর্টিয়াম: আমাদের সঙ্গে চুক্তি করো, যত পেট্রোলিয়াম চাও, যোগান দেব। কোনও উপায় না পেয়ে রাজি হয়ে গেছে চিন সরকার।'

'জালাইর তেমুজিনের স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি এজন্যই সীমান্তের কাছে,' বলল সোহেল। 'এরইমধ্যে হয়তো ইনার মঙ্গোলিয়ায় তেলের দু'চারটে কুয়া চালু করেছে।'

'লোকটার খেলাটা দ্যাখ্,' বলল রানা। 'চিনারা দেখবে পরিশোধিত তেল আসছে মঙ্গোলিয়া থেকে! জানবে না আসলে সবই আসছে তাদের পিছনের উঠান থেকে!'

'ওরা যখন টের পাবে, এ দেশের ধারেকাছে থাকতে চাইব না আমি,' বলল সোহেল।

'এখন বুঝতে পারছি কেন বৈকাল হ্রদ থেকে সার্ভে টিমকে

কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে,' বলল ববি। 'লোকটা চাইছে স্পেশালিস্টরা ড্রিল সাইট ঠিক করুক। দ্রুত তেল তুলতে হবে তাকে।'

'খোলা বাজার থেকে এক্সপার্ট নিতে পারত,' বলল ল্যারি।

'হয়তো পারত,' বলল সোহেল। 'কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি। তেল-ক্ষেত্র কোথায় একবার ওই খবর বেরিয়ে গেলে আর কিছুই করতে পারত না।'

'এবার হয়তো সার্ভে টিমের সদস্যদের ছেড়ে দেবে,' বলল ল্যারি। 'লোকটা তো যা চেয়েছে, সবই পেয়েছে।'

'ছাড়বে না,' বলল রানা। 'আগেই ওই দলের এক সদস্যকে খুন করেছে। ববি আর আমাকেও শেষ করতে চেয়েছিল। ধরে নাও, সার্ভে টিমের বাকি দুই সদস্যও মরতে চলেছে। একবার ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেই ব্যস, খুন করবে।'

'ববি, তুমি কি আমেরিকান এম্বেসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?' জানতে চাইল ল্যারি। 'চেষ্টা করলে হয়তো মানুষগুলো বাঁচত।'

রানার দিকে চাইল ববি, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। ল্যারির উদ্দেশে বলল, 'কূটনৈতিক চেষ্টা করে বাঁচানো যাবে না ওদের, ল্যারি। মঙ্গোলিয়ান সরকারের ভিতর লম্বা হাত জালাইরের। দাপট অনেক বেশি। রাশান এম্বেসির এক বন্ধু চেষ্টা করে দেখেছে। কিছুই করতে পারেনি। অথচ দুনিয়ার এদিকে রাশার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।'

'তবু কিছু তো করা উচিত?' স্বগোতোক্তি করল ল্যারি।

'করছি তো,' বলল রানা। 'ওই লোককে খুঁজে নেব আমরা ওরই এলাকায়।'

'তোমরা কিন্তু নুমার কর্মকর্তা,' সাবধান করল কালো মানিক। 'তোমরা যদি ফেঁসে যাও আমেরিকান সরকার আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারীর মুখে পড়বে! ববি তো অ্যাম্বাসেডারের সাহায্য নিতে পারে। অন্তত পিস্তল তো পাবে?'

'ইউএস এম্বেসিতে যেতেই পারতাম, যদি ওটার প্রধান এখন ম্যাক মুর্ডারসন না হতো,' বলল ববি। 'কলেজ লাইফ থেকে আমার জানের শত্রু লোকটা। যদি গিয়ে পিস্তল চাই, হো-হো করে হেসে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। কাজেই যাচ্ছি না।'

সোহেল ও ববির দিকে একবার চাইল রানা, তারপর বলল, 'কোনও কেলেঙ্কারী হবে না। যদি হয়ও আমেরিকান সরকার আমাদের কিছুই বলতে পারবে না: আমি আর সোহেল বাংলদেশি। যা করার আমরা করব, ববির দোষ কই, ও তো চলেছে বন্ধুদের সঙ্গে সানা-ডু দেখতে।'

চোদ্দ

নুমার কম্পিউটার সেন্টারে ঢুকে পড়লেন ডক্টর জেরেমি হাইন্স। কন্সোলের ফোন রাখছে তখন কিং। 'মঙ্গোলিয়ায় সময় ভাল কাটুক তোমাদের,' বলে রেখে দিল রিসিভার।

কিঙের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হলোগ্র্যাফিক সুন্দরী ভিনাস, ঘুরে চেয়ে হাসল মেরিন জিওলজিস্টের দিকে। 'গুড ইভনিং,

ডক্টর হাইন্স। কাজের খুব চাপ? বিকেল তো পেরিয়ে গেল!'

'এই আর কী! গুড ইভনিং,' বললেন হাইন্স। ঠিক বুঝে উঠছেন না কেমন বোধ করা উচিত। আলাপ চলছে এক কম্পিউটারাইজড্ ইমেজের সঙ্গে! অস্বস্তি বোধ করে দ্রুত ল্যারির দিকে চাইলেন। 'হ্যালো, কিং। সারাদিনই ব্যস্ত?' তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছে ল্যারি কিঙের পোশাকের উপর। ওগুলো পাল্টানো হয়নি।

'তা-ই আসলে,' হাই চাপতে চাইল ল্যারি। 'আমার দুই বন্ধু একটা কাজ দেয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যস্ত ছিলাম ভিনাসকে নিয়ে।'

'তবে তো আমার কাজটা হয়নি?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি ঘণ্টা খানেক ধরে।'

'সারাদিন জরুরি মিটিং ছিল,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'একটু আগে শেষ হলো।' ভদ্রতা করে বললেন, 'ডেটাগুলো না পেয়ে থাকলে, পরেই না হয় নেব।'

'এ কী বলছেন,' মনে হলো অপমানিত হয়েছে ল্যারি। 'একইসঙ্গে হাজারো কাজ সারতে পারে ভিনাস।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, ল্যারি,' সায় দিল ভিনাস। 'আমি তোমাদের মত সহজে হাঁপিয়ে উঠি না।'

এ মন্তব্য পাত্তা দিল না ল্যারি, বলল, 'আপনার ডেটা গতরাতে এনেছে ভিনাস। আজ সকালে আপনার প্রোগ্রাম রান করেছে।' সুন্দরীর দিকে চাইল সে। 'ভিনাস, প্রোগ্রামের ফলাফল প্রিন্ট করে দাও ডক্টর হাইন্সকে। প্রিন্টের কাজ চলুক, সেই ফাঁকে মুখে বলো কী পেয়েছ।'

মিষ্টি করে হাসল ভিনাস। 'নিশ্চয়ই, ডার্লিং।' ল্যারি কিঙের

কণ্ঠস্বর মুহূর্তে বিচার শেষ। জানা হয়ে গেছে মানুষটি এ স্বরে কথা বললে ওর নিজের কী ধরনের আচরণ করতে হবে। ঘরের এক কোণে গুনগুন শব্দে চালু হলো একটা লেজার প্রিণ্টার, শুরু হলো প্রিণ্ট। সেই ফাঁকে কথা সাজিয়ে নিল ভিনাস। 'ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেণ্টার থেকে দুনিয়ার পাঁচ বছরের সমস্ত ডেটা পেয়েছি। গত কয়েকদিনের বড় দুই ভূমিকম্প সহ। আমি আপনার দেয়া সফটওয়্যার প্রোগ্রাম চালিয়ে অ্যানালাইজ করেছি ওগুলো। তুলনামূলক বিচার শেষে মিল খুঁজতে চেয়েছি পুরো ডেটাবেস জুড়ে। দুই ভূমিকম্পে বিস্মিত হওয়ার মত কিছু মিল খুঁজে পেয়েছি।'

কথার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য একটু থামল ভিনাস, এক পা এগিয়ে এল ল্যারি ও ডক্টর হাইন্সের দিকে। 'ওই দুই ভূমিকম্পকে বলা যায় অতিরিক্ত অগভীর ভূমিকম্প। ওগুলোর এপিসেণ্টার ছিল মাটির তিন মাইলের ভিতর। দুনিয়ার সব অগভীর ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছি। মাটির নীচে তৈরি হয় সেসব পাঁচ থেকে পনেরো মাইলের ভিতর।'

'এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য,' বললেন ডক্টর হাইন্স।

'এ দুই ভূমিকম্প একটু আলাদা। ওগুলো ভলকানিক টেকটোনিক কোয়েক নয়। আপনি জানেন, ওগুলো রিখটার স্কেলে সাত মাত্রার বেশি ছিল।'

'একটু অস্বাভাবিক নয়?' বলল ল্যারি। 'এতবড় দুই ভূমিকম্প কাছাকাছি জায়গায়?'

'তা খানিকটা তো বটেই,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'তবে কখনও হয় না, এ কথা বলা যায় না। লস অ্যাঞ্জেলেসে এত বড় ভূমিকম্প হলে ওদিকে চলে যায় সবার চোখ। কিন্তু বাস্তব কথা

হচ্ছে, সাত মাত্রার ভূমিকম্প বিশ্বে প্রতি মাসেই ঘটছে। বেশির ভাগ সময় সভ্যতা থেকে দূরে, বা সাগরের নীচে। ওগুলোর খবরও রাখে না সাধারণ মানুষ।'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' বলল ভিনাস। 'তবে এ দুই কম্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাছাকাছি জায়গায় কাছাকাছি সময়ে হওয়া।'

'আর কোনও মিল?' জানতে চাইল ল্যারি।

'হ্যাঁ, রয়েছে। ও-দুটো ভূমিকম্প অল্প সময়ে দুই সাইটের বিপুল স্ট্রাকচারাল ক্ষতি সাধন করে। সাধারণত এসব ছোট ভূ-কম্পন এটা পারে না। ওখানে যা ঘটেছে সেটা অস্বাভাবিক। আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে যা ঘটতে পারে, তা-ই ঘটেছে ওখানে।'

'রিখটার স্কেল সব সময় সঠিক তথ্য দেয় না, আন্দাজ করা যায় না নির্দিষ্ট এলাকা কতখানি ধ্বংসের মুখে পড়েছে,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'বিশেষ করে অগভীর ভূমিকম্পের সময়। ওই দুই এলাকায় তা-ই ঘটেছে, বেড়ে গেছে ক্ষতির মাত্রা। রিখটার স্কেলের ম্যাগনিচ্যুড রেটিঙের চেয়ে অনেক বেশি কেঁপেছে জমি।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ভিনাস, ডেটাবেস ঘেঁটে দেখছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ডক্টর হাইন্সের দিকে চাইল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ডক্টর। ওই দুই কম্পে তুলনামূলক ভাবে সাইসমিক ওয়েভ সামান্য ছিল, কিন্তু সম্পদ নষ্ট করবার দিক দিয়ে ছিল বিশাল।'

'আর কিছু, ভিনাস?' জানতে চাইলেন ডক্টর। অস্বস্তি কমে এসেছে তাঁর। ভাবছেন, এ তো প্রায় মানবী!

'হ্যাঁ, আরেকটি বিষয়। ওই দুই সাইটে সত্যিকারের

ভূমিকম্প হওয়ার আগে রেকর্ড করা হয় লো-ম্যাগনিচ্যুড পি-ওয়েভ।'

'মূল ভূমিকম্পের খানিক আগে এমন হতে পারে,' বললেন ডক্টর। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়।'

'আপনারা কি দয়া করে বলবেন, কী এই পি-ওয়েভ?' ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল ল্যারি।

আফসোস করে মাথা নাড়ল ভিনাস। 'সব হাতে ধরে শেখাতে হবে, ল্যারি ডার্লিং? এসব তো এলিমেণ্টারি সাইসমোলজি! বেশ, মন দিয়ে শোনো। ভূমিকম্পে তিন ধরনের সাইসমিক এনার্জি তৈরি হয়। প্রথমে যেটা আসে সেটা প্রাইমারি, বা পি-ওয়েভ ওটা। এক ধরনের সাউণ্ড ওয়েভের মত। চলে যেতে পারে পৃথিবীর কঠিন শিলার ভিতর দিয়েও। এরপর তৈরি হয় সেকেণ্ডারি ওয়েভ। ওটার নাম এস-ওয়েভ। ওটা চারদিকের পাথরে ছড়িয়ে পড়ে, ফাটিয়ে দেয় কঠিন পাথর। এই ওয়েভ পাশে ও উপরে উঠতে থাকে, জমির উপর উঠে এসে ফাটিয়ে দেয় জমিন। এই দুই ওয়েভ উপরে উঠবার সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে কাঁপতে থাকে জমি।'

'বুঝলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যারি। 'তার মানে আর্থকোয়েকের এপিসেণ্টার থেকে আলাদা দু'রকমের ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়ে আসে।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর হাইন্স।

'যে দুই সাইটে ভূমিকম্প হলো, সেখানে বিরাট কোনও ফল্ট লাইন আছে?'

'পার্শিয়ান গালফ রয়েছে দুই টেকটোনিক প্লেটের মাঝখানে। সীমান্ত এলাকা বলা যায়। একটা প্লেট অ্যারাবিয়ান, অন্যটা

ইউরেশিয়ান। যেসব জায়গায় সাইসমিক অ্যাক্টিভিটি বেশি দেখা যায়, ওখানে রয়েছে সরু কিছু জায়গা। ওদিক দিয়ে গেছে দুটো প্লেট। ওই কারণে ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ভয়ঙ্কর সব ভূমিকম্প হয়েছে। কাজেই গালফে ভূমিকম্প অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার নয়।'

'মনে হয় আপনার ল্যাংলির বন্ধু তেমন কিছু পাবে না এ থেকে,' বলল ল্যারি।

'জানি না,' বললেন ডক্টর হাইন্স। 'তবে অনেক ধন্যবাদ ভিনাস ও আপনাকে। সিআইএ এক বস্তা ডেটা চিবুতে পারবে।' প্রিণ্টারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

ভিনাসকে শেষ একটা প্রশ্ন ছুঁড়ল ল্যারি, 'ভিনাস, তুমি যখন ডক্টরের প্রোগ্রাম চালু করো, খেয়াল করেছ পৃথিবীর আর সব অগভীর ভূমিকম্প অমন ভয়ঙ্কর কি না?'

'নিশ্চয়ই! খুব সহজেই তোমাকে গ্রাফিক দেখিয়ে দিতে পারি। তুমি বরং ভিডিও বোর্ডে চোখ রাখো।'

ভিনাসের পিছনে সাদা স্ক্রিনে ফুটে উঠল পৃথিবীর রঙিন মানচিত্র। পারস্য উপসাগরে গোল দুটো লাল বিন্দু ফুটে উঠল। ভূমিকম্প ওখানে ঘটে। ক' সেকেণ্ড পর উত্তর এশিয়ায় ফুটে উঠল বেশ কিছু লাল বিন্দু। অন্যগুলো থেকে খানিকটা উত্তরে একটা। ডক্টর হাইন্স রিপোর্টগুলো নামিয়ে রেখেছেন, কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন মানচিত্রের দিকে।

'ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেণ্টার থেকে যা পেয়েছি,' বলল ভিনাস। 'সব মিলে পঁয়ত্রিশটা সাইসমিক ইভেণ্ট। এগুলোর চরিত্র ওই দুই ভূমিকম্পের সঙ্গে একেবারে মিলে গেছে। কিছুদিন আগে একটা হয় সাইবেরিয়ায়।' আঙুল

তুলে লাল বিন্দু দেখিয়ে দিল ভিনাস।

ওদিকে চাইল ল্যারি কিং। 'অন্যগুলো কোথায় ঘটে?'

'বেশিরভাগ মঙ্গোলিয়ায়। ষোলোটা উলানবাটোর শহর থেকে খানিক দূরে, পাহাড়ি এলাকায়। দশটি ওই একই দেশের ডরনোগোভ প্রদেশে। অন্য ন'টা চিনা সীমান্তের কাছে। গোবি মরুভূমিতে। একটা আছে সাইবেরিয়ায়, বৈকাল হ্রদে।'

'মঙ্গোলিয়া,' বিড়বিড় করে বলল ল্যারি। অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল কয়েকবার। ক্লান্ত শরীর টেনে উঠে দাঁড়াল। ডক্টর হাইঙ্গের দিকে চাইল। 'ডক্টর, আমার মনে হয় আমাদের কফি দরকার! চলুন, ক্যাফেটেরিয়া থেকে ঘুরে আসি। একটু বিশ্রাম নিয়ে নিক ভিনাস।'

পনেরো

পোর্টেবল এমপি-ফোরে সিডি বাজছে। শাকিরার নতুন গানের সঙ্গে গুনগুন করছে মিতা, চোখ রেখেছে বাতাসের পাইপের উপর। ওটা টানটান হয়ে বার্জের পাশ দিয়ে নেমেছে পানির নীচে। কিছুক্ষণ হলো বিরক্তি লাগছে। কখন যে পাহারার এই শাস্তি শেষ হবে, আর পানির নীচে গিয়ে কাজে মন দিতে পারবে! উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল মিতা, সাগরের দিকে চাইল। বহুদূরের ওই কালো জাহাজ অনেকটা কাছে চলে

এসেছে। কাহাকাহাকেয়া পয়েণ্ট ঘুরে এদিকে আসছে। কেন যেন অস্বস্তি লেগে উঠল ওর। চেয়ে রইল জাহাজটার দিকে। ওটা সোজা নুমার বার্জের দিকে আসছে না?

'আল্লাহ্, আর কোনও মিডিয়া হাউণ্ড চাই না,' বিড়বিড় করে বলল। ওই জাহাজ থামলে হয়তো বোট ভরে এসে বার্জে উঠবে সাংবাদিকরা। কিন্তু কেন যেন খচখচ করছে মন। জাহাজটা কেমন যেন! এবার বুঝল, অস্বাভাবিকতা কোথায়।

ওটা সাধারণ জাহাজ নয়, কোনও ড্রিল শিপ। ড্রিলিং জাহাজের তুলনায় বেশ ছোট। দৈর্ঘ্যে আড়াই শ' ফুটের বেশি হবে না। কমপক্ষে তিরিশ বছর হবে বয়স। বহুদিন মেরামত করা হয় না। স্কাপারে ঘন হয় জমেছে মরচে। ডেক ও ফো-কাসলের রং চটে গেছে। চারদিকে ধুলো ও গ্রিজ। দেখতে যেমনই হোক, ওই জাহাজ সন্দেহজনক লাগছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছে ড্রিল শিপ? আশপাশে পেট্রোলিয়ামের রিজার্ভ কই? দ্বীপগুলো থেকে একটু গেলেই সাগরের গভীরতা দশ হাজার ফুটের বেশি! অফ-শোর ড্রিলিং তো কোটি কোটি ডলারের ব্যাপার!

চেয়ে রইল মিতা। ঠিক যেন ওর কাছেই আসছে জাহাজ। সাদা ফেনা তুলে তরতর করে এগিয়ে আসছে প্রাচীন বো। আর বড়জোর এক মাইল দূরে। এখনও গতি কমল না। সময় পেরিয়ে চলেছে, চেয়ে রইল ও। সিকি মাইল দূরে চলে এল জাহাজ। গতি এখনও আগের মতই। ওদের কুঁড়েঘরের দিকে চাইল মিতা। ওটার চালের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে ফ্ল্যাগপোল। সকালের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে লাল-সাদা পতাকা। নীরবে জানিয়ে চলেছে, পানির নীচে ডুবুরি!

‘এরা গাধা নাকি, জানে না?’ বিড়বিড় করে বলল মিতা। লোকগুলো বোকার মত এসে বার্জে ভিড়তে চাইছে? অনেক কাছে চলে এসেছে! জাহাজের ব্রিজে লোক দেখা গেল। ওদিকের রেইলিঙের পাশে থামল মিতা, হাত তুলে ডুবুরি পতাকা দেখাতে চাইল। যাক, কাজ হচ্ছে! জাহাজের গতি কমছে। তবে এখনও দিক পাল্টে নিল না। সতর্ক হওয়া উচিত এদের। আরও কয়েক মিনিট পেরিয়ে যেতে মিতা বুঝল, বার্জের গায়ে এসে ভিড়তে চাইছে ওটা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে কুঁড়ের ভিতর ঢুকল ও, চলে গেল পাশের দেয়ালের কাছে। ওটার সঙ্গে ঝুলছে মেরিন ভিএইচএফ রেডিও। ষোলো নম্বর চ্যানেলে বলতে শুরু করল, ‘এগিয়ে আসা ড্রিল শিপ, নুমার রিসার্চ বার্জ থেকে বলছি। পানির নীচে আমাদের ডুবুরি রয়েছে। আবারও বলছি, পানিতে ডুবুরি রয়েছে। দয়া করে দূর দিয়ে চলুন।’

অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে মিতা। কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। কোনও জবাব নেই। রেডিও চুপ। মাইক্রোফোনে একই কথা বলল আবার।

ড্রিল শিপ পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এসেছে। দৌড়ে গিয়ে রেইলিঙের পাশে থামল মিতা, এক হাতে পতাকা দেখিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। মনে হলো, তাতে কাজ হচ্ছে। দিক পরিবর্তন করছে জাহাজ, কিন্তু ভিড়তে চাইছে এই বার্জেই! ভীষণ রাগ লাগছে মিতার। লোকগুলো কী পেয়েছে? নিশ্চয়ই সাংবাদিক! সঙ্গে থাকবে ক্যামেরাম্যান! ওদিকে চেয়ে একটু অবাক হলো। জাহাজের স্টারবোর্ড বা স্টার্ন ডেক খালি। ফো-কাস্‌লে, ব্রিজে যারা রয়েছে, তাদের দেখা গেল না।

জাহাজটাকে নিপুণ দক্ষতায় বার্জে ভিড়িয়ে দিল হেলমস-ম্যান। পাশাপাশি হলো স্টারবোর্ডের রেইলিং। খানিকটা নীচে বার্জেরটা। মাল্টিপল থ্রাস্টার অ্যাক্টিভেট হতেই বার্জের সঙ্গে প্রায় মিশে গেল জাহাজ। আর নড়বে না।

একমিনিট পেরিয়ে গেল। মনে হলো জাহাজটা মানব-শূন্য, ভুতুড়ে। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল মিতা। ভয়ে কাঁপছে বুক—কেন, বলতে পারবে না। তারপর জাহাজের ভিতর থেকে ভেসে এল কয়েকটা কণ্ঠস্বর। বাল্ক হেডের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল ছ'জন লোক। চেহারা কঠোর। শক্তপোক্ত দেহ। মনে হলো চিনা। রেইলিং টপকে নামছে বার্জে। ভয়ে শিউরে উঠল মিতা, ঘুরেই দৌড় দিল ওদের কুঁড়েঘরের দিকে। পিছনে শুনতে পেল পায়ের শব্দ, তেড়ে আসছে! মন চাইল ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, কিন্তু না থেমে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ঘরে। এক ছুটে গিয়ে তুলে নিল রেডিওর মাইক্রোফোন। খেয়াল নেই, চেঁচাতে শুরু করেছে, 'মে-ডে, মে-ডে, আমরা...'

চিৎকার থেমে গেল ওর। কড়া পড়া একটা হাত পিছন থেকে চেপে ধরেছে ওর মুখ। আরেক হাতে দেয়াল থেকে এক টানে ছুটিয়ে নেয়া হলো রেডিও। ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো মাইক্রোফোন। ঘুরে চাইল মিতা। লোকটা ওর চেয়ে খাটো, কিন্তু পেশিবহুল। গাল ভরা শয়তানি হাসি। আরেক পা সামনে বাড়ল সে, তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল ডেকে, সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিল রেডিও। আওয়াজ পেল মিতা, পানিতে গিয়ে ঝপাৎ করে পড়ল ওটা। পরমুহূর্তে ফিরল বদমাশ, থামছে না হাসি। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, যেন মুরগি ধরবে। হলুদ দাঁতগুলো দেখে বমি এল মিতার। ভীষণ রেগেছে নিজের উপর। ভয়

পাচ্ছিস কেন? শান্ত হতে চাইল। মনে মনে বলল, বিপদে কী করা উচিত? মাসুদ ভাই কিছু দিন কারাতে শিখিয়েছিলেন ওদের, সেটা প্রয়োগ করলে কেমন হয়? ভাবল, আরও কয়েক পা আয়, এর পর দেখবি কেমন লাগে। পাঁচ সেকেণ্ড পর এক পা বাড়ল ও, বাম পায়ে ভর দিয়ে ডান পা ছুঁড়ল লোকটার দুই পায়ের সংযোগস্থল লক্ষ্য করে। মুহূর্তে নিভে গেল লোকটার হাসি, প্রায় উল্টে গেছে চোখ। দু'হাতে চোট লাগা অঙ্গ ধরে গোঙাতে শুরু করল।

ভীষণ কষ্ট লাগছে তোর, বদমাশ কোথাকার? ভাবছে মিতা। তবে মাফ করল না, এক পা পিছিয়ে রাউণ্ডহাউস কিক ছুঁড়ল শত্রুর মাথার পাশে। ধপ্ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা, গলা কাটা মোরগের মত ছটফট করছে।

কিন্তু তার দুই সঙ্গী দেখেছে সব। তেড়ে এল তারা। ছোট্ট ঘরের ভিতর নড়বার সুযোগ কম। সুযোগ পেলও না মিতা। দুই বদমাশের একজনের ঘাড়ে চপ বসাতে চাইল, কিন্তু অন্যজন ধরে ফেলল হাত। দু'জন মিলে শক্ত করে ধরল দু'হাত। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল মিতা, কিন্তু সে-সুযোগও থাকল না। বামপাশের লোকটা ছুরি বের করে ঠেসে ধরেছে ওর কণ্ঠনালীর উপর। ফোঁশ ফোঁশ করে শ্বাস ফেলছে ওর কানের কাছে। বিদঘুটে দুর্গন্ধে শ্বাস আটকে এল মিতার।

ডানদিকের লোকটা ঘরে কী যেন খুঁজছে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই দড়ি নিয়ে এল। কনুই থেকে শুরু করে কব্জি পর্যন্ত বেঁধে ফেলল। টের পেল মিতা, ওকে ধীরে ধীরে কাবু করছে ভয়। কিন্তু তা কিছুতেই হতে দেবে না, নিজেকে সতর্ক করল। কড়া চোখে চেয়ে রইল লোকদুটোর দিকে। ভাবছে, যে

দেশের লোকই হোক, ষাঁড়ের মত তাজা। কেউ লম্বা নয়। চিনা হতে পারে। চোয়ালের হাড় উঁচু। কিন্তু চোখ মেলে না। সরু নয়, গোলাকার চোখ। পরনে কালো টি-শার্ট ও ওঅর্ক প্যান্ট। চেহারা বলছে গায়ে খাটা মানুষ। ইন্দোনেশিয়ান জলদস্যু নাকি? কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই! বার্জে দামি বলতে রয়েছে কিছু ইকুইপমেন্ট।

টেনে-হিঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে এসেছে মিতাকে। বার্জের ওদিকে চোখ পড়তে ধক্ করে উঠল বুক। সঙ্গে কুঠার এনেছে দু'জন লোক, কুপিয়ে চলেছে ওগুলো দিয়ে। কেটে দিচ্ছে স্টার্নের দড়িগুলো! কাজটা শেষ করেই বো-র দিকে গেল। এদিকের দড়িগুলো কাটবে! মিতার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে এক লোক। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা চেনা লাগল মিতার। লোকটা ঘুরে চাইতেই চিনল তাকে। থুতনিতে ওই কাটা দাগ ওর চেনা। ডক্টর শিয়েন ঈ! ধীর পায়ে ওর দিকে আসছে। ওদিকে নোঙরের দড়ি কাটছে তার লোক।

রাগে লাল হয়ে গেল মিতা, তিক্ত হয়ে গেল মন। 'এখানে কোনও আর্টিফ্যাক্ট নেই, ডক্টর ঈ!' লোকটাকে সাধারণ আর্টিফ্যাক্ট চোর ভেবেছে।

পাত্তা দিল না ডক্টর ঈ, বিরক্ত চেহারা করে ইকুইপমেন্টগুলো দেখছে। মিতার লাথি খাওয়া লোকটা বেরিয়ে এসেছে দরজা দিয়ে, ব্যথায় কুঁচকে রেখেছে মুখ। বিচিত্র ভাষায় তাকে কী যেন বলল ঈ। আবারও কুঁড়ে-ঘরে ঢুকল লোকটা, চলে গেল জেনারেটরের কাছে। রেডিওর যে অবস্থা করেছে, তা-ই করবে ওটার। মেশিনটা দু'হাতে তুলে নিল, জানালা দিয়ে ফেলে দিল সাগরে। পানির নীচে বগ-বগ আওয়াজে ডুবল গ্যাস চালিত

মোটর। বদমাশটা বেরিয়ে এল ডেকে, তার চোখ পড়ল দুই এয়ার কমপ্রেসরের উপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল একটার পাশে, চোখদুটো খুঁজছে সুইচ।

ওটা অফ করে দিলেই নীচে বাতাস যাওয়া বন্ধ হবে। 'না, এ কাজ করবেন না!' চোখে অনুরোধ নিয়ে ডক্টর ঈ-র দিকে চাইল মিতা।

স্টপ বাটন পেয়েছে আহত লোকটা, মিতার দিকে চেয়ে প্যাঁচানো হাসি হাসল, টিপে দিল সুইচ। সঙ্গে সঙ্গে শ-শ আওয়াজে থেমে গেল কমপ্রেসর।

'নীচে মানুষ, ডক্টর ঈ, ওরা দম আটকে মরবে,' নরম স্বরে বলল মিতা।

কাতর চোখদুটো স্পর্শ করল না ডক্টর ঈ-র মন। নিজ লোকের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল। দ্বিতীয় কমপ্রেসরের পাশে চলে গেল তার স্যাঙাত, মিতার দিকে চেয়ে হাসছে। টিপে দিল স্টপ বাটন। দ্রুত কমে এল আওয়াজ। তারপর সত্যিই নীরবতা নামল। মিতার সামনে এসে থামল ঈ, চোখে কী যেন খুঁজছে। হিস হিস করে বলল, 'আশা করি তোমার ভাই ভাল সাঁতারু।'

গনগনে রাগে লালচে হয়ে উঠেছে মিতার মুখ, উধাও হয়েছে ভয়। একটা কথাও বলল না। পাশের ছুরিওয়ালা আরও সতর্ক হয়ে উঠল, কণ্ঠনালীর উপর চাপ বাড়ল ছুরির। লোকটা ভিন ভাষায় ঈ-কে বলল, 'শেষ করে দেব?'

একমুহূর্ত ভাবল ঈ। চোখে প্রকাশ পেল তীব্র লালসা। ফর্সা মেয়েটা দেখতে দারুণ। ফিগারটাও চমৎকার। বিছানায় নিলে দারুণ জমবে। 'না,' বলল সে। 'একে সঙ্গে নেব।'

বো-র দড়িগুলো কেটে দিয়েছে দুই কুঠারধারী। এবার

এগিয়ে এল ঈ-র দিকে। বার্জ আটকে রাখবার দড়িগুলো নেই, স্রোত টেনে নিতে চাইছে নৌ-যানকে। ম্যানুয়ালি থ্রাস্টার নিয়ন্ত্রণ শুরু করল ড্রিল জাহাজের হেলম্‌স্‌-ম্যান। পিছিয়ে চলেছে বার্জের সঙ্গে। জাহাজটা এখন আর স্থির নেই, উঠছে-নামছে-দুলছে-সরছে। যে-কোনও সময় বার্জের উপর চড়াও হবে। অতি সাবধানী হেলম্‌স্‌-ম্যান, কিন্তু কয়েকবার ঠোকাঠুকি হলো দুই নৌ-যানে। বিশ্রী ধাতব আওয়াজ হলো।

এক কুঠারধারীকে ধমকে উঠল ঈ, 'অ্যাই, তুমি রাবারের ডিঙি ফুটো করো! ...আর সবাই, যাও জাহাজে গিয়ে ওঠো!'

বার্জের বো-র কাছে বেঁধে রাখা হয়েছে ছোট্ট এক জোডিয়াক। দরকার পড়লে তীরে যাওয়া যেত। ওটার পাশে চলে গেল কুঠারধারী, কয়েক কোপে কেটে দিল দড়ি। কোমরের খাপ থেকে একটানে বের করল ছোরা, কয়েক পোঁচে ফাঁসিয়ে দিল রাবার ডিঙির নরম তলী। হুশ-হুশ আওয়াজে বেরিয়ে গেল বাতাস। চেপ্টে যাওয়া ডিঙির এক মাথা ধরল সে, টেনে নিয়ে রেলিং পার করে ফেলে দিল সাগরে। ঢেউয়ের চূড়ায় তবুও ভাসছে জোডিয়াক। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য। তলিয়ে গেল বড় একটা ঢেউয়ের নীচে।

বার্জের উপর আরও কী ঘটছে দেখবার সুযোগ পেল না মিতা। ছুরিওয়ালা লোকটা ওকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে রেলিঙের দিকে। একই সঙ্গে হাজারো চিন্তা আসছে ওর মনে। লোকটা কণ্ঠনালী কাটতে পারে, তা-ও চেষ্টা করে দেখবে মুক্তি পাওয়ার? রাশেদ আর ফকম্যানকে সাহায্য করবে কী করে? জাহাজে উঠলে কোনও সুবিধা পাবে? সমস্ত চিন্তা শেষে মন বলছে—না, কিছুই করার নেই। মনকে শান্ত করতে চাইল। পরে

সুযোগ আসবে। এই তো একটু পরেই! একবার সাগরে লাফিয়ে পড়লে? ও তো খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। হাত বাঁধা থাকলেও হারাতে পারবে এদের। ইউনিভার্সিটির সাঁতার প্রতিযোগিতায় পরপর তিন বছর মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। ও কি পারবে না? ডুব সাঁতার দেবে, বার্জের তলা দিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে আরেকদিকে। মনে হচ্ছে লোকগুলোর তাড়া আছে। হয়তো খুঁজবেই না! এরা চলে গেলে খুঁজে বের করবে কোনও পথ, আগের জায়গায় নিয়ে যাবে বার্জটা। কিন্তু কী করে? আগে রাশেদ আর ফকম্যানকে বার্জে ওঠাতে হবে, তারপর খুঁজতে হবে প্রতিরোধের পথ।

শরীরে ঢিল দিল মিতা, ঠিক করেছে আর বাধা দেবে না। লোকগুলোর সঙ্গে চলেছে। বার্জের রেলিঙে উঠছে তারা, ওটা টপকে উঠছে জাহাজের রেলিঙে, সেখান থেকে ডেকে। মিতার দু' কাঁধ ধরল ছুরিওয়ালা, ঠেলে উঠিয়ে দিল রেলিঙে। জাহাজ থেকে ঝুঁকল এক লোক, ওকে টেনে তুলে নেবে। নিজেও হাত বাড়িয়ে দিল মিতা, কিন্তু মনে হলো তাল হারিয়ে গিয়ে পড়বে সাগরে। এদিকে ডান গোড়ালি দ্রুত পিছনে ছুঁড়েছে। ছুরিওয়ালা বুঝবার আগেই নাকে লাথি খেল। থ্যাচ্ করে বসে গেল হাড়। নাকের দুই ফুটো দিয়ে ছিটকে বেরুল রক্তের দুটো ধারা। ঘুরেও চাইল না মিতা, মরুক বদমাশ। এক শ' বছরের বুড়িদের মত কুঁজো হয়ে গেল। জাহাজ ও বার্জের সরু ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাগরের পানি। ওখানে ডাইভ দিতে হবে।

যেন পালকের মত হালকা হয়ে গেল ও, আশা করল সাগরে হারিয়ে যাবে এবার। এই তো ঠাণ্ডা পানি ছলাৎ করে লাগবে মুখে। কিন্তু তা হলো না, মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেল মিতা।

একটা হাত ওর শার্ট খামচে ধরেছে! ডান গোড়ালি ধরেছে আরেক হাতে! পানিতে পড়বার বদলে পাখির মত বাতাসে ভাসছে ও! সেটা মুহূর্তের জন্য, তারপর রেলিঙে ধপ্ করে বাড়ি লাগল দেহ। এক সেকেণ্ড পর আছড়ে পড়ল ডেকের উপর। মুক্তি মিলল না, ওই লোকটা যে-ই হোক, খুব শক্তিশালী! দু' কাঁধ ঝাঁকি খেল ওর, শক্ত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে!

হাতদুটো ডক্টর ঈ-র।

'তুমি জাহাজে উঠবে, সোনা!' হিসহিস করে বলল সে।

হঠাৎ বাম পাঁজরে তীব্র ব্যথা পেল মিতা। ঘুসি মেরেছে লোকটা। কখন মারল, বোঝেওনি। উবু হয়ে বসতে চাইল, চোখের সামনে জ্বলছে-নিভছে অজস্র নক্ষত্র। আবছা ভাবে টের পেল, উপরে তুলে ধরা হয়েছে ওকে। কয়েক মুহূর্ত পর ড্রিলিং শিপের ডেক দেখল। টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্রিজের ভিতর। পিছনে ছোট এক স্টোরেজ রুম, ওখানে ঠেসে দেয়া হলো ওকে। ধপ্ করে বন্ধ হলো দরজা।

মোটা দড়ির একটা কয়েলের উপর বসে পড়েছে মিতা। চোখের সামনে বনবন করে ঘুরছে দুনিয়া। কিছুক্ষণ পর একটু দূরে একটা বালতি দেখল। ওটা নিয়ে টলতে টলতে চলে গেল ঘরের পোর্টহোলের সামনে। জ্বলজ্বলে আলো আসছে। বালতি মেঝের উপর উল্টো করে রেখে তার উপর উঠে দাঁড়াল। মুখে বাতাস লাগতে একটু পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। কোভের যেখানে বার্জ ছিল, ঠিক সেইখানে থেমেছে জাহাজ।

ওদের বার্জ কোথায়? পোর্টহোল দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল মিতা, এবার দেখতে পেল—ভেসে চলেছে ধাতব পাটাতন। মাইল দেড়েক দূরে। পিটপিট করে চাহনি পরিষ্কার করতে

চাইল, চেয়ে রইল। বার্জের উপর রাশেদ বা ফকম্যান নেই!

খোলা সাগরে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে খালি পাটাতন!

ষোলো

দু'হাত যেন স্প্যাগেটি, লড়বড় করে খসে পড়বে—হতক্লান্ত হয়ে উঠেছে রাশেদ আহমেদ। চারপাশের পানির বিরুদ্ধে সারাক্ষণ লড়ছে, ধরে রেখেছে এয়ার-লিফ্‌ট। কয়েক দফায় সাহায্য করেছে ফকম্যান, তখন একটু বিশ্রাম নিয়েছে। এক ঘণ্টার বেশি হলো প্রেশারাইযড টিউব নিয়ে কাজ করছে। ভাটা শুরু হওয়ায় গভীর সাগরে ফিরছে সমতলের পানি, স্রোতের গতি দুই নটের বেশি। অবশ্য গভীর পানিতে স্রোতের টান অনেক কম। তার পরও কঠিন হয়ে উঠছে এয়ার-লিফট নিয়ন্ত্রণ করা। যেন একটা পিনের উপর ফুটবল বসিয়ে ভারসাম্য রাখতে চাইছে।

এয়ার-লিফট ধরে রাখবার ফাঁকে ডাইভ-ওয়াচ দেখল রাশেদ। ক্লান্তিকর কাজ শেষ হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট, তারপর ওর শিফট শেষ। যত দ্রুত কাজ করবে ভেবেছে, তার চেয়ে অনেক ধীরে নড়ছে হাত। এখন পর্যন্ত মাত্র ছ' বর্গফুট এলাকা পরিষ্কার করেছে। ক্রাস্ট পড়া কাঠের খণ্ড যথেষ্ট পুরু, চ্যাপ্টা। ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে, আসলেই ওটা জাহাজের রাডারের অংশ। কিন্তু কতটা বড়, এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

ফকম্যান জায়গায় জায়গায় খুঁচিয়ে দেখেছে জিনিসটা দৈর্ঘ্যে বিশ ফুটের কম নয়। ওদের ধারণা, জাহাজটা সত্যিই বিশাল আকারের ছিল।

বুদ্বুদগুলো টলতে টলতে উঠছে। চোখ দিয়ে ওগুলো অনুসরণ করল রাশেদ। বার্জের পাশে থেমেছে একটা কালো জাহাজ। নীচ থেকে মনে হচ্ছে বিশাল। কিছুক্ষণ আগে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে ওরা, এসে ভিড়েছে বার্জে। থ্রাস্টার এনগেজ করেছে। বোকার মত নোঙর ফেলেনি। তখন একটু স্বস্তি পেয়েছে। টাকার কুমির ভিডিও ডকুমেন্টারি গ্রুপ, ভেবেছে রাশেদ। এবার পানিতে নামবে ফোটোগ্রাফাররা। কী মজা তাদের!

কাজে মন দিল রাশেদ, মসৃণ বালির উপর বুলাতে শুরু করল এয়ার-লিফট। ছোট এক ঢিবির বালি সরিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ দেখল, বালি আর উঠছে না। কাঁপছে না এয়ার-লিফট, কমপ্রেসরের শোঁ-শোঁ আওয়াজ থেমে গেছে। মিতা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে ওটা। তার মানে উঠে যেতে বলছে? কারণ কী? বোধহয় কমপ্রেসরের গ্যাস শেষ? এক মুহূর্ত বসে থাকল রাশেদ। ভাবছে, আর দু'এক মিনিট অপেক্ষা করবে। মিতা যদি এর মধ্যে মোটর চালু না করে, তখন উপরে উঠবে।

ফকম্যান খানিক দূরে বালির ভিতর গাঁথছে লোহার দণ্ড। চোখের কোণে দেখল রাশেদ, হঠাৎ মেঝে ছেড়ে ভেসে উঠেছে মানুষটা। কোথায় যেন অস্বাভাবিকতা রয়েছে। প্রোবটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে, দু'হাতে হাতড়ে দেখছে ফেসপ্লেট ও এয়ার-লাইন। ল্যাগব্যাগ করছে পা দুটো। এবার বুঝল রাশেদ, টান দিয়ে ওকে মেঝে থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে—যেন পাপেট

শো'র চরিত্র।

কী করবে ভাবছে রাশেদ, কিন্তু তার আগেই হাত থেকে ছিটকে সরে গেল এয়ার-লিফট। ওটা চলেছে রন ফকম্যানের দিকে। পরমুহূর্তে টের পেল, ওর এয়ার-পাইপ টানটান হয়ে উঠেছে। পর মুহূর্তে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ভেসে উঠল ও মেঝে ছেড়ে।

'কী-ক্বী করছে...' মুখে বলতে চাইল। শ্বাস নিতে গিয়ে চমকে গেল—সামান্য একটু বাতাস পেল, তারপর তা-ও নেই! কমপ্রেসরের বাতাসও থেমে গেছে। ফকম্যানের মতই বাতাসের পাইপ ধরে নিজেকে সোজা রাখতে চাইল রাশেদ, খুলল না ডাইভ হেলমেট। খানিক দূরে পাগল হয়ে উঠেছে এয়ার-লিফট, ক্ষ্যাপা পেণ্ডুলামের মত দুলছে চারদিকে। প্ল্যাস্টিকের মোটা পাইপ তেড়ে এল ওর দিকে। বুঝবার আগেই বাড়ি মারল পায়ে। পর মুহূর্তে ছুটল আরেকদিকে। অক্সিজেন নেই, ন্যাকড়ার পুতুলের মত নড়বড় করছে রাশেদ, মাঝখান থেকে গুঁতো মেরে গেছে ভারী এয়ার-লিফট—এমন অবস্থায় মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠতেই পারে। এর পর বাকি থাকে শুধু ডুবে মারা পড়া।

কিন্তু খুব বেশি ঘাবড়ে গেল না রাশেদ। নুমায় চাকরি নেয়ার পর দু'একবার আণ্ডারওয়াটার টেকনিকাল ফেইলিওর দেখেছে ও। এ প্রতিষ্ঠানে এসব কম হয়, তবে মাঝে মাঝে হয়ও; তাই শিখতে হয়েছে এমন অবস্থায় কী করতে হবে। হয়তো কম পানিতে নেমেছে, হঠাৎ টের পেল খালি হয়ে গেছে ট্যাঙ্ক। তখন বাঁচতে চাইলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, এক এক করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কী করা উচিত। যুক্তি ছাড়া আর কিছুর দাম থাকে না তখন।

এখন প্রথম দরকার বাতাস পাওয়া। মন চাইল পা ছুঁড়ে

ভেসে ওঠে। কিন্তু কোনও প্রয়োজন নেই। যেসব ডুবুরি সারফেস এয়ার নিয়ে পানির নীচে নামে, তাদের কাছে অক্সিজেনের ছোট একটা বোতল থাকেই। দেখতে অনেকটা ফ্লাস্কের মত। ওই বেইল-আউট বটলের নাম দেয়া হয়েছে পোনি ট্যাঙ্ক। তেরো কিউবিক ফুট বাতাস ব্যবহার করে উঠে আসা যায় উপরে। এয়ার লাইন ছেড়ে দিল রাশেদ, বাম হাত চলে গেল বগলের নীচে। ছোট ট্যাঙ্কটা আটকে রাখা হয় ওখানে। একটা দম নিয়েই টের পেল হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

রন ফকম্যানের কথা মনে পড়ল। ওরা দু'জন একইসঙ্গে সারফেস এয়ার পেয়েছে একটু আগেও। তিরিশ ফুট দূরে রনকে দেখল। হেলমেট থেকে উঠছে একগাদা বুদ্বুদ। ইমার্জেন্সি বাতাস ব্যবহার করছে, কোনও বিপদ হয়নি এখনও। বার্জের সঙ্গে বেঁধে রাখা রয়েছে এয়ার-লিফটের হোসের মুখ। বড় হচ্ছে, আবার ছোট হচ্ছে, যেন রাবার ব্যাঙ। পানি ভরা টিউব একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছনে। রাশেদ দেখল নতুন করে পিছিয়ে চলেছে টিউব, এরপর ছিটকে গিয়ে লাগতে পারে ফকম্যানের পিঠে। হাত নেড়ে বন্ধুকে সাবধান করতে চাইল ও। কিন্তু এয়ার-লাইন ধরে সোজা হতে ব্যস্ত রন, অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই। এদিকে পিছিয়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে এয়ার-লিফটের মোটা পাইপ, এবার তীরের মত সামনে ছুটল। সোজা গিয়ে লাগল ফকম্যানের হেলমেট ঠিক নীচে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল রনের মাথা। নতুন করে পিছিয়ে চলেছে এয়ার-লিফট। ওদিকে ধীরে ধীরে মেঝের দিকে নামছে অচেতন ডুবুরির দেহ।

হৃৎপিণ্ডটা নতুন ছন্দে লাফাচ্ছে, টের পেল রাশেদ। খানিক দূরে মেঝে শেষ, তারপরেই বিশাল খাদ। ভাটার স্রোত ওদিকে

টেনে নিতে চাইছে রনকে। দ্বীপ থেকে বইছে হাওয়া, সঙ্গে স্রোতের টান—সরতে শুরু করেছে বার্জ। সঙ্গে নিয়ে চলেছে ওদের। বার্জ সরছে কেন, চমকে গিয়ে ভাবল রাশেদ। মিতা কী করছে উপরে? ফকম্যানের দিকে একবার চাইল। ও নিজে পানি ছেড়ে উঠে গেলে হবে না, আগে রনকে উদ্ধার করতে হবে। দেখতে হবে, ঠিক ভাবে ও পাচ্ছে কি না বাতাস।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল রাশেদের। এয়ার-লাইন ধরে খানিক ভেসে উঠল, এগোতে চাইল রনের দিকে। ব্যথায় টনটন করছে দু'হাত। কোমরে বাঁধা রয়েছে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের বেল্ট, এগোনো কঠিন। বেল্ট যে খুলবে, তা-ও চলবে না। রনকে উদ্ধার করতে চাইলে থাকতে হবে এই গভীরতায়।

রাশেদ যেন আণ্ডারওয়াটার মাউন্টেনিয়ার, তবে পর্বতে উঠতে চাইছে পানি থাবা দিয়ে। কিছুক্ষণ পর রনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। ঠিক তখনই হাজির হলো পুরানো শত্রু। ওর দিকে ধেয়ে এল এয়ার-লিফট! এক ফুট দূর দিয়ে চলে গেল। মোটা টিউব মোড় নিয়ে আবার ছুটল রনের দিকে। সেটা মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণে ফিরতি পথ ধরল। এবার সতর্ক রাশেদ, কনুই ভাঁজ করে ধরে ফেলল পানি-ভরা ভারী পাইপ। ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইল টিউব, ধাক্কা দিয়ে ফিরতি পথ ধরতে চাইছে। দু' পা দিয়ে পাইপ জড়িয়ে ধরল রাশেদ, যেন পানির ভিতর চেপেছে পাগলা ঘোড়ায়! টিউব বেয়ে দ্রুত এগোতে লাগল, পৌঁছতে চাইছে শেষ মাথায়। ওখানে গিয়ে খানিক উপরে পুরু রাবারের হোস পাওয়া গেল। টিউবটা এক হাতে ধরে রইল, ডান পা'র স্ট্র্যাপে ছোট ছুরি, ওটা বের করে কাটতে শুরু করল হোস। ওর দেহ নিয়ে ছিটকে সরছে টিউব।

কয়েকবার পোঁচ দেয়ায় খানিকটা ছিঁড়ল হোস। তারপর আর ধরে রাখতে পারল না টিউবের ভারী ওজন, ছিটকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত নীচের দিকে রওনা হলো টিউব। ওটা থেকে সরে গেল রাশেদ, লাথি দিতেই নীচে নামবার গতি আরও বাড়ল টিউবের।

প্ল্যাস্টিকের মৃত্যু-ডাণ্ডা আর নেই, এবার রন ফকম্যানের দিকে মনোযোগ দিল রাশেদ। এয়ার-লিফটের দিকে এতক্ষণ মনোযোগ থাকায় টের পায়নি, আবারও সরে গেছে রনের কাছ থেকে। মানুষটার কাছে যেতে হলে নতুন করে তিরিশ ফুট পেরুতে হবে। রন ফকম্যান যেন ভেজা ন্যাকড়া, ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত লাইন টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। এয়ার লাইন ধরে স্থির হলো রাশেদ, তারপর এক পা এক পা করে এগোল আবার। নিজ এয়ার-লাইন বো-লাইনের প্যাঁচে আটকে নিয়েছে কোমরে। ওর মনে হলো এক ঘণ্টা পর পৌঁছুল রনের পাশে। বেচারার বিসি চেপে ধরল, সোজা হয়ে চোখ রাখল ফেস মাস্কের ভিতর।

রন ফকম্যান অচেতন, চোখ দুটো বন্ধ। হালকা ভাবে শ্বাস চলছে। একটু পর পর রেগুলেটর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অজস্র ছোট ছোট বুদ্বুদ। রনকে ঝুঁকে এক হাতে ধরল রাশেদ, আরেক হাতে খুলল নিজ ওয়েট বেল্ট। হাত চলে গেল বয়্যান্সি কমপেনসেটারের উপর। ইনফ্লেশন হোসের বাটন টিপতেই ইমার্জেন্সি পোনি বটলের অবশিষ্ট বাতাস বেরিয়ে গেল, ঢুকল ওর ভেস্টের ভিতর। ট্যাঙ্কে সামান্য বাতাস ছিল, পুরো ফুলল না ভেস্ট। তবে ওটুকু বাতাস ওদের ঠেলে ভাসিয়ে তুলতে যথেষ্ট। দ্রুত পা চালিয়ে উর্ধ্বগতি আরও বাড়াল রাশেদ।

কয়েক সেকেণ্ড পর সাগর-সমতলে ভেসে উঠল ওরা। সেটা

মুহূর্তের জন্য, সামনে থেকে এল হ্যাঁচকা টান। আবারও ডুবে গেল ওরা। যেন পানিতে পড়ে যাওয়া ওয়াটার স্কিয়ার, তবে দড়ি ছাড়তে ভুলে গেছে। দু' সেকেণ্ড পর আবারও ভেসে উঠল, পর মুহূর্তে ডুবতে হলো নতুন করে। ডুবছে আর ভেসে উঠছে, তারই ফাঁকে রনের ওয়েট বেল্ট খুলে ফেলল রাশেদ, পরের সুযোগে নিজের হেলমেট খুলল। প্রথমবার ভেসে উঠেই বড় করে শ্বাস নিয়েছে, আঁকড়ে ধরেছে রনের বিসির ম্যানুয়াল ইনফ্লেশন টিউব। প্রতিবার ডুবে গেলে থাম্ব ভালভ খুলে শ্বাস ফেলছে। এভাবে কয়েকবার করবার পর পুরোপুরি ফুলে উঠল রনের ভেস্ট। এরপর কমে এল ডুবে যাওয়া।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে রাশেদ, এয়ার-লাইনের হ্যাঁচকা টানে মাথা বা ঘাড়ে চোট লেগেছে রনের? লাইনের উপর অংশ দিয়ে তৈরি করল একটা লুপ, রনের বিসির ডি রিঙে পরিয়ে শক্ত করে গিঁঠ মেরে দিল। লাইন যদি ছিঁড়ে না যায়, ওই ভেস্ট ওকে টেনে রাখবে। বুকের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত ভাসছে ওর। আপাতত বিপদ নেই। এবার নিজের এয়ার-লাইন নিয়ে পড়ল রাশেদ। ভেসে চলেছে বার্জ, ওটার উপর উঠতে হবে। দু' হাতের টানে লাইন ধরে ওদিকে চলল ও। সামনে চল্লিশ ফুট লাইন, তারপর বার্জ। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ, মনে হলো বার্জে পৌঁছুনো চাঁদে পৌঁছুনোর মত কঠিন। লাইন ধরে এগুনোর গতি কমে গেল। প্রতিবারে দু'তিন ইঞ্চির বেশি এগুতে পারছে না। কাঁধ ও পিঠের ব্যথায় মন বলছে, ছিঁড়েই যাবে মাংসপেশি। বার বার ভাবছে, দিই না হাত ছেড়ে! যা হয় হোক, মরলেই তো মুক্তি। চিন্তাটা প্রতিবার মন থেকে দূর করছে রাশেদ, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে। বারবার নিজেকে বলেছে, খবরদার! থামবি না!

প্রথমবারের মত আশা নিয়ে বার্জের দিকে চাইল রাশেদ। না, কই, রেলিঙের পাশে মিতা নেই! কোথায় ওর বোন? খোলা ডেক খাঁ-খাঁ করছে! মিতা নিজ ইচ্ছায় চলে যায়নি। ওই কালো জাহাজ আসবার পর খারাপ কিছু ঘটেছে। ও বেশ বুঝছে, দ্রুত গিয়ে বার্জে উঠতে হবে। মিতার কী হলো জানতে হবে। রেগে উঠছে। নিজের উপর, যারা ওর বোনকে নিয়ে গেছে, তাদের উপর। ওই রাগই চালিয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। আর বেশি দূরে নেই বার্জ। কিছুক্ষণ পর ধাতব পাটাতনের দু' ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত লড়াই করল। রেলিং নাগালে পেয়েই বেয়ে উঠল ওটা, টপকে শুয়ে পড়ল ডেকে। পুরো আধ মিনিটও বিশ্রাম নিল না, উঠে খুলতে শুরু করল ডাইভ গিয়ার। দুই চোখ খুঁজছে বোনকে। কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। কোনও জবাব এল না। এবার ফকম্যানের এয়ার-লাইন ধরে টানতে শুরু করল। টুপ করে ডুবে গেল ওর বন্ধু, কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল আবারও। বড় একটা ঢেউ উল্টে দিল তাকে। জ্ঞান ফিরেছে, সামান্য হাত-পা নাড়ছে। বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইছে।

ব্যথায় পাগল করে দিচ্ছে হাত দুটো, লাইন টেনে চলেছে রাশেদ যন্ত্রের মত। নৌকার গুণ টানছে যেন! শেষ কয়েক টান দিয়ে নিয়ে এল রনকে বার্জের পাশে, রেলিঙের সঙ্গে বেঁধে ফেলল লাইন। ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ধরল বন্ধুর কলার, টেনে তুলে নিল ডেকে।

এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো রন, ধড়মড় করে উঠে বসল। ধীর হাতে খুলছে হেলমেট, ঝাপসা চোখে রাশেদের দিকে চাইল। একহাতে ঘাড় টিপতে গিয়ে কুঁচকে ফেলল মুখ। আঙুল

লেগেছে ফোলা অংশে, জায়গাটা ক্রিকেট বল হয়ে উঠেছে।

'পানির নীচে কী ঘটল?' আড়ষ্ট স্বরে জানতে চাইল।

'আগের কথা, নাকি যখন ক্রিকেট ব্যাটের মত এয়ার-লিফট ঘাড়ে লাগল তার পরের কথা?' পাল্টা জানতে চাইল রাশেদ।

'ও। তা হলে ওটাই ছিল কালপ্রিট! হঠাৎ টের পেলাম আমাকে টান দিয়ে তুলছে। এর পরপরই বন্ধ হয়ে গেল বাতাস। পোনি ট্যাঙ্ক চালু করলাম, ভাবলাম এবার উপরে উঠব—আর তখনই সব আঁধার হয়ে গেল।'

'কপাল ভাল যে ইমার্জেন্সি এয়ার চালু ছিল। এয়ার-লিফট সরাতে সময় লেগেছে আমার। তোমাকে তুলে আনতেও সময় লেগেছে মেলা।'

'ধন্যবাদ, ফেলে যে আসোনি,' হাসল ফকম্যান। ধীরে ধীরে হুঁশ ফিরছে তার। 'মিতা কোথায়? আমরা তীর থেকে এত দূরে কেন?' উপকূলের দিকে চেয়ে রইল। আবছা হয়ে আসছে তীর।

'মিতা কোথায়, আমরাই বা এখানে কেন, আমি জানি না,' শান্ত স্বরে বলল রাশেদ।

বসে রয়েছে রন ফকম্যান, কুঁড়ে-ঘরের দিকে চলে গেল রাশেদ। ভিতরে কেউ নেই। বার্জে কারও চিহ্ন নেই। অদৃশ্য হয়েছে মিতা। পাঁচ মিনিট পর রনের পাশে এসে থামল ও। গম্ভীর চেহারা বলছে, খবর ভাল না।

'রেডিও উধাও। জোডিয়াক নেই। জেনারেটরও। বার্জের সমস্ত দড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে।'

'আর আমরা চলেছি চিন দেশে?' মাথা নাড়ল রন। 'হাওয়াই দ্বীপে জলদস্যু?'

'ট্রেজার হান্টার, ভেবেছে সোনা ভরা জাহাজ পেয়েছি

আমরা,' দ্বীপের দিকে চাইল রাশেদ। কোভ আর দেখা গেল না। কিন্তু ওর মন বলছে, ওখানেই থাকবে সেই কালো জাহাজ।

'যে জাহাজের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছিলাম?' বহু দূরের উপকূলের দিকে চেয়ে রয়েছে রন ফকম্যান, কিন্তু প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

'হ্যাঁ, ওটাই।'

'তা হলে ওখানে তুলেছে মিতাকে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রাশেদ। ওর বোন যদি ওই জাহাজে থাকে, বোধহয় ভালই আছে। হয়তো কোনও বুদ্ধি খাটিয়ে নেমে পড়বে। কিন্তু ওকে উদ্ধার করতে পারবে না ওরা। তীর থেকে আরও দূরে চলেছে বার্জ। তীরে না ফিরলে কীভাবে উদ্ধার করবে মিতাকে? প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে চলেছে এই ইঞ্জিনবিহীন বার্জ। হয়তো কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে যাবে, তার আগে কোনও জাহাজের দেখাই মিলবে না। আশা মিলিয়ে যাচ্ছে ওই দূরের দ্বীপের মত। বাঁচতে চাইলে, বাঁচাতে চাইলে আগে তীরে ফিরতে হবে!

সতেরো

কাঁচা পথ ধরে ছুটে চলেছে রাশান ট্রাক। বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার দাঁত খিঁচিয়ে ভাবছে, আর কখনও এ দেশে

আসছি না, বাবা! পিঠ, নিতম্ব ও পাদুটো টনটন করছে ব্যথায়। একের পর এক ঝাঁকি, তা-ও সমান ঝাঁকি নয়, গর্তগুলো ছোটবড়, পরস্পর খটা-খট লাগছে দাঁতগুলো। মনে হচ্ছে, দু'চারটে খসেও পড়তে পারে। ভীষণ তিক্ত মন বলছে, এ ট্রাকের নির্মাণকারীরা জানেই না দুনিয়ায় শক অ্যাবজর্ভার ও স্প্রিং বলে কিছু আছে।

'জ্যাক দ্য রিপার বোধহয় মানুষ খুন করা ছেড়ে দিয়ে এটার সাসপেনশন তৈরি করেছে?' সামনের ঢালে চোখ রেখেছে সোহেল। মন চাইছে পাখি হয়ে উড়াল দেয়।

'আরাম করে বসুন,' হুইলের পিছনে নড়েচড়ে বসল ববি, ঠোঁটে বিস্তৃত হাসি। এবার বোমা ফাটাল, 'হাইওয়ের এ অংশটাই সেরা। এরপর একটু খারাপ রাস্তা পড়বে।'

ভ্রূ কুঁচকে বাইরে চেয়ে রইল সোহেল। ঘাসে ছাওয়া একের পর এক ঢিবি চলে গেছে বহু দূরে, তার মাঝে হাইওয়ে মানে চাকার দুটো গভীর দাগ। দুপুরে রওনা হয়েছে ওরা। উলানবাটোর পেরিয়ে চারদিকে খোলা জমি পড়েছে। কোনও গাছ নেই বললেই চলে। জালাইর তেমুজিনের এলাকা এখনও অনেক দূর। আন্দাজে ভর করে চলেছে রানা ও ববি। বার কয়েক থেমেছে। নতুন করে পথ খুঁজে এগিয়েছে আবার। পরে ল্যাণ্ডমার্ক দেখে বোঝা গেছে, ভুল করেনি দিক। দক্ষিণ-পুবে পড়বে ছোট একটা পাহাড়ি এলাকা। ওটাই জালাইর তেমুজিনের রাজ্য।

'আর বড়জোর দু'চার ঘণ্টা,' সান্ত্বনা দিল ববি। উইণ্ডশিল্ডে চোখ রেখেছে। 'তারপর সব ঝামেলা শেষ।'

'ততক্ষণ বাঁচলে তবে না,' বলল সোহেল। ওর মন বলছে,

ভুল বলেছে ববি, ওদের ঝামেলা মাত্র শুরু। রওনা হওয়ার আগে আবার ফোন দিয়েছিল ল্যারি কিং। কণ্ঠে ছিল তাগাদা। প্রতিটি কথা একের পর এক মনে পড়ছে সোহেলের।

'তোমরা মাত্র মাটি খুঁড়ছ,' বলেছে ক্লান্ত কিং। 'আমাদের ধারণা, কেঁচোর বদলে বিরাট সাপ বেরুবে। মঙ্গোলিয়ার উত্তর-মধ্য অঞ্চলে সম্প্রতি একের পর এক ভূমিকম্প ঘটে চলেছে। কিছু আছে চিন সীমান্তে। ওগুলো মোটেই স্বাভাবিক কিছু নয়। এপিসেন্টার ছিল মাটির সামান্য নীচে। বড় ধরনের ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলের সাত মাত্রার বেশি। এ কারণে ভয়ানক সারফেস ওয়েভ তৈরি হয়। ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয় এলাকাগুলো। ডক্টর জেরেমি হাইন্স ও ভিনাস খেয়াল করেছে, এসব ভূমিকম্পে প্রচণ্ড কোয়েক হয়, যেটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলা যায় না।'

'তোমরা ভাবছ এগুলো মানুষের তৈরি?' জানতে চাইল রানা।

'শুনলে মনে হয়, এ হতেই পারে না,' জবাব দিল ল্যারি, 'কিন্তু সাইসমিক রেকর্ড বিশ্লেষণ করলে ঠিক এটাই মনে হয়।'

'আমি শুনেছি তেলের জন্য ড্রিল করলে আর্থকোয়েক হতে পারে,' বলল রানা। 'যেমন হয় নিউক্লিয়ার বোমা মাটির নীচে ফাটালে। খবর নিয়েছ, মঙ্গোলিয়ার এই এলাকায় ড্রিলিং চলছে কি না? কে জানে, চিন হয়তো নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষা করছে।'

'উত্তর মঙ্গোলিয়ায় উলানবাটোর ছেড়ে পুব দিকের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্পগুলো ঘটেছে। ওটা মনুষ্যবিবর্জিত বিরান এলাকা। ওখানে ড্রিল করলে এমন হতে পারে। কিন্তু ভিনাস বলছে, এসব ভূমিকম্প হওয়ার আগে প্রি-শক তৈরি হয়। কিন্তু

ড্রিল করলে এমন হতো না। আর খোঁজ নিয়ে শিওর হওয়া গেছে, দক্ষিণ এলাকায় নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষা করেনি চিন।'

'তা হলে আগের কথায় ফিরছ, ভূমিকম্প হয়েছে ডক্টর ফ্রেডারিখ ফন বোমারের যন্ত্রের সাহায্যে?'

'তা-ই তো মনে হয়, রানা,' বলল কিং। 'ভিনাস যখন আমাদের জানাল, উলানবাটোর থেকে পুবে খেনটি মাউন্টেনে ভূমিধসে মারা গেছেন ডক্টর বোমার, চোখের সামনে উজ্জ্বল আলো দেখলাম। একের পর এক কাকতালীয় ঘটনা ঘটে কী করে! আন্দাজ করলাম, ওঁর অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে, বা ওটার মত কিছুই ওই মারাত্মক ভূমিকম্প তৈরি করছে।'

'কাজটা সম্ভব, যদি ভয়ঙ্কর শক ওয়েভ পাঠানো যায়,' তা-ই না, ল্যারি?' ওদের কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল ববি।

'মনে হয় তা-ই করছে,' বলল কিং। 'ডক্টর হাইন্স ও অন্যান্য সাইসমোলজিস্টরা একটা থিয়োরি দাঁড় করিয়েছেন। ওঁরা ফন বোমারের এক কলিগের সঙ্গে আলাপও করেছেন। ভদ্রলোক জানান, রিফ্লেকশন ইমেজারির যন্ত্রটা সফল ভাবে পরীক্ষা করেন ডক্টর বোমার। তাঁর ঘন অ্যাকুস্টিক ওয়েভ সহজেই মাটি-পাথর ভেদ করতে পারে। সাধারণ সাউণ্ড ওয়েভ অনেকটা নুড়ি-পাথর পানিতে পড়লে যেমন চারপাশে ঢেউ তৈরি করে, তেমনি। কিন্তু ফন বোমার কীভাবে যেন ওয়েভকে ঘন করে পাঠিয়ে দেন মাটির ভিতর। ফলাফল হয় ভয়ঙ্কর। ঢেউগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে শুরু করে। ফলে বহু দূরের ইমেজ পরিষ্কার দেখা যায়। তাঁর কলিগ অন্তত তা-ই বলেন।'

'বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের সাইসমিক ইমেজ কীভাবে পান?' আবারও জানতে চাইল ববি।

'দুই ভাবে সম্ভব। প্রথম, ডক্টর বোমারের সিস্টেমে পরিষ্কার ইমেজ পাওয়া যায়, দেখা যায় মাটির নীচে ঠিক কী ঘটছে। বর্তমান টেকনোলজিতে অবশ্য এমনিতেই বোঝা যায় মাটির নীচে কী ধরনের ফল্ট রয়েছে।'

'আচ্ছা। তা হলে ডক্টর বোমারের সাইসমিক অ্যারে মাটির নীচে নিখুঁত ভাবে যে-কোনও ফল্ট নির্দেশ করবে,' বলল রানা। 'কিন্তু তার পরেও তো এমন কিছু করতে হবে প্রেশার পয়েন্টগুলোতে, যাতে ফেটে যায়। ওখানে ড্রিল করা হতে পারে, বা বিস্ফোরক দিয়ে পাথর ফাটিয়ে দেয়া যায়। এ-ই তো?'

'ঠিক। দ্বিতীয় একটা বিষয় রইল। ফল্ট লাইনকে ফাটিয়ে দিতে হলে প্রচণ্ড শক্তি দরকার। কাজটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বুঝতে হবে সাইসমিক ওয়েভ মানে সাইসমিক ওয়েভই! ফল্ট তো জানে না ওই সাইসমিক ওয়েভ দূর থেকে আসছে, না বিস্ফোরকের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিস্ফোরণ। কাজেই...'

'কাজেই অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট যথেষ্ট কাজ করবে,' কিঙের কথা কেড়ে নিল রানা।

'তা-ই করেছে জালাইর তেমুজিন!' ববির মন্তব্য, 'ধরে নিলাম দশ ফুটি ট্রাইপড আসলে ট্র্যান্সডিউসার অ্যারে সিস্টেম। ওটাই তৈরি করে অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট। ওটা যদি হয় ট্র্যান্সডিউসার, আমার ধারণা ওটা সনিক বুম তৈরি করবে।'

'কোনও ফল্ট লাইনে যদি অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট প্রয়োগ করা যায়, তৈরি হবে ভয়ানক ভাইব্রেশন। সেটা হবে সাইসমিক ওয়েভের মতই। ফলে মুহূর্তে ফেটে যাবে ফল্টের জোড়া। অবশ্য এই সবই থিয়োরি মাত্র। ডক্টর হাইন্স আর ভিনাস আন্দাজ করছে, এভাবে ভূমিকম্প সৃষ্টি করা সম্ভব। হতে পারে ডক্টর

বোমার যে ইমেজিং টেকনোলজি আবিষ্কার করেন, তার খারাপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈরি হয় ভূমিকম্প।'

'আর সেটা ব্যবহার করছে এখন জালাইর তেমুজিন,' তিক্ত চেহারা হলো ববির। 'ওই টেকনোলজি দিয়ে যা খুশি করবে সে। কোনও দেশ এ ক্ষমতা পেলে যুদ্ধ ছাড়াই যে-কোনও দেশ দখল করবে, যা খুশি করবে।'

'তোমাদের আমেরিকাকে নিয়ে সেটাই তো ভয়,' মনে মনে বলল সোহেল। 'আমেরিকান সরকার দু'বার আণবিক বোমা ফেলেছে অন্য দেশে, অন্য জাতির উপর। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রি করেছে। যেকোনও ছুতো-নাতায় আরেক দেশ আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষ খুন করেছে। আজ যার বন্ধু, কাল তারই পিঠে ছুরি মারতে দ্বিধা করেনি। আধিপত্য বজায় রাখতে ওরা পারে না এমন কাজ নেই। সেই আমেরিকা ভূমিকম্প তৈরির ক্ষমতা হাতে পেলে? তাকে ঠেকাবার আর উপায় থাকবে? কেউ হয়তো জানতেই পারবে না, কখন, কীভাবে সর্বনাশটা ঘটে গেল! কষ্ট করে যুদ্ধ করতে হবে না আর আমেরিকার!'

'অমন ভূমিকম্প একেবারে কাছ থেকে দেখেছ তোমরা, রানা,' বলল কিং। 'বৈকাল হ্রদের তাণ্ডবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই ভূমিকম্পের গতিপ্রকৃতি। হয়তো ইচ্ছে করেই পানির নীচে ভূমি-ধস ঘটিয়ে ওরা তৈরি করে ভয়ঙ্কর বান, মরতে বসো তোমরা। আমরা আন্দাজ করছি আসলে ওই ভূমিকম্প দিয়ে একটা তেলের পাইপ-লাইনকে ধ্বংস করা হয়েছে। ওটা হ্রদ থেকে উত্তর দিকে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় ওই পাইপ-লাইন।'

'এবার পরিষ্কার বোঝা গেল কেন ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল

ওরা দানিয়াকে,' বলল ববি। 'নষ্ট করতে চেয়েছে আসলে ওটার কম্পিউটারগুলো। আমরা সাইসমিক স্টাডির কথা বলি জালাইর তেমুজিনের বোন বলোর্মাকে। সে বুঝে ফেলে আমাদের আধুনিক ইকুইপমেন্টগুলো ওদের ওই সিগন্যালগুলো ঠিকই ধরে ফেলবে। পরিষ্কার বেরিয়ে আসবে কী কারণে হয়েছে ভূমিকম্প।'

হ্রদে আরেক জাহাজে খোঁজ করতে গিয়েছিলি তোরা,' মনে পড়ল সোহেলের। 'জোসেফ কার্ক জানিয়েছে।'

'এরা টেকনোলজিটা ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যবহার করছে,' বলে চলল কিং। 'আমরা এখনও নিশ্চিত নই মঙ্গোলিয়া বা চিনে ভূমিকম্প কেন। তবে ওসব কম্পনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে পার্শিয়ান গালফের দুটো ভূমিকম্প। ওই দুই ফ্যাসিলিটি থেকে অয়েল এক্সপোর্ট পুরোপুরি বন্ধ এখন।'

এরপর নীরবতা নেমে এল হোটেল কক্ষে। ভূমিকম্প তৈরির টেকনোলজি থাকতে পারে, সেটা বিস্ময়কর। তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে গোটা দুনিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে! আর এসব কিছুর পিছনে রয়েছে এক ক্ষমতালোভী পিশাচ। চিনের তেল তাদেরই কাছে বিক্রি করতে চায় সে। যদি পারে, সে হবে এশিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোক। এরপর রাজনৈতিক ক্ষমতা চাইবে। থামবে না কোনও কিছুতে। আরেক চেঙ্গিস খান সৃষ্টি হবে মঙ্গোলিয়ায়।

'কিং, আমাদেরকে যা বললে সেটা জানেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন?' জানতে চেয়েছে রানা।

'জানিয়েছি। তোমার বসও জানেন। তিনি তোমার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন—যে করে হোক অর্থনীতি ধ্বংস করবার ওই

পরিকল্পনা থামাতে হবে, লোকটার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন বাস্তবায়িত না হয়! এদিকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটিঙে রয়েছেন অ্যাডমিরাল। বোধহয় এরইমধ্যে জানিয়েছেন তোমরা কী করছ। মিটিঙে যাওয়ার আগে বলেন, ভূমিকম্প সত্যিই সৃষ্টি হয় কি না, সেটা নিশ্চিত হোক রানা-ববি। ওরা যদি বলে এ সম্ভব, মিটিঙে বসবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল। প্রয়োজনে মঙ্গোলিয়ায় পাঠানো হবে আমেরিকান সেনাবাহিনী।'

'সানা-দুর ল্যাবোরেটরিতে মিলবে সাইসমিক অ্যারে,' মনে হলো রানার। তবে মুখে কিছু বলল না।

'জালাইর তেমুজিনের বিরুদ্ধে প্রমাণ খুঁজব আমরা,' ল্যারিকে বলল ববি। 'হয়তো একই অ্যারে বারবার ব্যবহার করছে।'

'মনে হয় না,' মনে মনে মাথা নাড়ল রানা। 'বৈকাল হ্রদ থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসবে, এত সহজ নয়।'

'ডিভাইসটা বোধহয় জাহাজ থেকে ব্যবহার করেছে?' জানতে চাইল কিং। 'গালফ্ আর বৈকালের ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল পানির নীচে।'

'বৈকাল হ্রদে তাতিস্কা জাহাজে মুন পুল আর ডেরিক ছিল,' জানাল ববি। 'ওগুলো ব্যবহার করেছে। যদি পার্শিয়ান গালফে এদের জাহাজ থাকে, কাজটা সহজ হয়েছে। নৌ-বাহিনীকে সতর্ক করা উচিত।'

'ভাবতে গেলে ভয় লেগে ওঠে, এক লোক দুনিয়াময় যেখানে খুশি তৈরি করছে ভূমিকম্প!' বলল ল্যারি। 'সাবধানে থেকো তোমরা। যার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও, সে স্বাভাবিক মানুষ নয়, ভয়ঙ্কর এক বদ্ধ উন্মাদ!'

'তোমরা তেমুজিনের জাহাজ খুঁজে বের করো, এদিকে

আমরা ওকে থামানোর চেষ্টা করি,' বলল ববি।

'ভাল থেকো,' ফোন রেখে দিল ল্যারি কিং।

রানা ও সোহেল পরস্পরের দিকে চাইল। দুজনেই ভাবছে একই কথা। সত্যিই যদি আমেরিকান নৌ-বাহিনী জালাইর তেমুজিনের জাহাজ দখল করতে পারে, তা হলে আমেরিকার হাতেই পড়বে সাইসমিক অ্যারে।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কখন মিটিং থেকে ফিরবেন, সেজন্য অপেক্ষা করেনি রানা, সোহেল ও ববি। হোটেলের রেস্টুরেন্ট থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে একবার বিসিআই হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করেছে রানা। ইলোরা দেরি না করে সংযোগ করিয়ে দিয়েছে মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খানের সঙ্গে। উনি সাত মিনিট কথা বলেছেন। খানিকটা খুশি, আবার কণ্ঠে রাগও ছিল খানিকটা। তাঁর কথা শেষে 'জী, স্যর' বলে রেখে দিয়েছে রানা। চিফের কাছে শুনেছে মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে ইদানীং সম্পর্ক উন্নয়ন করছে আমেরিকা। তবে এত খাতির হয়নি যে, পাকিস্তানের মত যা খুশি তা-ই করতে পারবে। কিছু করতে চাইলে সপ্তাহ খানেক লাগবে তাদের। কাজেই যা করবার সোহেল ও ববিকে নিয়ে ওর নিজের করতে হবে, এবং তা যত দ্রুত সম্ভব। জালাইর তেমুজিন আরও কিছু করবার আগেই ওর সমস্ত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থামিয়ে দিতে হবে।

বস নির্দেশ দেয়ায় খুশি রানা। ওদের যেতেই হতো গ্রেসি ও উইলসনকে উদ্ধার করতে। ববি নিজ ঘর থেকে ঘুরে আসার পর রানার ঘরে বসে পরিকল্পনা তৈরি করেছে ওরা। এটা নিশ্চিত যে জালাইর তেমুজিন এ মুহূর্তে দর্শনার্থী আশা করছে না। সুযোগটা নেবে ওরা। গোপনে আবারও ঢুকে পড়বে তার ডেরায়। গ্রেসি ও

উইলসনকে নিয়ে ওই কম্পাউণ্ড থেকে বেরুতে হবে, হাতেও আসতে হবে তেমুজিনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ।

ধুলো ভরা এক ছোট টিলার উপর উঠে এল রাশান ট্রাক। ব্রেক কষে গতি কমাল ববি। সামনে সাইড রোড শুরু হয়েছে। এ পথ প্রায় মসৃণ। মুখের কাছেই লোহার ফটক। পুরোপুরি খোলা। সামনে পড়বে জালাইর তেমুজিনের এস্টেট।

'এটাই সানাডুর পথ,' জানাল ববি।

'ওদিক থেকে কেউ এলে গোলাগুলি হবে,' বলল সোহেল।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখান থেকে উলানবাটোর যেতে চার ঘণ্টার বেশি লাগে। মনে হয় না এখন এস্টেট থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে খোলা প্রান্তরে। তবে ঝুঁকি রয়েই যায়, ঘোড়সওয়ারীরা টহল দিতে আসতেই পারে।

সাইড রোড ধরে রওনা হলো ববি। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া চারদিক নিঝুম। পথ চলে গেছে পাহাড়ি অঞ্চলে। একটা উৎরাই পেরিয়ে গতি কমাল সে। এক পাশে হাজির হয়েছে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। উজানে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় খলবল শব্দে ছুটছে। গত ক'দিন প্রচুর ধুলো দেখেছে ববি, একটু বিস্মিত হলো উত্তাল নদী দেখে। পথও কাদা ভরা। 'গতবার ভুল দেখে না থাকলে, এখান থেকে ঠিক দুই মাইল দূরে ওই কম্পাউণ্ড।'

'ধীরে এগোও, কম্পাউণ্ডে ঢুকবার খাপ খুঁজতে হবে,' বলল রানা।

মন্থর গতিতে চলেছে ট্রাক। সবার চোখ সামনের পথে। প্রহরী থাকতে পারে। নয় মিনিট পর বিশাল আকৃতির এক পাইপ চোখে পড়ল। নদী থেকে পানি নিয়ে ঢালছে সরু খালে।

এটাই শেষ ল্যাণ্ডমার্ক, আধ মাইল দূরে ওই কম্পাউণ্ড।

খানিকদূর যাওয়ার পর একটু ফাঁকা জায়গা পড়ল। পাইন গাছের সারি ওখানে পিছিয়ে গেছে। পথ থেকে সরে এল ববি, ট্রাক নিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। ইঞ্জিন থেমে যেতে রইল শুধু ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ। পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে ধুলো-কাদা ভরা ট্রাক। রাস্তা থেকে চোখেও পড়বে না কারও।

একবার ঘড়ি দেখল সোহেল। স্থানীয় সময় সন্ধে আটটা। রানার দিকে চাইল। 'কীরে, আরেকটু অপেক্ষা করি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

ববির হাতে চলে এলো থার্মোস, দুই বন্ধুকে কাপ ভরে দিল কড়া কালো কফি।

এক চুমুক দিয়ে বলল রানা, 'অন্ধকার আরেকটু হোক।'

কফি শেষ করে সিটের উপর শুয়ে পড়তে চাইল ববি। বিরাট এক শ্বাস ফেলে বলল, 'এবার খানিক বিশ্রাম।' কিন্তু পরক্ষণে পিঠে স্প্রিঙের খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠে বসতে হলো তাকে।

আন্তরিক হাসি ফুটে উঠল সোহেলের মুখে।

আঠারো

না শীত, না গরম। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। যেদিকে চোখ যায় দেখা যায় না উপকূল। ওরা যেন বিশাল এক নীল চাদরে আটকা

পড়েছে। ওয়েট সুট খুলে ফেলেছে ফকম্যান ও রাশেদ, ভাবছে কী করে তীরে ফিরবে।

'বার্জ নিয়ে ফেরা অসম্ভব,' বলল ফকম্যান। 'মাস্তুল আর পাল থাকলেও পারতাম না।'

'তা-ই আসলে,' সায় দিল রাশেদ। 'আমাদের প্রথম কাজ এখন ভেসে যাওয়া ঠেকানো।'

'সি অ্যাঙ্কর?'

'হ্যাঁ।' হাঁটতে শুরু করেছে রাশেদ, গিয়ে থামল একটা কমপ্রেসরের পাশে।

'অনেক দামি নোঙর হয়ে যায়,' বলল ফকম্যান। ঝুঁকে তুলে নিল মুরিং লাইনগুলো।

তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের একটা লাইন তৈরি করল ওরা, এক মাথা কমপ্রেসরের সঙ্গে বেঁধে অন্য প্রান্ত বাঁধল স্টার্ন বোলার্ডে। ধরাধরি করে তুলে নিল কমপ্রেসর, রেলিঙের পাশে গিয়ে ফেলে দিল সাগরে। ভারী জিনিসটা ঢেউয়ের নীচে সি অ্যাঙ্কর হিসাবে কাজ করবে। খানিকটা হলেও থামিয়ে দেবে নিরুদ্দেশ ভেসে যাওয়া।

'ওই সুন্দরীর গায়ে কামড় দিক না হাঙর, আর কখনও ধারেকাছে ভিড়বে না,' হাসল ফকম্যান।

'কিন্তু বিপদ কাটছে না আমাদের,' বলল রাশেদ। দিগন্তে চেয়ে রইল। যদি কোনও জাহাজ চোখে পড়ে! নেই। বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মিলিয়ে গেছে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। নীচে সাগর, মাথার উপর আকাশ। যেদিকে চোখ যায়, শুধু নীল আর নীল।

'কিছু করতেই হবে,' বলল রাশেদ।

বার্জের ইকুইপমেন্টগুলোর দিকে চোখ গেল ওদের। জোডিয়াকটা নেই। বার্জ নিয়ে তীরে যাওয়া অসম্ভব। অন্য কিছু বলতে কমপ্রেসর, ওয়াটার পাম্প, কিছু ডাইভিং গিয়ার, পোশাক, প্রচুর খাবার ও পানি। আর কিছুই নেই!

কুঁড়ে-ঘরের টিনে হালকা ঘুসি বসাল ফকম্যান। 'এ দিয়েই ভেলা তৈরি করা যায়। হাতে যন্ত্রপাতি আছে। দড়ির অভাব নেই।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রাশেদ, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'কমপক্ষে একদিন লাগবে কাজ চালানোর মত কিছু তৈরি করতে। নামালাম হয়তো সাগরে, কিন্তু বাতাস আর স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ব কী দিয়ে? তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকা ভাল। কোনও জাহাজ দেখলে থামানোর চেষ্টা করব।'

'ভাবছি কী ভাবে মিতাকে উদ্ধার করা যায়।'

একই চিন্তা ঘুরছে রাশেদের মনে। ওদের মরতে হবে, এমন ভাববার কারণ নেই। সঙ্গে রয়েছে প্রচুর খাবার ও পানি। লিংকন জাহাজ একবার কোভে ফিরলে সবাই দেখবে ভেসে গেছে বার্জ। শুরু হবে অল আউট সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশন। এক সপ্তাহের মধ্যে খুঁজে বের করবে ওদের। কিন্তু মিতার হাতে সময় কই?

বোনের কথা ভাবতে গেলে বুক কাঁপছে রাশেদের। খুব খারাপ লোকের হাতে বন্দি হয়েছে মিতা। মস্ত বিপদে পড়েছে। ওরা নিজেরা কিছু করবে, তা-ও সম্ভব নয়। ভেসে চলেছে দূর থেকে আরও দূরে! কপালকে দোষ দিয়ে লাভ কী? ডেকের উপর পায়চারি করছে রাশেদ। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ পড়ল কুঁড়ে-ঘরের চালের উপর। ওই যে দেখা যায় মিতার সার্ফবোর্ড।

ওদিকে চেয়ে হতাশ লাগল ওর। কিছুই করতে পারবে না। তীরে ফিরবে কী করে?

তারপর হঠাৎ চমকে উঠল ওটা তো চোখের সামনে! কেউ স্রেফ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে! উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ, মুখে ফুটে উঠল আত্মবিশ্বাসের হাসি। ফকম্যানের দিকে ফিরল। 'রন, ভেলা না, আমাদের দরকার ক্যাটাম্যারান!'

ঢেউয়ের উপর ছোঁ দিল ধূসর-সাদা হেরিং গাল, পর মুহূর্তে রেগে গেল—স্কয়্যাক! তড়িঘড়ি ভেসে উঠল আকাশে। জিনিসটা ঘিরে ঘুরছে, চোখে অভিযোগ। আরেকটু হলে চাপা পড়ত সে! এ ধরনের বিদঘুটে নৌ-যান কখনও দেখেনি। নাবিক বলতে দু'জন লোক। বসে বসে কী যেন করছে। ভেসে সরে গেল গাল, ফিরছে দ্বীপের দিকে।

মিতা ও রাশেদের সার্ফবোর্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে ফাইবার-গ্লাস ক্যাটাম্যারান। ফকম্যান ও রাশেদ মিলে ভালই ডিজাইন দিয়েছে ওটার। সার্ফবোর্ডগুলো ক্যাটাম্যারানের পণ্টুন হিসাবে কাজ করছে। ফকম্যানের মাথা থেকে বেরিয়েছে খাটিয়া দিয়ে তৈরি ক্রস-মেমবার। ফ্যাব্রিক ছিঁড়ে ফেলেছে ওরা। অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমগুলো আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে নিয়েছে বোর্ডের সঙ্গে। বার্জে ডাক টেপ ছিল, ভাল ভাবে পেঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে।

'যদি বোর্ডে ড্রিল করি, বা বোর্ডের মাঝখানে ছোট গর্ত করি, তারপর সেখান দিয়ে সেফটি লাইন ঢুকিয়ে নিই, বড় ঢেউ এলেও ক্রস-মেম্বার সরবে না,' বলেছে ফকম্যান।

'পাগল হয়েছ?' আঁৎকে উঠেছে রাশেদ। 'এগুলো ভিনটেজ

গ্রেগ নোল বোর্ড। মিতা যদি জানে ওর বোর্ড নষ্ট করেছি, স্রেফ খুন করে ফেলবে আমাদের।'

তৃতীয় কট দিয়ে তৈরি করেছে ওরা মাস্তুল। প্রচুর দড়ি ব্যবহার করেছে। তিন কটের ফ্যাব্রিকগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে পাল। নীল রঙের পাল ভালই কাজ করছে। মাত্র দু ঘণ্টায় অদ্ভুত এই ক্যাটাম্যারান দাঁড় করানো হয়েছে।

'সিডনি টু হোবার্ট ইয়ট রেসে নামছি না আমরা,' সম্পূর্ণ কাজ শেষে বলেছে রাশেদ। 'আশা করি এটা দ্বীপে পৌঁছে দেবে।'

'সেটাই যথেষ্ট, কাজ হলেই হলো,' বলেছে রন। 'দেখতে এতই খারাপ যে দেখলে পাপ হয়। রীতিমত না ভালবেসে পারা যায় না!'

আবারও ওয়েট সুট পরে নিয়েছে ওরা, একটা স্যাচেলে ভরেছে খাবার ও পানি, মাস্তুলে বেঁধে নিয়েছে। এরপর বার্জ থেকে নামিয়ে দিয়েছে ক্যাটাম্যারান। খুব সাবধানে ওটার উপর চেপেছে। কোনও সমস্যা হয়নি। বার্জের টো লাইন ছেড়ে দিয়েছে ফকম্যান। দেখতে দেখতে সরে গেছে বার্জ। সঠিক দিকে ক্যাটাম্যারান তাক করেছে ওরা। ক্রস-মেম্বারে শক্ত করে বেঁধেছে পাল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠেছে ত্রিকোণ ক্যানভাস। অবাক হয়েছে ওরা, প্রায় ছিটকে রওনা হয়েছে ছোট্ট নৌ-যান।

দুই সার্ফবোর্ডে শুয়ে থেকেছে রাশেদ ও ফকম্যান, তারপর যেই বুঝেছে কটদুটো উপড়ে বেরিয়ে যাবে না, সোজা হয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ পর বুঝেছে, দড়ির বাঁধন যথেষ্ট শক্ত রয়েছে, ফলে ঢেউয়ের বিরুদ্ধে একইসঙ্গে লড়াই করছে বোর্ডদুটো। ক্রস-মেম্বারগুলো নড়ছে না বললেই চলে। তবে বড় ঢেউ এলে

ডুবে যাচ্ছে মাথা।

বিরাট এক ঢেউয়ের তলা থেকে ভেসে উঠবার পর চওড়া হেসেছে রন ফকম্যান। 'আমার মন বলছে লন-চেয়ারে বসে ওয়াটার স্কি করছি।'

ছোট্ট ক্যাটাম্যারান তরতর করে এগিয়ে চলেছে। আসবার আগে জোডিয়াকের বৈঠাটা হাল হিসাবে বেঁধে নিয়েছে রাশেদ। একটু হলেও নড়ানো যাচ্ছে ক্যাটাম্যারান। দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। সঠিক দিকে চলেছে। দূরে তীরও দেখা দিল। ওরা ঠিক করল কাছাকাছি পৌঁছলে পাল নামিয়ে নেবে রাশেদ।

'সিডনি টু হোবার্ট রেস?' অনেকক্ষণ পর বলল ফকম্যান। 'ওখানে যোগ দেয়ার কথা ভাবা যায়। স্বপ্নের মত ভাসছে আমাদের ক্যাটাম্যারান।'

'কথা ঠিক। কিন্তু রেসে যাওয়ার আগে ড্রাই সুট পরতে হবে।'

কোনওমতে তৈরি করা ক্র্যাফ্টের কারিশমা দেখে অবাক হয়েছে ওরা। রওনা হওয়ার পর দেখতে দেখতে দূরে সরে হারিয়ে গেছে বার্জ। তার কিছুক্ষণ পর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বিগ আইল্যাণ্ড। দিগন্তে বড় হয়ে উঠেছে ওটা। রওনা হওয়ার পর আবারও বোনের চিন্তা পেয়ে বসেছে রাশেদকে। যমজ ভাই-বোন ওরা। ছোটবেলা থেকে দু'জন দু'জনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এরপর বাবা-মা মারা যাওয়ায় ওদের ছিলই বা কে? বেশির ভাগ ভাই-বোন একে অন্যের প্রতিযোগী হয়, মনে জমে তিক্ততা। কখনও এমন হয়নি ওদের। অন্তর থেকে অনুভব করছে রাশেদ, ওর বোন ভাল আছে। নতুন করে কোনও বিপদ হয়নি। 'আমরা আসছি, মিতা, তুই একটু অপেক্ষা কর,' মনে

মনে বলল ও।

সন্ধ্যায় সূর্য ডুবতে শুরু হওয়ায় মওনা লোয়ার কালো লাভা লালচে হয়ে উঠল। এ অঞ্চল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। রুক্ষ, মনুষ্য বিরল। লাভায় ছাওয়া টিলাগুলো সাগর থেকে যেন খাড়া হয়ে আকাশে উঠেছে। চূড়াগুলো উঁচু-নিচু দাঁতের মত। সাগরের দিক দিয়ে কেউ উঠতে পারে না। এদিকের তীরে জাহাজ ভিড়ানো যায় না। মাঝে মাঝে কালো বালির সৈকত।

দু'মাইল দূরে পাথুরে তীর, ওদিক চাইল ফকম্যান। জায়গাটা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত, একটা মুঠোর মত বেড়ে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। 'ওটা হুমুহুমু পয়েন্ট না?' জানতে চাইল সে।

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল রাশেদ। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, চোখ সরু করে ল্যাণ্ডমার্ক লক্ষ করল সে। 'তা হলে কেলিউলি বে বেশি দূরে নয়। যেখান থেকে সরে গিয়েছিলাম, প্রায় সেখানে ফিরেছি।'

'সার্ফবোর্ড দিয়ে ভাল ন্যাভিগেশন চলে,' হাসল ফকম্যান। চেয়ে রয়েছে সে তীরের দিকে। 'সামনে যদি কেলিউলি বে হয়, তো কর্তৃপক্ষকে জানাতে গেলে যেতে হবে মিলোলিতে।'

'সেটা পাক্কা ছ' মাইল। লাভার খোঁচায় জখম হবে পা।'

'তবু বলব, হাঁটলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যারা সাগরে আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে, ভাবছ তাদের শাস্তি দেবে? কাজটা সহজ হবে না, তার চেয়ে...' থেমে গেল ফকম্যান। রাশেদের কালো চোখদুটো বলছে, কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না।

আস্তে করে মাথা দোলাল ফকম্যান। কথা বলে লাভ কী! মাসুদ রানার ভক্ত রাশেদ, যা বলবে তা-ই করবে। থামানো

যাবে না কিছুতে।

ক্যাটাম্যারান দক্ষিণ-পুবে ঘুরিয়ে নিল ওরা। চলেছে কেলিডউলি বে'র উদ্দেশে।

উনিশ

ছোট্ট স্টোর রুমটা মাঝারি একটা বাথরুমের সমান। একটাই পোর্টহোল। অস্থির লাগছে মিতার। সেই কখন আটকা পড়েছে, তারপর পেরিয়েছে অনেক সময়। যেন শামুকের গতি নিয়ে চলছে ঘড়ির কাঁটা। এ ঘরে কোনও টুলস্ নেই। কীভাবে পালাবে? চুপচাপ ভাবছে রাশেদ ও ফকম্যানের কথা। একটু পর পোর্টহোলের নীচে রাখা বালতিটার উপর উঠে চেয়ে রইল সাগরের দিকে।

স্টার্নে ব্যস্ত জলদস্যুরা। রাবারের বোট এক পাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছে সাগরে। বোটে নামল কয়েকজন ডুবুরি। বোধহয় প্রাচীন ওই জাহাজটা তল্লাসী করতে চলেছে। মনে একটু শান্তি পেল মিতা। যাও না, ভাল করে খোঁজো! পাও দেখি আর্টিফ্যাক্ট! নেই কিছু!

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরল ডুবুরিরা। সরিয়ে নেয়া হলো ড্রিল শিপ। দেখতে দেখতে ডুবে গেল সূর্য। সন্ধ্যা নামতে আবারও ব্যস্ত হলো লোকগুলো। হৈ-চৈ শোনা গেল। ক্রেন সরিয়ে নিল।

হঠাৎ বিকট আওয়াজে চমকে গেল মিতা। স্টোর রুমের দরজা খুলেছে! চৌকাঠে দাঁড়িয়েছে ষাঁড়ের মত এক লোক। ভাঙাচোরা দাঁত বের করে হাসছে! হাতের ইশারা করে ব্রিজে ঢুকতে বলছে।

তার পিছু নিল মিতা, থামল গিয়ে চার্ট টেবিলের পাশে। ওখানে ব্যস্ত ঈ, উজ্জ্বল সুইভেল বাতির নীচে পরীক্ষা করছে এক ডায়াগ্রাম। চোখ তুলে মিতার দিকে চাইল, ঠোঁটে ফুটে উঠল শয়তানি হাসি।

'এসো, মিস আহমেদ। আমার ডুবুরি বলছে খুব ভাল এক্সকেভেট করেছ তোমরা। মিথ্যা বলোনি, জাহাজের বেশিরভাগ হারিয়ে গেছে লাভার নীচে। জাহাজের যে ধরনের ডিজাইন তোমরা আশা করছ, সেটা ঠিক কি না, এইবার বোঝা যাবে।'

কোনও জবাব আশা করছে লোকটা। পেল না। শীতল চোখে চেয়ে রইল মিতা। তারপর উপরে তুলল বাঁধা দু' হাত।

'ও, হ্যাঁ। জাহাজ ছেড়ে পালাবে কোথায়?' ষাঁড়ের দিকে ফিরল ঈ, ওরফে জালাইরের ছোট ভাই তেমুর তেমুজিন, ঘাড় কাত করল।

কোমরে গোঁজা ছোরা বের করল লোকটা, দুই পোচে কেটে দিল দড়ি। দু' কব্জি ডলছে মিতা, ব্রিজের চারদিকে চাইল। ফরওয়ার্ড উইণ্ডোর সামনে দাঁড়িয়েছে এক ছোকরা হেলমসম্যান। সে, ঈ আর তার ষণ্ডা ছাড়া আর কেউ নেই ব্রিজে।

ডাকাত সর্দার একটা চেয়ার দেখাল, বসল মিতা। 'আমরা মিথ্যা বলিনি, নিশ্চয়ই বুঝেছেন,' বলল। 'আর্টিফ্যাক্ট যা ছিল, সরিয়ে নিয়েছি আমরা, একটু পরেই লিঙ্কন আমাদের নিতে

আসবে।'

বাঁকা হাসল তেমুর তেমুজিন। ঝুঁকে এল, এক হাত রাখল মিতার পেলব, মসৃণ উরুর উপর।

এক ঝাপটায় হাতটা সরিয়ে দিতে চাইল মিতা, তবে তা করল না। বরফ ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল। ভয় ও রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। লোকটার চোখে তীব্র লোভ দেখে বমি এল ওর।

'আমরা কিন্তু লিংকনকে হিলোর কাছে রেখে এসেছি,' বলল তেমুর। 'ওটা এতক্ষণে লেলেইউই পয়েন্টে পৌঁচেছে। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, জায়গাটা দ্বীপের উল্টো দিকে।' হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'ওই জাহাজের ধ্বংস-স্তূপের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমার?' আড়ষ্ট স্বরে বলল মিতা। লোভী চোখদুটো থেকে চাহনি সরিয়ে নিল।

'তুমি সত্যিই জানো না?' খানিকটা অবাক স্বরে বলল তেমুর। মিতার উরু থেকে হাত সরিয়ে নিল, টেবিলে রাখা চার্টের দিকে ফিরল। জিনিসটা সাগর-তলের সোনার ইমেজ। দেখানো হয়েছে প্রাচীন জাহাজ ও আশপাশ। লাভার মাঝে একটা এক্স চিহ্ন। 'লাভার ভিতর এক্সকেভেশন করেছ তোমরা?'

'না। সম্ভব ছিল না। কী চাও তোমরা? আর্টিফ্যাক্ট যা ছিল সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আর সব লাভার নীচে চাপা পড়েছে। এ ব্যাপারে আর কারও কিছু করার নেই।'

'একটু ভুল বললে, সোনামণি। অনেক কিছু করার আছে।'

ঈ-র দিকে চাইল মিতা, চোখে ফুটে উঠল ভয় ও কৌতূহল। ভাবছে, এই ডাকাতের আস্তিনে এমন কিছু কি আছে, যেটা ও

জানে না?

গার্ডকে ইশারা করল তেমুর, মিতাকে পাহারা দিতে বলে ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পাশেই সিঁড়ি, এক তলা নেমে হাজির হলো অ্যাফটে। এক পাশে খোলা হ্যাচ, ঢুকে পড়ল ভিতরে। জায়গাটা বড় একটা বে। একদিকে র‍্যাক ভরা কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক প্যানেল। মঙ্গোলিয়ায় যে টেস্ট চেম্বার রেখে এসেছে, এ ঘর যেন ঠিক তারই নকল।

কম্পিউটার মনিটরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বেঁটে এক লোক, যেন ইস্পাতের তৈরি চোখদুটো। চিফ অপারেটারের কাঁধের উপর দিয়ে ডিসপ্লে দেখছে। এখানে এসেছে সে খেনতি পর্বতের এক্সকেভেশন প্রজেক্ট বাতিল করে। তারই নির্দেশে রাশান সাইসমিক সার্ভে টিমকে খুন করা হয়েছে। তেমুর তেমুজিন পাশে এসে থামতে একটু মাথা দোলাল সে।

'টার্গেট এরিয়ায় ছোট একটা ফল্ট পেয়েছি,' খসখসে স্বরে বলল। 'প্রায় কিছু না পাওয়ার মতই। তবে আশা করা যায় লাভার মাঠে ফিসার তৈরি হবে। আপনি যা চান তা একদম অসম্ভব। উচিত এখানে সময় নষ্ট না করে আলাস্কা চলে যাওয়া। আপনার বড় ভাইও তা-ই চান।'

ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেতে চায় না তেমুর। নরম স্বরে বলল, 'দু'এক দিন দেরিতে ক্ষতি নেই। বলতে পারেন জুয়া খেলছি। যদি সফল হই, যদি ওটা সত্যিই রাজকীয় ওয়াইউয়ান জাহাজ হয়, কী পাব আপনি জানেন না। আলাস্কা মিশন সফল হওয়া, সেই সঙ্গে মিলে যাওয়া দুনিয়ার অর্ধেক ধনদৌলত—কেমন হয়?'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেঁটে সায়েন্টিস্ট। তবে বোঝা

:গল একমত নয় সে। বলল, 'আমার ধারণা এখানে চার-পাঁচটা নাধারণ বিস্ফোরণই যথেষ্ট হবে। তারপর ডুবুরি নামিয়ে দেখা :যতে পারে। যদি দেখা যায় লাভার মাঠ ফেটেছে, খুব ভাল।'

'ঠিক আছে। অ্যাকুস্টিক বার্স্ট ছাড়ুন। সারারাত কাজ করব মামরা। যদি কিছু না পাই, বন্ধ করে দেব কাজ। সকালে রওনা হব আলাস্কা মিশন শেষ করতে।'

একটু সরে দাঁড়াল তেমুর তেমুজিন। টেকনিশিয়ানরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। জাহাজের মুন পুলের ভিতর দিয়ে নামানো হলো সাইসমিক অ্যাকুস্টিক অ্যারে। স্থির হলো ওটা লাভার স্তরের উপর। সাবটেরেনিয়ান ফল্ট তাক করেছে। কম্পিউটার কমপ্রেসরগুলো প্রয়োগ করল অ্যামপ্লিফাই করবার সিগন্যাল। বেঁটে সায়েণ্টিস্ট কম্পিউটারে ক্লিক করতেই ট্র্যান্সডিউসারগুলোর ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড ইলেকট্রিকাল পাল্স্ ছুটল পাঁচ ফ্যাদম নীচে। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরল অ্যাকুস্টিক শক ওয়েভ। চাপা আওয়াজ পাওয়া গেল। যেন বজ্রপাত হলো দূরে। শিউরে উঠল :গাটা জাহাজ।

অপেক্ষা করছে তেমুর, জানে কী ঘটতে চলেছে। মুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। এ অভিযানে একইসঙ্গে দুটো পাখি মারছে সে। নাকি তিনটে? মিতা মেয়েটা সত্যিই অপরূপ সুন্দরী!

অন্ধকার রাত। কোভের ভিতর দিয়ে চলেছে খুদে ক্যাটাম্যারান। রাশেদ ও রন ফকম্যানের হাত-পা ব্যথায় আড়ষ্ট। কিছুক্ষণ পর এক কার্নিসের নীচ দিয়ে চলল ক্যাটাম্যারান। ওখানে থামল দুই ডুবুরি। পাশেই আকাশ-ছোঁয়া টিলা। স্নার্ফবোর্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াল রাশেদ। একটু দূরে জ্বলজ্বল করছে ড্রিল শিপের

বাতি। আরও সতর্ক হলো ওরা, মাস্তুল ও পাল খুলে ফেলল। কার্নিসে তুলে ফেলল ক্যাটাম্যারান।

ওখানে বসে বিশ্রাম নেবে, চোখ রাখল জাহাজের উপর। সারাদিন পানিতে ভিজতে হয়েছে। ক্লান্ত শরীরটা ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। জাহাজে বারোজন লোক দেখল ওরা। ডেরিক নিয়ে ব্যস্ত তারা। স্টার্নের ডেকে বাতি জ্বলছে, সেই আলোয় দেখা গেল উঁচু একটা ট্রাইপড। ডেকের ভিতর দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলো ওটা।

'ওরা কি সত্যিই লাভার ভিতর ড্রিল করবে?' বলল রন ফকম্যান।

'মাথায় ঢুকছে না। লাভার নীচ থেকে কী উদ্ধার করবে?'

প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। খাবার ও পানি নিয়ে বসল ওরা। গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করে মনে হলো নতুন প্রাণ ফিরল ধড়ে। এবার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে নেওয়া জরুরি। হঠাৎ নিচু একটা গর্জন শুনল ওরা। এমন আওয়াজ, মনে হয় অনেক দূরে বাজ পড়ছে। কিন্তু শপথ করে বলতে পারে, আওয়াজটা এসেছে ওই জাহাজের তলা থেকে।

'কী করে ওরা?' চমকে গেছে রন।

'পানির নীচে বিস্ফোরণ?' বিড়বিড় করল রাশেদ। জাহাজের আশপাশ দেখল। সাগর ওখানে নড়ছে না। বুদ্বুদও নেই। কোভের পানি কেঁপেই আবার স্থির হয়েছে।

'পানি নড়েনি বললেই চলে,' বলল রন।

'বিস্ফোরণ হয়েছে জাহাজের ভিতরে,' জানাল রাশেদ।

'মনে হয় না জাহাজের কেউ ভয় পেয়েছে,' বলল রন। নাবিকরা দেখতে দেখতে উধাও হয়েছে। আস্তে করে মাথা

নাড়ল সে। 'রাশেদ, কাছ থেকে জাহাজটা দেখা উচিত না?'

কার্নিস থেকে ক্যাটাম্যারান পানিতে নামাবে, ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমবারের মতই, কোভের ভিতর নড়ল না পানি। অদ্ভুত বিস্ফোরক, ভাবছে ওরা। পায়ের নীচ থেকে আবার এল বজ্রপাতের আওয়াজ। বাড়ছে তো বাড়ছেই! বিকট শব্দ, থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি! কিছু বুঝবার আগেই টলে পড়ে গেল ওরা। আবছা ভাবে টের পেল, খাড়া টিলার উপর ভূমিধস শুরু হয়েছে! হুড়মুড় করে নামছে ছোট-বড় পাথর, লাভার স্তূপ! চাপা পড়লে শেষ! চারপাশ ভরে উঠেছে নানান আওয়াজে!

'সাবধান, রন!' বন্ধুর কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল রাশেদ। একটু উপরে আলগা হয়েছে বড় এক বোল্ডার! গড়িয়ে নামতে শুরু করল! ওটার গতি-পথে পড়েছে রাশেদ ও ফকম্যান! ডাইভ দিয়ে প্রায় ছিটকে সরল দু'জন। ওদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল পাথর, ক্যাটাম্যারানের একদিক চেপ্টে দিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল সাগরে!

আরও কয়েক সেকেণ্ড থরথর করে কাঁপল মাটি, তারপর মিলিয়ে গেল সমস্ত আওয়াজ। জোর ভূমিকম্প হওয়ায় খেপে উঠেছে ঢেউ, আছড়ে পড়ছে টিলার পাদদেশে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হলো কোভের পানি।

'আমি ভেবেছি আস্ত টিলা মাথার উপর নামছে,' বলল রন।

পাথুরে উঁচু টিলা, তার উপর লাভার স্তর। ওদিকটা দেখল রাশেদ। 'পড়লেও পড়তে পারে। চলো, সরে যাই।'

ড্রিল শিপের দিকে চাইল ফকম্যান। কয়েক সেকেণ্ড পর চাপা স্বরে বলল, 'ওরা ভূমিকম্প তৈরি করেছে! বিস্ফোরণ

ঘটিয়েছে ওরাই!'

'বিস্ফোরণের ফলে ভূমিকম্প হয়েছে। চায়নিজ জাহাজের উপর থেকে লাভার স্তর সরিয়ে দিতে চায়।'

'ওই জাহাজ নিয়ে যা খুশি করুক। চলো, মিতাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে ভাগি। আবার ভূমিকম্প হলে মাথার উপর নামবে গোটা দ্বীপ!'

পানিতে ক্যাটাম্যারান নামিয়ে দিল ওরা, চেপে বসল পণ্টুনে। দ্রুত হাত চলছে, সরে এল পাথরের খাড়া দেয়াল থেকে। নিঃশব্দে চলেছে ড্রিল শিপ লক্ষ্য করে।

সার্ফবোর্ডের সামনের অংশে চোখ আটকে গেল ফকম্যানের। বিরাট বোল্ডারের চাপে ওখানে প্যান-কেক হয়ে গেছে সাধের ফাইবার-গ্লাস বোর্ড। আঁধারে একবার রাশেদের দিকে চাইল সে, কিছু বলল না। কাঁদলে পরে কাঁদুক বেচারা—মিতার সার্ফবোর্ড ভাল তবিয়তেই রয়েছে, কিন্তু বারোটা বেজেছে ওরটার।

বিশ

হুইল-হাউসের চার্ট টেবিলে দুই কনুই রেখে বসেছে মিতা। ভাবছে কী করে পালানো যায়। ঠিক তখনই অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট শুরু হলো। চাপা আওয়াজটা ঠিক জাহাজের নীচ থেকে এল।

রাশেদের মত ও-ও ভাবল, কোনও ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে। শয়তানগুলো নিশ্চয়ই ফাটিয়ে দিতে চায় লাভার স্তর। চিনা জাহাজ পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে!

ঘাড়-মোটা লোকটা লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। বারবার ঠোঁট চাটছে। মিতার মুখে অসহায়তা ও রাগ দেখে ভাল লাগছে তার। পানির নীচে বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই থরথর করে কাঁপতে লাগল ব্রিজ। পুরু ঠোঁটদুটো হাসিতে ফাঁক হলো তার, বেরিয়ে এল তামাক খাওয়া খয়েরি দাঁতগুলো।

এরা ডাকাত এবং খুনি, যা খুশি করতে পারে। কিন্তু এদের পাত্তা দেবে না, ঠিক করেছে মিতা। লোকগুলো ভেবেছে প্রাচীন চিনা জাহাজে মিলবে সাত রাজার ধন-সম্পদ! হয়তো সত্যি দামি কিছু মিলবে হোল্ডে। মিতার মনে পড়ল, পোর্সেলিন প্লেটের দিকে গভীর চোখে চেয়ে ছিল ঈ। লোকটা বলেছে, প্লেটগুলো রাজকীয় নয়। না-ই যদি হয়, ফিরল কেন? নিশ্চয়ই ক'টা পটারির জন্য নয়? লাভার স্তর চড়চড় করে ওঠাতে চাইছে! সম্ভব কি না, কে জানে! নিশ্চয়ই খোঁজ পেয়েছে বিপুল সোনাদানার!

দ্বিতীয়বারের মত আওয়াজ শুরু হলো। হালকা কাঁপছে ব্রিজ। চিন্তা মোড় নিল মিতার, পালাবে কী করে? প্রথম কাজ জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়া। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ও ভাল সাঁতারু। একবার পানিতে নামলে ডুব-সাঁতার দিয়ে পৌঁছবে কোভের পাথুরে কার্নিসে। উঁচু টিলা বেয়ে ওঠা কঠিন, কিন্তু রুক্ষ তীরের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। সে-চেষ্টা যদি না-ও করে, লুকিয়ে থাকবে কোনও গুহায়। লিংকন ফিরলে দেরি হবে না উদ্ধার পেতে। ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেলে বাঁচে ও।

এখন ব্রিজে ও ছাড়া আছে শুধু ছোকরা হেলমস-ম্যান আর

ষাঁড়ের মত এই গুণ্ডা। পালাতে চাইলে এখনই ভাল সময়, ভাবল মিতা। ছোকরাকে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। একটু পর পর মুগ্ধ হয়ে দেখছে ওকে। বোধহয় ভাবছে ও দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। কল্পনায় কাপড় খুলে দেখছে কি না কে জানে।

ষাঁড়ের দিকে চাইল মিতা। টেবিলের উল্টোদিকে বসেছে ষাঁড়। ঝামেলা তার দিক থেকেই আসবে। নীচ চেহারা বলছে, দুনিয়ার সমস্ত মন্দ কাজ করেছে। মুখে যা দুর্গন্ধ, যে কারও নাকে শ্বাস ফেলে খুন করতে পারবে। দেখলে মনে হয়, মানুষকে কষ্ট দিয়ে খুব মজা পায়। অজান্তে শিউরে উঠল মিতা। এ লোকের মত সেই একই খেলা খেলতে হবে ওকে। ভয় পেয়ে লাভ কী? ওর হাতে রয়েছে বড় এক অস্ত্র। চমকে যাবে লোকটা!

এক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল মিতা, স্বাভাবিক করে নিল শ্বাস-প্রশ্বাস। মন থেকে দূর করে দিল সমস্ত দুশ্চিন্তা। তারপর আস্তে করে চেয়ার ছাড়ল, পা বাড়াল ব্রিজের সামনের দিকে। এমন ভঙ্গি, যেন একটু হেঁটে পায়ের জড়তা কাটিয়ে নেবে। চোখের কোণে দেখল চেয়ার ছেড়ে পিছনে আসছে ষাঁড়।

দু' সেকেণ্ড পর পদক্ষেপ ধীর করল মিতা, বড় করে শ্বাস নিয়ে পোর্টসাইড উইং লক্ষ্য করে এগোল। পরমুহূর্তে বেড়ে গেল গতি, চলেছে দরজার দিকে। যেন লিফট ধরতে চাইছে। ঘড়ঘড় করে উঠল ষাঁড়, ছুটে এল আটকাতে। পাত্তা দিল না মিতা, প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে। এক দৌড়ে হাজির হলো গুণ্ডা, ডানহাত বাড়িয়ে দিল কাঁধ আঁকড়ে ধরতে।

অবাক হলো মিতা নিজের দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখে। জানত, ওর কাঁধ ধরতে চাইবে লোকটা। দু'হাতে খপ্ করে কব্জি ধরল ও, চরকির মত ঘুরেই এক পাশে সরে গেল। একইসঙ্গে উপরে

ঠেলে দিল কব্জি, খোলা তালু পেয়েই দিল উল্টো মোচড়। ষাঁড়ের গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে, ধপ্ করে বসে পড়ল কব্জি ধরা অবস্থাতেই। লোকটা ভেবেছে জুডোর প্যাঁচ কষবে এ মেয়ে। নড়ে উঠল সে, কিন্তু শক্ত হাতে রিস্টলক করল মিতা। চাইলে এখন এক পলকে ভাঙতে পারে হাড়। রাগে খেপে উঠল লোকটা, বাম হাতে ঘুসি ছুঁড়ল মিতার মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু বেকায়দা ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, জোর পেল না ঘুসিতে। মারটা পিঠ ঘেঁষে গেল। জবাবে উঠে দাঁড়াল মিতা, নিজের শরীর দিয়ে ঠেলতে শুরু করল। তারই ফাঁকে হাতে দিয়েছে আরেক মোচড়। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ষণ্ডা, ভুলেও ভাবেনি একটা মেয়ে তাকে এমন ব্যথা দিতে পারবে। বাধ্য হয়ে পিছাতে চাইল। হেলম্স্ কন্সোলের উপর পিঠ দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। হাত ছাড়াতে পারল না, তীব্র ব্যথায় বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। বুঝে গেছে, বদমাশ মেয়েটা না ছাড়লে উদ্ধার নেই তার।

বারবার কন্সোলে জ্বলছে একটা লাল বাতি। জাহাজের পেটের ভিতর থেকে আওয়াজ এল। মৃদু কাঁপছে জাহাজ। পিছাতে গিয়ে হেলম্স-এ ধাক্কা দিয়েছে ষাঁড়, তখনই টিপ খেয়ে ডিঅ্যাকটিভেট হয়েছে অটোম্যাটিক শিপ থ্রাস্টার বাটন। মিতার কীর্তি দেখে ভীষণ বিস্মিত হয়েছে ছোকরা হেলম্স-ম্যান, ভেবে পেল না এত সুন্দরী মেয়েটা এসব করে কী করে? এত শক্তিশালী লোক পারছে না তার সঙ্গে! নিজে ভয়ে সরে গেছে সে হেলম্ ছেড়ে, মুখ দিয়ে প্রবল বেগে বেরোচ্ছে মঙ্গোলিয়ান বুলি। বারবার আঙুল তুলল জ্বলজ্বলে লাল বাতির দিকে। সংক্ষিপ্ত হাতাহাতি হাঁপিয়ে তুলেছে মিতাকে। বড় করে শ্বাস ফেলে কন্সোলের দিকে চাইল।

সব ম্যাণ্ডারিন ভাষায় লেখা। তবে নীচে কেউ টেপ দিয়ে এঁটেছে প্ল্যাস্টিক লেবেল। ওগুলো ইংরেজি। লাল বাতিটা একবার দেখল মিতা, ওটার নীচে ইংরেজিতে লেখা: ম্যানুয়াল থ্রাস্টার কন্ট্রোল। বুদ্ধি খেলে গেল ওর। বিড়বিড় করে মাতৃভাষায় বলল, 'পরিকল্পনা একটু বদলে নেয়া যাক।' একবার চাইল হেলমস-ম্যানের দিকে। 'ছোট্ট অভিযানে চলেছি আমরা।'

লাল বাটনের পাশেই দুটো ডায়াল। থ্রাস্টার ফোর এবং পোর্ট থ্রাস্টার অ্যাফট। ওদিকে বাম হাত বাড়িয়ে দিল মিতা, একটা ডায়াল ঘুরিয়ে নিয়ে এল যিরোতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নীচ থেকে অ্যাকুস্টিক অ্যারের তৃতীয় বার্স্ট এল। ঠিক সময়, ভাবল মিতা। থ্রাস্টারের আওয়াজ মিলিয়ে গেছে ব্লাস্টের শব্দে। কপাল ভাল হলে টের পাবে না কেউ। আড়াআড়ি ভাবে কোভের দিকে চলেছে জাহাজ। মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর লাভার উপর আছড়ে পড়বে ওরা। চারপাশে শুরু হবে হৈ-চৈ। ঠিক সেই সুযোগে পালাবে ও।

'অ্যাই, পিছিয়ে যাও!' হেলম্‌স-ম্যানকে ধমক দিল মিতা। পায়ে পায়ে কন্সোলের দিকে আসছে ছোকরা, বকা খেয়ে প্রায় লাফিয়ে পিছিয়ে গেল। দেখছে, ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠছে তার সঙ্গী—চোখে ফুটে উঠেছে ভয়।

স্টারবোর্ড থ্রাস্টারগুলো নিঃশব্দে কাজ করছে। আবছা ভাবে শুনল মিতা, ওয়াটার লাইনের কাছে কী যেন ঠং করে লাগল! আড়াআড়ি ভাবে কোভ লক্ষ্য করে চলেছে জাহাজ। অন্ধকার রাত। কেউ দেখবে না। আরেকটু সরুক জাহাজ, ভাবল মিতা। ষাঁড়ের হাত ছাড়েনি, এদিকে অবশ হয়ে এসেছে নিজের হাতও।

এক এক করে প্রতিটি পল গুনছে মিতা, যে-কোনও সময়

লাভার সঙ্গে সংঘর্ষ হবে জাহাজের খোলের। ঠিক তখনই ব্রিজের দরজার কাছে আরেকটা আওয়াজ শুনল। পুরুষ কণ্ঠ, মোটা স্বরে বলে উঠল, 'কী চলছে এখানে?'

ভয়ে কেঁপে গেল মিতা। ব্রিজে ঢুকেছে ঈ! হাতে উদ্যত অটোম্যাটিক পিস্তল! নল তাক করল সোজা ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর!

একুশ

মাস্তুল ও পাল নামিয়ে ক্যাটাম্যারান নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাশেদ ও রন। দ্রুত বৈঠার ভঙ্গিতে দুইহাত চালাচ্ছে। ড্রিল শিপের এক শ' গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। অনেক জায়গা ঘুরে পোর্ট বো'র দিকে চলেছে। স্টার্ন ডেকে স্পট লাইট জ্বলছে। আলো এড়াতে হবে। নিশ্চয়ই জাহাজে পাহারার ব্যবস্থা আছে? হঠাৎ রাশেদের দিকে ঝুঁকল ফকম্যান। 'ব্রিজের দিকে তাকাও। জলদি!'

সুপার-স্ট্রাকচারের দিকে চাইল রাশেদ। সাইড উইং দরজা খোলা, চোখ পড়ল ভিতরে। ওখানে চট্ করে সরে গেল একজন। দীর্ঘ এলো চুল। ফর্সা মুখ।

'মিতা!'

'সন্দেহ কী!' বলল রন।

বোনকে দেখে খুশি হয়ে উঠল রাশেদ। বুক থেকে নেমে গেছে বিরাট এক খণ্ড পাথর। দ্বিগুণ হলো উৎসাহ, জাহাজের

দিকে চলেছে ক্যাটাম্যারান নিয়ে। 'জাহাজে উঠব! চলো দেখি কী করছে!'

জাহাজে উঠব বলা সোজা, কিন্তু বাস্তবে অত্যন্ত কঠিন। জাহাজের নীচের ডেক ওদের দশ ফুট উপরে। থ্রাস্টারগুলো দিয়ে একই জায়গায় রেখেছে জাহাজ, নোঙর ফেলা হয়নি। ইস্পাত বেয়ে ওঠা যায় না। ওর মন বলল, স্টার্নের খোলের সঙ্গে থাকবে লোহার মই—সাধারণত ইউটিলিটি ভেসেল-এ থাকে।

নিঃশব্দে বো'র সামনে পৌঁছল। পাশ কাটিয়ে চলেছে পিছন দিকে, এমন সময় তৃতীয়বার পানির নীচ থেকে শুরু হলো আওয়াজ। জাহাজের কাছে মৃদু কাঁপুনি টের পেল ওরা। বড় কিছু বুদ্বুদ উঠল নীচ থেকে। এক্সপ্লোসিভ ফাটলে যেমন হয়, তেমন কিছুই হলো না। বলকে উঠল না পানি। মুন পুলের বাতির কারণে পরিষ্কার দেখা গেল সাগর-তল। জাহাজ থেকে নীচে কয়েকটা কেবল ঝুলছে। শেষ প্রান্তে সাগরের নীচে দাঁড়িয়ে সেই ট্রাইপড।

জাহাজের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা। হঠাৎ রাশেদ টের পেল থেমে গেছে সাইড থ্রাস্টারগুলো। কারণ কী, ভাবতে চাইল। কিন্তু বুঝবার আগেই ক্যাটাম্যারানের গায়ে জোর গুঁতো দিল জাহাজ। ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল ভেলা। পর মুহূর্তে চড়াও হলো গোটা জাহাজ! রাশেদকে নিয়ে কাত হয়ে আকাশে উঠছে ডানদিকের সার্ফবোর্ড। এবার উল্টে যাবে ক্যাটাম্যারান! তলিয়ে যাবে বড় ঢেউয়ের নীচে। নতুন করে ভাসবে না, বিশাল ওজন নিয়ে ওটার উপর চেপে বসছে জাহাজ!

'লাফিয়ে পড়ো!' বন্ধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল রাশেদ। নিজে

গড়িয়ে নামবে সাগরে, কিন্তু তখনই দেখল মাথার উপর একটা দড়ি। জাহাজের পাশ থেকে কয়েক ফুট নেমেছে অব্যবহৃত মুরিং লাইন। এক সেকেণ্ড পর ঝটকা দিয়ে লাফ দিল রাশেদ। পায়ের নীচ থেকে পাক খেয়ে সরে গেল ক্যাটাম্যারান। মুরিং লাইন দু'হাতে ধরতে চাইল রাশেদ। ফস্কে গেল ডানহাত। তবে বাম হাতে ধরতে পেরেছে। এক পাক ঘুরে যেতেই শক্ত করে দু'হাতে ধরল দড়ি। নীচে চাইল একবার। তিন ফুট নীচে ফোঁস-ফোঁস করছে কালো সাগর! ভারী ওজনে টানটান হয়ে উঠেছে দড়ি!

ক্যাটাম্যারান চোখে পড়ল। দ্রুত সরছে কালো জাহাজ, ঠেলে নিয়ে চলেছে খুদে নৌ-যানকে। পরক্ষণে তলিয়ে দিল ঢেউয়ের নীচে। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবে ক্যাটাম্যারান। একটু দূরে দেখল রন ফকম্যানকে। ফেনায়িত ঢেউয়ের ভিতর উন্মাদের মত সাঁতার কাটছে সে!

'এখানে! আমি একটা দড়ি পেয়েছি!' নিচু স্বরে জানাল রাশেদ। নাবিকদের আগ্রহ কাড়তে চাইছে না।

কথাটা শুনেছে রন ফকম্যান, ঢেউ কেটে রাশেদের দিকে চলল। বুঝেছে, বেশিক্ষণ টিকবে না। তাকে ঘিরে ঘূর্ণি তৈরি করেছে বড় ঢেউ! জাহাজের পাশের দিক ঠেলছে ওকে, পরক্ষণে পেটের নীচে টেনে নিতে চাইছে! কিছুক্ষণ এই চলল, তারপর জাহাজের পাশে পৌঁছে গেল রন।

ঝুঁকে ঝুলছে রাশেদ, ওর বামহাত ঠেকল বন্ধুর ওয়েট সুটে। কলার ধরে জোরে টান দিল। পানি ছেড়ে উঠছে রন, দু' হাতে ধরল রাশেদের হাঁটু, বেয়ে উঠছে। প্রচণ্ড ওজনে ছিঁড়ে যাবে হাত, ভাবল রাশেদ। পাঁচ সেকেণ্ড পর ওর কোমর জড়িয়ে ধরল রন। পরক্ষণে ডানহাতে পেয়ে গেল মুরিং লাইন। চুপচাপ ঝুলে

রইল দু'জন।

'এ বয়সে এত উত্তেজনা সয় না, হে,' একটু পর বলল রন।

'বড়শি নেই, কিন্তু একইদিনে দুবার তোমাকে ধরলাম,' বলল রাশেদ। 'বিচ্ছিরি একটা মাছ তুমি। যদি ভেবে থাকো তোমাকে পানি থেকে তোলা আমার একমাত্র কাজ, তোমার ওজন কমাতে হবে।'

'এ পরামর্শ মনে গেঁথে নিলাম,' মাথা ঝাঁকাল রন।

পেরিয়ে গেল আরও কিছুক্ষণ। বিশ্রাম নিয়ে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রাশেদ। ক' ফুট উপরে ডেকের মেঝে। স্টার্ন ডেক থেকে লোকজনের অস্পষ্ট আওয়াজ এল।

একে একে পোর্ট বিমে উঠল ওরা। একটু দূরে উঁচু লাভার প্রাচীর। ওদিকে চাইল রাশেদ। আঁধারে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা! নিশ্চয়ই বিদঘুটে কিছু ঘটছে হুইল-হাউসে! ধাক্কা খেতে চলেছে জাহাজ, অথচ কারও খেয়াল নেই!

'চলো,' ফিসফিস করে বলল রাশেদ। 'মন বলছে বেশিক্ষণ এখানে থাকছি না।'

ব্রিজের দিকে রওনা হলো ওরা। শুনতে পেল দূর থেকে আসছে গুড়গুড় আওয়াজ। তবে এবার আওয়াজটা আসছে তীর থেকে!

পাঁচ হাজার মাইল দূরে। ওয়াশিংটন।

নুমার হেডকোয়ার্টার।

এগারো তলায় নিজের কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে ল্যারি কিং। দু'চোখ বুজে আসছে। হাতে থার্মোস, ভিতরে রয়েছে সুমাত্রা ব্লেণ্ড কফি। ক্যাফেটেরিয়া থেকে বেরিয়ে

টলতে টলতে উঠল এলিভেটরে। দরজা খুলে যেতে মহা বিরক্ত হলো। ওর গুহার দখল নিয়েছে অন্য কেউ!

উদ্বিগ্ন চোখে চাইলেন ডক্টর হাইন্স।

অফিসে ঢুকল ল্যারি। প্রায় নালিশ করল, 'আবারও চমকে দিয়েছেন, ডক্টর হাইন্স!'

'উপায় না দেখেই এসেছি। ন্যাশনাল আর্থকোয়েক ইনফর্মেশন সেণ্টার থেকে জরুরি বার্তা এসেছে।' ভাঁজ খুলে সাইসমোগ্রাম বিছিয়ে দিলেন টেবিলের উপর। সুইভেল চেয়ারে বসতে ভুলে গেছেন। 'কিছুক্ষণ আগে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে হাওয়াই-এ। বিগ আইল্যাণ্ডে। সাত ম্যাগনিচিউডের বেশি। অগভীর কম্পন। তীর থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ছিল এপিসেণ্টার। কেলিউলি বে-তে।'

'ফোর-শক কেমন ছিল?'

ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন হাইন্স। 'ঠিক আগেরগুলোর মত। কেউ এসব ঘটিয়েছে। এইমাত্র ভিনাসকে ডেটা দিলাম। অ্যাসেস করছে। ওর মালিকের অনুমতি নিইনি, আশা করি ক্ষমা করবেন।'

একটা কম্পিউটার ব্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়েছে ভিনাস, বুকের উপর ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। মনে হলো চিন্তিত। ঘুরে চাইল ডক্টরের দিকে, হাসল মিষ্টি করে।

'গুড মর্নিং তোমাদের,' হাই চাপল ল্যারি। 'ভিনাস, তুমি কি ডক্টরের ডেটা অ্যানালাইজ করেছ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা দোলাল ভিনাস। 'ডক্টর তোমাকে বলবেন ভূমিকম্পের আগে দুটো প্রাথমিক শক শুরু হয়। দুটোর সাইসমিক রিডিং একইরকম। তবে দ্বিতীয়টার ফোর-শক একটু

বেশি ছিল। প্রতিটা শুরু হয় মাটির সামান্য নীচে।'

'পার্শিয়ান গালফ-এ যে দুটো ভূমিকম্প হয়, সেগুলোর ফোর-শক কেমন ছিল?' জানতে চাইল ল্যারি।

'ঠিক একটু আগে যেগুলো হলো, র‍্যাস টানুরা আর খার্গ আইল্যাণ্ডের ভূমিকম্প ছিল ঠিক তেমনই। শুরু হয় মাটির খানিক নীচে।'

তিক্ত চেহারা করে পরস্পরের দিকে চাইল ল্যারি ও ডক্টর হাইন্স।

'হাওয়াইন দ্বীপ,' বলল ল্যারি। 'ওখানে কেন?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় হোয়াইট হাউসে যোগাযোগের সময় হয়েছে।'

বাইশ

ঘাড়ের কব্জি ছাড়েনি মিতা। অপলক চেয়ে রইল গ্লক অটোম্যাটিক পিস্তলের দিকে। দরজার চৌকাঠে থমকে দাঁড়িয়েছে তেমুর তেমুজিন। বুঝতে চাইছে পরিস্থিতি। পিছন থেকে পানি ছুঁয়ে এল গম্ভীর গুড়-গুড় আওয়াজ। পাত্তা দিল না সে, চেয়ে রইল মিতার দিকে। মেয়ের সাহস ও যোগ্যতা দেখে অবাক হয়েছে। চোখে ফুটে উঠল প্রশংসা। একইসঙ্গে বিরক্ত তার স্যাঙাৎ ভুল করায়।

ব্রিজের আরেক প্রান্তে সাহস ফিরে পেল হেলম্স্-ম্যান, ঝড়ের গতিতে কী যেন বলছে। তবে ধারে কাছে ভিড়বে না ওই মেয়ের। গলা আরও চড়া হলো। 'পোর্ট থ্রাস্টার ডিসেবল করেছে। পাহাড়ে আছড়ে পড়ছি!' হাত তুলে জানালা দেখিয়ে দিল সে। পোর্ট সাইডের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে লাভার প্রাচীর!

বক্তব্য শুনছে তেমুর, প্রায় কিছুই বোঝেনি। ছোকরা ব্রিজের জানালা দেখিয়ে দেয়ায় সেদিকে চাইল। টের পেল না পিছন থেকে এসেছে দুটো পেশিবহুল হাত। খপ্ করে জাপ্টে ধরল তার কোমর। চমকে গেল তেমুর, বুঝবার আগেই ট্রিগার টিপল। ব্রিজের ছাতে গিয়ে ঢুকল বুলেট। পরক্ষণে চরকির মত ঘুরল তেমুর, শত্রুকে লক্ষ্য করে হাতুড়ির মত চালাল পিস্তল। তবে দেরি হয়েছে, আঁধার থেকে এক পা সামনে বাড়ল শত্রু, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। হোঁচট খেয়ে এক পা সামনে বাড়ল তেমুর, সামলে নিতে চাইল। তার আগেই পা বাড়িয়ে ল্যাং মারা হয়েছে! দু' পা একইসঙ্গে মেঝে ছাড়ল তার। ধড়াস্ করে পড়ল তেমুর। দ্রুত পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিল শত্রু, পরক্ষণে এক দৌড়ে চলে গেল রেলিঙের পাশে, ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

কাতর চিৎকার বেরিয়ে এল মঙ্গোলের কণ্ঠ চিরে, 'আমি সাঁতার জানি না!' ঝপাস করে পানিতে পড়ল সে। হারিয়ে গেল মুহূর্তে।

'আমিও তো কত কিছুই জানি না, কিন্তু তোমার মত বলে বেড়াই?' বিড়বিড় করল রাশেদ।

ওদিকে পিস্তল তুলে নিয়েছে রন ফকম্যান, গিয়ে ঢুকেছে

ব্রিজে। চোখ টিপল মিতার উদ্দেশে, হাসছে। ষাঁড়ের মাথা লক্ষ্য করে তাক করল পিস্তল। ঠিক তখনই ব্রিজে ঢুকল রাশেদ, হাতে একটা টেঁটা।

'ভাল আছ তোমরা?' হেসে ফেলল মিতা। ছলছল করছে দু' চোখ।

'খুবই ভাল, তবে ভিজে সারা,' হাসল রাশেদ।

রন কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল ওরা। চার হাজার টনি জাহাজ পাশ থেকে ধাক্কা দিয়েছে কোভের দেয়ালকে। স্টারবোর্ড থ্রাস্টারগুলো থামছে না। শিউরে উঠবার মত ধাতব আওয়াজ শুরু হলো। ধারাল লাভা পড় পড় করে কাটছে জাহাজের প্লেটিং! প্রথম ধাক্কায় পঁচিশ জায়গায় ফুটো হলো হোল্ড। হুড়মুড় করে ঢুকছে সাগরের পানি! প্লাবন শুরু হলো! বিশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই পোর্ট সাইডে কাত হয়ে গেল জাহাজ! কেউ জানল না জাহাজ ও প্রাচীরের মাঝে চেপ্টে গেছে ডক্টর ঈ! জাহাজের নীচে দুলছে তার ভাঙাচোরা মৃতদেহ!

সবার ভেতর প্রথম সামলে উঠতে পারল হেলম্স-ম্যান, জাহাজের অ্যালার্ম বেল টিপে দিল সে। পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল স্টারবোর্ড উইং দরজা দিয়ে। এখনও গুণ্ডার কব্জি আটকে রেখেছে মিতা, এবার ছেড়ে দিল। বাড়াবাড়ির মুড নেই লোকটার, পাঁজরে খোঁচা মারছে রাশেদের কোঁচ। তাকে নিয়ে পোর্ট উইং দিয়ে বেরুল রাশেদ, মিতা ও রন। গুড়গুড় আওয়াজের ফাঁকে শুনতে পেল লোকজনের হৈ-চৈ।

'জাহাজের এ অবস্থা তোর জন্য?' হাসিমুখে বোনের দিকে চাইল রাশেদ।

'উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে,' জানাল মিতা।

'লোকজন আসছে,' ব্রিজ উইঙের দিকে চাইল রন।

ডেকের দুই তলা নীচে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একদল সশস্ত্র লোক, হুড়মুড় করে উঠে এসে ছুটল ব্রিজের দিকে।

'সাঁতার কাটতে পারবি?' বোনের দিকে চাইল রাশেদ। ঢালু স্টারবোর্ড উইঙের দিকে চলেছে।

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল মিতা। 'সত্যি বলতে, তোরা আসার আগে সাঁতরেই পালাতে চেয়েছিলাম।'

ব্রিজ এলাকা এক দৌড় পেরুল ওরা, নেমে এল নীচের ডেকে। রাতের আঁধারে চেঁচিয়ে চলেছে জাহাজের ক্রুরা। বো'র কাছে লাইফবোট নামাতে ব্যস্ত কয়েকজন। কাত হয়ে ডুবু-ডুবু হয়েছে পোর্টের ডেক, উঠে এসেছে সাগরের পানি। লোকগুলো নতুন কোনও বিপদ তৈরি করতে পারে, তাই দেরি না করে রেলিং টপকাল মিতা, পিছলে নেমে গেল সাগরে। ওকে অনুসরণ করল রাশেদ ও রন। জাহাজ ছেড়ে সরছে তিনজন।

তীর থেকে এল বজ্রপাতের আওয়াজ। পরক্ষণে শুরু হলো ভূমিকম্প। থরথর করে কাঁপছে মাটি। গতবার কম নড়েছে টিলাগুলো, এবার ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁকুনি খেল। কোভের সামনের টিলাগুলোর গা মুচড়ে উঠল, যেন আড়মোড়া ভাঙছে। হড় হড় করে নামছে ছোট-বড় পাথর। সাগরে পড়ল প্রকাণ্ড সব চাঁই। খেপে উঠছে সাগর, চারদিকে ঢেউ ও ফেনা। বিকট আওয়াজে ভরে উঠল চারপাশ।

ড্রিল শিপের পাশের টিলাটা নড়ে উঠল। লাভা পাথরের বিরাট এক অংশ নামছে, মাঝপথে একবার ড্রপ খেল, পরক্ষণে সরাসরি নেমে এল জাহাজের উপর। মুহূর্তে চ্যাপ্টা হলো ব্রিজ ও

কম্পিউটার রুম। পোর্ট বিমের বড় এক অংশ মাঠের মত সমান হয়ে গেল। ভয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়ল নাবিকরা। জাহাজ ছাড়া হয়ে ভেসে গেল একাকী লাইফবোট।

ক' মুহূর্ত পর ভূমিকম্পের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। রইল শুধু টিলা থেকে পাথর পড়বার আওয়াজ। তারই ফাঁকে শোনা গেল গড়গড়ার মত শব্দ—দ্রুত ডুবছে বিধ্বস্ত জাহাজ। দুয়েকটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে চলেছে। এক শ' গজ দূরে থেমেছে মিতা, রাশেদ ও রন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল, ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজ।

'ওটা চমৎকার একটা রিফ হবে একদিন,' বলল রন।

চেয়ে রইল ওরা, আস্তে করে গড়ান দিল জাহাজ, তারপর টুপ করে ডুবে গেল। সত্তর ফুট নীচে গিয়ে থামল, তার আগেই প্রচণ্ড ওজন দিয়ে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে তেমুরের সাইসমিক অ্যারে। আকাশে মাথা তুলে রইল শুধু ডেরিকের উপরের অংশ।

'চিনা জাহাজে আসলে কী ছিল?' আনমনে বলল মিতা।

'কে জানে!' কাঁধ ঝাঁকাল রাশেদ। 'যা-ই থাক, হাতে পাওয়ার জন্য লাভার মাঠ উঠিয়ে ফেলতে চেয়েছিল ওরা!'

'সেজন্যই তৈরি করেছে এই ভূমিকম্প,' বলল রন। 'যদি জানতাম ওটা কী যন্ত্র! ভয়ঙ্কর!'

'লোকগুলো কারা?' ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা।

'জানি না,' স্বীকার করল রাশেদ।

টানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনল ওরা। দ্বীপ থেকে আসছে। কিছুক্ষণ পর কোভের উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বিমান। অনেক নীচ দিয়ে চলেছে কোস্ট-গার্ডদের এইচসি-১৩০ হারকিউলিস টার্বোপ্রপ। পেটের নীচে ল্যাণ্ডিং বাতি জ্বলে উঠল।

মাথার উপর চক্কর দিয়ে চলেছে। আলো ফেলে দেখল ডেরিক। লাইফবোটে কেউ নেই। তল্লাসীর এলাকা আরও বাড়ল। তিন মিনিট পর ওয়াউ-এর হিকাম ফিল্ড থেকে এল হাওয়াইন ন্যাশনাল গার্ডের এফ-ফিফটিন এস। হারকিউলিসকে রক্ষা করতে এসেছে।

মিতারা জানে না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ সেরেছে ল্যারি কিং, সবই জেনেছেন প্রেসিডেন্ট। পাঠিয়ে দিয়েছেন কমাণ্ডোদের একটা দল। তারা ভূমিকম্পের কেন্দ্র তদন্ত করে দেখবে।

'আমাদের তুলবে কখন?' বলল মিতা। মাথার উপর ঘুরছে হারকিউলিস। 'বিমান এখানে কেন?'

'এবার বোধহয় কাটার আসবে,' বলল রাশেদ। 'তার আগেই হাজির হবে হেলিকপ্টার।'

'জাহাজ বা হেলিকপ্টার লাগে নাকি?' হঠাৎ হেসে ফেলল রন। 'উদ্ধার করতে এসেছে অন্য জিনিস।' সাঁতার কেটে একদিকে সরছে সে।

শান্ত পানির ভিতর ভাসছে কী যেন! তিন মিনিট পর পিছনে নিয়ে এল সে ওদের ক্যাটাম্যারান। প্রায় বিধ্বস্ত, ভেঙে গেছে নানাদিকে, কিন্তু ওটার উপর চেপে বসা যায়!

'এখনও টিকে?' অবাক স্বরে বলল রাশেদ।

ওদিকে চাইল মিতা, হঠাৎ কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'ওটা আমার সার্ফবোর্ড না? এখানে কেন?' রাশেদের সার্ফবোর্ডের সঙ্গে দুমড়ে গেছে কটের অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম। মিতারটা পুরোপুরি আস্ত। ভাইয়ের দিকে চাইল মিতা। 'তোর সার্ফবোর্ডের এ অবস্থা হলো কী করে?'

'সে বিরাট কাহিনি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাশেদ। 'ভাগ্যিস, তোরটা হয়নি!'

তেইশ

জালাইর তেমুজিনের স্টাডি-রুমে ঘড়ির কাঁটা থমকে গেছে। তেমনই লাগছে গ্রেসি মুলারের। বারবার চোখ আটকে যাচ্ছে দামি টাইম-পিসের উপর। মন বলছে, মোটেই নড়ছে না কাঁটা। যতবার ভাবছে পালাবে, শিউরে উঠছে। মনের চোখে দেখছে বেচারা এডির লাশ। ঘড়ি দেখা বাদ দিল গ্রেসি, মনোযোগ দিয়ে জিওলজিকাল রিপোর্ট দেখবার ভঙ্গি নিল।

পাক্কা দু'দিন কাজ করেছে ওরা। থেমেছে শুধু খাওয়ার সময়। জালাইর তেমুজিন বা তার বোন জানে না কয়েক ঘণ্টা আগেই ড্রিলিং অ্যানালাইসিস হয়ে গেছে। বসে বসে সময় নষ্ট করছে ওরা এখন। গত সন্ধ্যায় ওদের ডিনার শেষ হতেই চলে যায় প্রহরীদের একজন। এর পর ছিল মাত্র একজন। আজও যদি তেমন হয়, সুযোগটা নেবে ওরা।

উইলসনের দিকে চাইল গ্রেসি। উনি সাইসমিক-ইমেজিং রিপোর্ট পড়ছেন। চেহারা বলছে, খুবই খুশি। ডক্টর ফ্রেডারিখ ফন বোমারের ইমেজিং টেকনোলজি তাঁকে বিস্মিত করেছে। মন থেকে কী ভাবে দূর করেছেন ভয়, যদি জানতাম, ভাবল গ্রেসি।

ঘণ্টার কাঁটা পৌঁছে গেল রাত দশটায়, ঘরে ঢুকল বলোর্মা। কালো স্ল্যাক্স পরেছে, সঙ্গে হালকা উলের সোয়েটার। যত্ন করে আঁচড়েছে দীঘল কালো চুল। অদ্ভুত সুন্দর একটা নেকলেস পরেছে। ঝিকমিক করছে সোনার পাতে বসানো হীরাগুলো। যত দামি গহনাই পরো, তোমার নীচ অন্তরটা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে, ভাবল গ্রেসি।

মেয়েটার দিকে চাইলেন উইলসন, কিছু বললেন না।

'অ্যানালাইসিস শেষ হয়েছে?' রুক্ষ সুরে জানতে চাইল বলোর্মা।

'না,' বললেন উইলসন। 'এসব প্রোফাইল থেকে বুঝেছি আগে যা ধারণা করেছি, তা-ই সঠিক। আরও অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে, নইলে ড্রিলিং প্রসপেক্টগুলো অপটিমাইজ করা অসম্ভব।'

'আর কতক্ষণ লাগবে?'

বড় করে হাই তুললেন উইলসন। ভাল হলো অভিনয়। 'আর চার-পাঁচ ঘণ্টা।'

ঘড়ির দিকে চাইল বলোর্মা। 'কাল সকালে আবার বসবেন। দুপুরের আগে কাজ শেষ করা চাই। আমার ভাইকে সব বুঝিয়ে দেবেন।'

'এর পর উলানবাটোরে পৌঁছে দেয়া হবে তো?' জানতে চাইল গ্রেসি।

'নিশ্চয়ই,' মিষ্টি করে হাসল বলোর্মা। মনেই হয় না ঠাট্টা করছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন বলল প্রহরীকে, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। করিডোরে খট-খট আওয়াজ তুলল তার হাই-হিল।

ধীরস্থির হয়ে গেলেন উইলসন। গ্রেসির সঙ্গে সাজিয়ে রাখছেন রিপোর্টগুলো। পরিষ্কার করতে লাগলেন ওঅর্ক টেবিল।

সময় পেরিয়ে চলেছে। মাত্র একটা সুযোগ মিলবে, তা কাজে লাগিয়ে বেরুতে হবে এই বন্দিশালা থেকে। সেজন্য আগেই সরিয়ে দিতে হবে প্রহরীকে।

কিছুক্ষণ পর হাতে কোনও কাজ থাকল না। আরও দেরি করলে সন্দেহ করবে গার্ড। উঠে দাঁড়াল দু'জন, পা বাড়াল দরজার দিকে। উইলসন সঙ্গে নিয়েছেন বেশ কিছু ফাইল। ওগুলো আঙুল তুলে দেখাল প্রহরী, আস্তে করে মাথা নাড়ল। টেবিলে ফাইলগুলো নামিয়ে রাখলেন উইলসন, লাঠির ঠুক-ঠুক আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলেন গ্রেসির সঙ্গে। পিছনে আসছে প্রহরী।

ধুক-পুক করছে গ্রেসির হৃৎপিণ্ড। লম্বা এই করিডোর শেষ হবে কখন? বোধহয় এ বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। বাতিগুলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিয়েছে। বলোর্মা বা তেমুজিন বোধহয় বাঁ দিকের উইংে থাকে। ওখানে কোনও আলো জ্বলছে না। একটা সাইড রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল বেঁটে এক ডোরম্যান, হাতে ভোদকার বোতল। গ্রেসির দিকে ক্ষুধার্ত চোখে চাইল, তারপর দ্রুত চলে গেল সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের দিকে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন উইলসন, জমে উঠেছে তাঁর অভিনয়। তিনি পঙ্গু এক অসহায় মানুষ, নিজেকেও প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছেন। করিডোর শেষে ধীর পায়ে বামদিকে চললেন। তার আগেই দেখা শেষ, আশপাশে কেউ নেই। ফয়েই ফাঁকা। প্রায় পৌঁছে গেলেন নিজেদের ঘরগুলোর কাছে। এবার নিজের কাজ শুরু করতে হবে তাঁকে।

কোনও বাড়তি ভঙ্গি নিলেন না তিনি, একটু সামনে বাড়িয়ে দিলেন ওয়াকিং স্টিক। ওটা পড়ল গ্রেসির ডান পায়ের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে পা বেধে হোঁচট খেল গ্রেসি—হলিউডি স্টান্ট-উয়োম্যানরা লজ্জা পেত দৃশ্যটা দেখলে। গ্রেসির সঙ্গে নিজের পা ফস্কে দিলেন উইলসন। মনে হলো হুড়মুড় করে পড়বেন। কিন্তু ভর দিলেন ভাল পায়ের উপর, সামলে নিলেন। মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গ্রেসি, নড়ছে না। এবার কাজে নামা উচিত গার্ডের।

যা ভেবেছেন উইলসন, মঙ্গোল প্রহরী যথেষ্ট ভদ্রলোক, দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে গ্রেসির দিকে। অপেক্ষা করলেন তিনি, লোকটা যেই দু'হাতে তুলতে গেল গ্রেসিকে, সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মত নড়ে উঠলেন। সোজা হয়ে দু'হাতে ধরলেন ওয়াকিং স্টিকের ডগা, পরক্ষণে মোটা হাতলটা নামিয়ে আনলেন প্রহরীর মাথার পিছনে। খট্রাশ্ শব্দে দু'টুকরো হয়ে গেল ওয়াকিং স্টিক। ঠন-ঠনাৎ করে দু'দিকে গিয়ে পড়ল দু' টুকরো। দু' সেকেণ্ড জ্বলজ্বল করল প্রহরীর চোখজোড়া, তারপর উল্টে পড়ে গেল সে মেঝের উপর।

পাথরের মূর্তির মত জমে গেল দুই কলিগ। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই তো? যদি তেড়ে আসে প্রহরীরা? না, কারও সাড়া নেই, শব্দ নেই। থমথম করছে বিশাল প্রাসাদ। বুকটাই শুধু ধড়ফড় আওয়াজ করছে, টের পেল গ্রেসি।

'কিছু হয়নি তো?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন উইলসন। হাত বাড়িয়ে টেনে তুললেন গ্রেসিকে।

'কিছুই হয়নি। লোকটা মারা গেছে?' কেঁপে গেল গ্রেসির কণ্ঠ। আঙুল তাক করে দেখাল প্রহরীকে।

'না। মরবে কেন, বিশ্রাম করছে।' পকেট থেকে ড্রেপারি কর্ড বের করলেন উইলসন। স্টাডি থেকে এনেছেন। ওগুলো

দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললেন প্রহরীর। গ্রেসির সাহায্য নিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন প্রথম ঘরের ভিতর। বিছানা থেকে চাদর তুলে বেঁধে ফেললেন মুখ, চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে, তালা মেরে দিলেন দরজায়।

'এবার পালিয়ে যাওয়া।' বললেন, 'মন শক্ত করো।'

নার্ভাস বোধ করছে গ্রেসি, উইলসনের পাশে পা বাড়াল ফয়েই লক্ষ্য করে। নিঃশব্দে চলেছে দু'জন। সামনে ফয়েই শুরু।

'ভাগ্যটা সহায় থাকুক,' বললেন উইলসন। থেমেছেন একটা কলামের পিছনে।

'আমি একা যাই, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ,' আগেই বলেছে গ্রেসি। জখমী পা নিয়ে দ্রুত হাঁটতে পারবেন না উইলসন। রওনা হয়ে গেল ও স্টাডি-রুমের দিকে।

ডানদিক দিয়ে ফয়েই পেরুলো গ্রেসি, ঢুকে পড়ল করিডোরে। নিজের সাহস দেখে নিজেই অবাক। মার্বেল পাথরের মেঝেয় টুক-টুক আওয়াজ তুলছে ওর জুতো। খালি হলওয়ে। আওয়াজ বলতে প্রাচীন কোনও গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের টক-টক তাল ঠোকা। প্রায় নিঃশব্দে স্টাডি-রুমে পৌঁছুল গ্রেসি। দরজা পেরিয়ে চট্ করে এক পাল্লার আড়ালে সরে গেল। কপাল ভাল, যাওয়ার আগে বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছে গার্ড। অন্ধকার ঘর। কেউ হলওয়ে থেকে দেখবে না ওকে। কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিল, ভয় যেন কাবু না করতে পারে।

এ ঘর পরিচিত। পিছন দিকের বুকশেলফের কাছে চলে গেল গ্রেসি। পটাপট বই তুলে ফেলতে লাগল মেঝেতে। বড় স্তূপ তৈরি হতে বসল ওটার পাশে। মোটা একটা বই মাঝখান

থেকে ছিঁড়ল। বাইণ্ডিং খসে যেতেই বেরিয়ে এল পাতাগুলো। দুটো বইয়ের পাতা দিয়ে তৈরি হলো ছোটখাটো এক পিরামিড। ওটার চারদিক ঘিরল আরও বই দিয়ে। প্রতিটি বই উল্টো V করে রেখেছে। এবার নিজের কাজে সন্তুষ্ট হলো গ্রেসি। অন্ধকারে চলে গেল ছোট এক কর্নার টেবিলের সামনে। ওটার উপর সিগার হিউমিডার দেখেছে। পাশে রয়েছে কনিয়্যাক ভরা ক্রিস্টাল ডিক্যান্টার। ডিক্যান্টার তুলে নিল গ্রেসি, সারা ঘরে ছিটিয়ে দিল মদ। শেষ অংশ ঢালল কাগজের স্তূপের উপর। আবার ফিরল টেবিলের সামনে, হাতড়ে দেখল হিউমিডার। ভিতরে রয়েছে ম্যাচের বাক্স। গতকাল এ জিনিস আবিষ্কার করেছেন উইলসন। ওটা নিয়ে পা টিপে টিপে চলে এল দরজার কাছে, উঁকি দিয়ে চাইল করিডোরে। থমথম করছে সব। কেউ নেই।

আবার বইয়ের স্তূপের কাছে ফিরল, পিরামিডের উপর ঝুঁকে জ্বালল ম্যাচ। কাঠিটা ফেলতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল কনিয়্যাক ভেজা কাগজ। ছায়াছবিতে দেখা বিশাল আগুনের গোলক বা বিস্ফোরণ হলো না, তবে কনিয়্যাক তার কাজ করল। ভেজা কার্পেটে ছোট একটা নীল শিখা নদীর মত একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটল।

'পুড়িয়ে দে সব,' ফিসফিস করে বলল গ্রেসি। 'পুড়িয়ে দে এই বন্দিশালা!'

চব্বিশ

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পর রওনা হয়েছিল ওরা। এখন ঘুটঘুটে আঁধার নেমেছে পাহাড়ি এলাকায়। চাঁদ উঠতে দু'ঘণ্টা বাকি। ট্রাকের পিছনে উঠেছে ওরা, ভাগাভাগি করে নিয়েছে প্রয়োজনীয় গিয়ারগুলো।

'কত গভীর ওই খাল?' জানতে চেয়েছে সোহেল। পরে নিয়েছে ডিইউআই নিয়োপ্রিন ড্রাই সুট।

'সাত ফুটের বেশি হবে না,' বলেছে রানা। 'স্নরকেল দিয়েই কাজ চলত, তবে ব্যবহার করব রিব্রিদার। দরকার পড়লে পানির নীচে থাকব।'

ড্রাই সুটের জিপার টেনে নিয়েছে রানা, হার্নেসে আটকে নিয়েছে ড্রেইগার রিব্রিদার। জিনিসটার ওজন মাত্র তিরিশ পাউণ্ড। এ সিস্টেম ডুবুরির নিঃশ্বাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিষ্কার করে, একটানা সরবরাহ করে তাজা অক্সিজেন। আজকাল ব্যবহার হয় না স্টিলের ইয়াজদাহা ট্যাঙ্ক, বদলে রয়েছে ছোট ট্যাঙ্কো। এই রিব্রিদার সিস্টেম দিয়ে বুদ্বুদ ওঠে না বললেই চলে। চট্ করে ধরা পড়বার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ওয়েইট বেল্ট পরে নিয়েছে রানা, ভুল করেনি ওয়াটার প্রুফ ডাইভ ব্যাগ নিতে। ওটার ভিতরে রয়েছে ওর জুতো, ছোট দুটো

রেডিয়ো সেট ও নতুন পাওয়া পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোল্ট। ট্রাক থেকে নেমে চারপাশ রেকি করে দেখল রানা, এরপর বন্ধুদের বলল, 'তৈরি তোরা?'

'চল্, যাই,' ট্রাক ছেড়ে নেমে পড়ল সোহেল।

'ভাল হতো খালটা গরম পানির বাথটাব হলে,' বলে উঠল ববি। 'হাতে থাকত বারবন!' টুল-বক্সে কী যেন খুঁজে দেখল সে। 'দাঁড়াও দেখি, আগে মানুষের দরজা ভাঙার যন্ত্রপাতি নিয়ে নিই।' বের করল হ্যাকস', মাঙ্কি রেঞ্চ, ক্রোবার। আণ্ডারওয়াটার টর্চ ঝুলিয়ে নিল বেল্টে, তারপর লাফিয়ে নামল ট্রাক ছেড়ে।

ওরা যেন কালো রাবারের চামড়াওয়ালা নরকের জীব। রাতের আঁধারে জঙ্গল ভেদ করে চলেছে তিনজন। আড়াআড়ি ভাবে জঙ্গল পেরিয়েছে ওরা, নিঃশব্দে গাছের সারি ছেড়ে এসে থামল সরু খালের পাড়ে। দু' গজ দূরে কলকল করে বইছে জলের ধারা। দূর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ি নদীর কলোচ্ছ্বাস, মনে হচ্ছে যেন খেপে উঠেছে নদী। তিন ভূতের একজন খালে চুবিয়ে দিল পেনলাইট, জ্বলে উঠল আলো। ভূতের হাতটা ঘিরে দ্রুত ছুটছে জল। নদীতে নামতে হবে না, সেজন্য খুশি তারা। বাতি নিভিয়ে দিল মাসুদ রানা, আস্তে করে মাথা দোলাল দুই বন্ধুর উদ্দেশে।

সবার হাতে লাইট-ওয়েইট ডাইভ ফিন। চারপাশ দেখে নিয়েছে। চাঁদ ওঠেনি। কিন্তু ঘুটঘুটে আঁধারও নেই, ঝিলমিল করছে কোটি-কোটি নক্ষত্র। অবশ্য মাঝে মাঝেই গোটা আকাশ ঢাকা পড়ছে ভারী মেঘে। তিরিশ ফুটের বেশি চোখ চলে না। একবার খালে নেমে পড়লে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই কম।

'ধীরে এগুবো,' বলল রানা। 'কমপাউণ্ডে ঢুকে ছোট সেতু পেরিয়ে তারপর থামব।' ফিন পরে একবার দেখে নিল রেগুলেটর কাজ করছে কি না, তারপর মুখে মাস্ক বসিয়ে আস্তে করে নেমে পড়ল খালে। পাঁচ সেকেণ্ড পর পিছু নিল সোহেল। তার পিছনে ববি মুরল্যাণ্ড।

পাহাড়ি নদীর পানি, কনকনে ঠাণ্ডা। খালি গায়ে নামলে যে-কেউ দু' মিনিটে হাইপোথারমিয়ায় মারা পড়বে। তবে রানা, সোহেল ও ববি নেমেছে ইনস্যুলেটেড ড্রাই সুট পরে। তার পরেও মনে হলো জমে যাবে বরফ ঠাণ্ডা পানির ভিতর। ডুবে যাওয়ায় কমে গেল ওজন। যা ভেবেছে, তার চেয়ে জোরে বইছে স্রোত।

মেঝের উপর চিত হলো রানা, পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিল। মাঝে মাঝে নাড়ছে ফিন। ওকে টানছে নিম্ন-মুখী স্রোত। মাঝারি গতিতে ভেসে চলেছে। কংক্রিটের খাল এঁকেবেঁকে গেছে, পাশেই পাকা রাস্তা।

মেঝে ও দু'পাশের দেয়ালে শেওলার পাতলা আস্তর। পিছলে এগিয়ে চলেছে ও। আরামদায়ক ভ্রমণ, দু'চোখ রেখেছে আকাশে। পাশেই উঁচু সব পাইন গাছ। পানির নীচ থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ডালপালা। কিছুক্ষণ পর সরে গেল গাছের সারি, বড় একটা মোড় নিয়ে সোজা হলো খাল। সামনে থেকে এল হলদেটে আলো। সামনে তেমুজিনের কম্পাউণ্ডের প্রাচীর। সতর্ক হয়ে উঠল রানা, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল।

বাতি আসলে দুটো। একটা কম্পাউণ্ডের দেয়ালের উপর, অন্যটা আসছে গার্ডদের কুঠি থেকে। দুটোই উজ্জ্বল। ঘরে বসে গল্প করছে দুই গার্ড? না বোধহয়। চোখ রেখেছে বড় ভিডিও

মনিটরে।

পুরো কম্পাউণ্ডের দেয়ালে বসানো বারোটা ক্যামেরা, সেখান থেকে ফিড আসছে। একটা ক্যামেরা সরাসরি তাক করা খালের উপর। এসব নাইট ভিশন ইমেজগুলো সবুজ রঙের হয়। দুর্গম এ এলাকায় মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দু'একটা নেকড়ে বা গ্যাজেল হরিণ। প্রকৃতির ডাকেও সাড়া দেওয়ার নিয়ম নেই গার্ডদের। তাস খেলা বা ঘুমানো তো হারাম। কাজে ফাঁকি দিলে ক্ষমা করে না জালাইর তেমুজিন। পান থেকে চুন খসারও শাস্তি ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক মৃত্যু!

প্রাচীর দেখেই ড্রাই সুটের ভিতর থেকে বাড়তি বাতাস বের করে দিল রানা, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের উপর, পিছলে চলেছে। নিশ্চয়ই একই কাজ করছে সোহেল ও ববি। পানি ঝকঝকে স্বচ্ছ, মেঝে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় জোরাল বাতির আলোয়। এখন যদি মনিটরে ছবি ফুটে ওঠে ওদের? মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে বাতি! তিন সেকেণ্ড পর পিছনে পড়ল আলো। তার আগেই হাঁটুমুড়ে বসবার ভঙ্গি নিয়েছে রানা, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে হাতদুটো। সামনে ধাক্কা লাগবে, ভাবছে। ধারণা ভুল হলো না। বাধা পেল ওর ডানহাত, থমকে গেল ও। বড় ময়লা বা আর কিছু ঠেকাতে রাখা হয়েছে লোহার শিকের দরজা। একপাশে সরে গেল রানা, ঘুরে চাইল পিছনে। বড়সড় কালো বস্তার মত এল সোহেল, বাধা পেয়ে থামল। এরপর এল ববি।

মাত্র ক' ফুট দূরে প্রহরী-কুটির। লোকগুলো যদি জানত পৌঁছে গেছে অনুপ্রবেশকারী শত্রু? পাখির মত গুলি করে মারত! ভিডিও ক্যামেরা দেখছে নিশ্চয়ই? হয়তো দেখেছে কালো বড়

কিছু থেমেছে শিকগুলোর সামনে। ঘরের উষ্ণতা ছেড়ে আসবে তদন্ত করতে? যদি বেরিয়ে এসে কান পাতে, শুনবে পানির নীচ থেকে আসছে করাত ঘষার আওয়াজ!

কাজে নেমে পড়েছে ববি। যে ধরনের বাধা থাকবে ভেবেছিল, তেমন নেই। গ্রিলের বুনোটের বদলে ছয় ইঞ্চি পর পর খাড়া ভাবে বসানো সরু রড। মাঝখানের রডটা বেছে নিল ববি, বসে পড়ল ওটার সামনে। গোড়া থেকে কাটতে শুরু করল হ্যাকস' দিয়ে। সাতবার হ্যাকস' চালানোর পর কাটা পড়ল মরচে ধরা রড। পাশেরটা ধরল ববি। সময় লাগল প্রায় একই। রড দুটোর নীচের অংশ দু'হাতে ধরল, উঠে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর দৃঢ় করল দু'পা, টান দিয়ে বাঁকিয়ে তুলে দিল রডদুটো উপরে। তৈরি হলো সরু একটা পথ।

কুঁজো হলো ববি, সাবধানে ঢুকে পড়ল ফোকরে। স্রোতের ধাক্কা খেয়ে পেরিয়ে এল। ঘুরে চাইল, একে একে আসছে রানা ও সোহেল। জোরালো স্রোত টেনে নিয়ে চলল ওদের। সামনে পড়ল কংক্রিটের প্রকাণ্ড এক পাইপ। ঘুটঘুটে আঁধারে ডুবে গেল চারপাশ। ক' মুহূর্ত পর ওদেরকে কম্পাউণ্ডে উগরে দিল পাইপ। কোনও বাঁক নেই খালে, সামনে পড়ল সেতু। ওটা পেরিয়ে ভেসে উঠল ওরা।

'এসে গেছি,' নিচু স্বরে বলল ববি।

খালের পাড় অসম্ভব পিচ্ছিল। বেয়ে ওঠা কঠিন। দু'বার পিছলে পড়ল সোহেল। শেষ পর্যন্ত সেতুর পিলার ধরে উঠে এল ওরা। রেলিঙের ছায়ায় বসে ড্রাই সুট খুলে ফেলল, সাবধানে ওগুলো রেখে দিল সেতুর নীচে। চারপাশ নিঝুম। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ঘোড়ায় চেপে পাহারা দিচ্ছে না কেউ।

ডাইভ ব্যাগ খুলল সোহেল, বের করল ওর জুতো ও ছোট্ট ডিজিটাল ক্যামেরা। রানা বের করল ওর ·৪৫ কোল্ট ও রেডিয়ো সেট দুটো। নিশ্চিত হলো, ওগুলোর ভলিউম কমিয়ে রাখা। একটা কোমরে ঝুলিয়ে নিল, অন্যটা দিল সোহেলকে। 'কোল্টটা তুই রাখ।'

'ওটা লাগবে তোদের,' মাথা নাড়ল সোহেল। 'বিপদে পড়লে রেডিয়ো করব।'

'আপনার নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ লাগবে না?' বলল ববি।

'এই যাব আর আসব।'

সোহেলের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে ওরা ল্যাবোরেটরি খুঁজে দেখবার কাজ। সাইসমিক ডিভাইস সম্বন্ধীয় ডুকমেন্ট জোগাড় করবে ও, তুলে আনবে ল্যাবোরেটরির ছবি। ওখানে যদি লোকজন থাকে, জোর করে ঢুকবার চেষ্টা করবে না, ফিরে এসে অপেক্ষা করবে এই সেতুর কাছে। এদিকে রানা-ববি ঢুকে পড়বে প্রাসাদে, খুঁজে বের করবে গ্রেসি ও উইলসনকে।

'যদি বিপদে না পড়ি, দেখা হবে এখানে,' বলল রানা। 'এখান থেকে চলে যাব গ্যারাজে, তেমুজিনের জিপ দখল করে বেরিয়ে যাব।'

'এটা সঙ্গে রাখুন, সোহেল,' ক্রোবার বাড়িয়ে ধরল ববি। 'যদি দরজা ভাঙতে হয়... বা কারও মাথা...'

মৃদু হাসল সোহেল, ক্রোবার নিয়ে রওনা হয়ে গেল। বাগান পেরিয়ে রাস্তা, ওটা পার হয়ে ঢুকে পড়বে ল্যাবোরেটরির ভিতর। দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ওরা ওদের কাজ। তেমুজিনের কজা থেকে গ্রেসিদের বের করবে রানা ও ববি। এদিকে ল্যাবোরেটরির কাজ শেষ করবে সোহেল। ওরা জানে এসব

কাজে দরকার অন্তত এক ডজন সশস্ত্র কমাণ্ডো, বদলে এসেছে ওরা তিনজন! হাঁটতে গিয়ে একবার আকাশে চোখ রাখল সোহেল, হেসে ফেলল। কোথায় কমাণ্ডো বাহিনী? মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। চারদিকে নিকষ অন্ধকার।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে সরছে। বাগান শেষ হয়ে এল, সামনে রাস্তা। চারপাশ দেখে নিয়ে হনহন করে রাস্তা পেরুলো সোহেল। মনের চোখে দেখছে ল্যাবোরেটরি। ওটার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে রানা। এখন ও জানে কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে ঢুকতে হবে।

শক্তিশালী বালব্ জ্বলছে আস্তাবলের সামনে। ভিতর থেকে ঘোড়ার নাক ঝাড়বার আওয়াজ এল। স্বাভাবিক পায়ে আস্তাবল পেরুলো সোহেল। ল্যাবোরেটরির আরেক প্রান্তে কেউ এখনও জেগে। গ্যারাজে টুং-টাং আওয়াজ তুলে যন্ত্রপাতি ঠিক করছে।

ল্যাবোরেটরির দরজার কাছে পৌঁছে গেল সোহেল। পিছন থেকে এল হ্রেষাধ্বনি! ঘোড়াটা অপরিচিত গন্ধ পেয়েছে! ওটার পিঠে আরোহী রয়েছে? আস্তাবল থেকে কেউ বেরিয়ে এলে? থমকে গেল সোহেল। মিশে গেল দেয়ালে। চারপাশে চাইল। কোনও নড়াচড়া নেই। ল্যাবোরেটরির দরজা সামনেই। ওখানে মরা আলো ফেলেছে দুটো বালব। মৃদু আওয়াজ। কেউ দোতলায় গান শুনছে। সায়েন্টিস্টরা বোধহয় উপরে থাকে।

রওনা হয়ে গেল সোহেল, পাঁচ কদম ফেলে পৌঁছুল কাঁচের দরজার সামনে। দরজা ধাক্কা দিয়ে একটু অবাক হলো—খুলে গেল! ঢুকে পড়ল টেস্ট বে'র ভিতর। দরজা পিছনে আটকে দিয়ে চারপাশ দেখল। সামনে বেশ কিছু ডেস্ক। দু'টোর উপর জ্বলছে ল্যাম্প। ডেস্কের উপর অসিলোস্কোপগুলো মৃদু গুঞ্জন

তুলছে। কেউ নেই। একদিকের দেয়ালে কোট-র‍্যাক চোখে পড়ল। ওখান থেকে সাদা একটা কোট নিল সোহেল, ঢাকা পড়ল ওর কালো জ্যাকেট। কেউ চট্ করে বুঝবে না ও নকল বৈজ্ঞানিক।

রানা বলে দিয়েছে কোনটা মূল করিডোর, দৃঢ় পায়ে ওটার দিকে চলল সোহেল। কাউকে ডরাই আমি?— এমন ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল ভিতরে। দু'পাশ দেখতে দেখতে চলেছে। একের পর এক অফিস, অন্ধকার। এরপর তিনটে অফিস খোলা। ভিতরে এখনও লোকজন কাজ করছে। মুখ নিচু করে জানালাগুলো পেরুলো সোহেল। কেউ দেখলে ভাববে এক সায়েন্টিস্ট চলেছে টয়লেটে, বা নিজ ল্যাবোরেটরিতে। চোখে-মুখে এমন ভঙ্গি ধরে রেখেছে: আরে, আমাকে চিনলে না? আমি তো তোমাদেরই একজন!

দু'মিনিট পেরুনোর আগেই হলওয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ও। এবার পুরু দরজা খুলতে হবে। বড় করে শ্বাস নিয়ে ছিটকিনি ধরল, আস্তে করে নামিয়ে দিল। নিঃশব্দে খুলল দরজা। প্রকাণ্ড ঘরটা দেখে একটু অবাক হলো। পিছনে ভিড়িয়ে দিল দরজা। ঘরের ছাত অনেক উঁচু। মাঝখানে জ্বলছে উজ্জ্বল বাতি। এ ঘরের ভাল বর্ণনা দিয়েছে রানা, স্বীকার করল সোহেল। আলোর নীচে ঝুলছে ফ্রেডারিখ ফন বোমারের অ্যাকুস্টিক সাইসমিক ডিভাইস।

ঘরে ও একা। ক্যাটওয়াকে উঠে পড়ল সোহেল, দ্রুত চলে গেল সাইসমিক অ্যারের সামনে। বিড়বিড় করে বলল, 'অর্ধেক কাজ শেষ আমার।' পকেট থেকে বের করল ডিজিটাল ক্যামেরা, ব্যস্ত হয়ে উঠল কাজে। ভাবছে, এখন কী করছে রানা আর ববি?

'তুমি যদি সামনে থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করো, আমি পিছন থেকে চমকে দেব ওদের,' বলল রানা। চেয়ে রইল বহু দূরে। সিংহ-কবাটের দু'দিকে দাঁড়িয়ে প্রহরী দু'জন, কাঠের পুতুলের মত।

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল ববি। 'আমি শ্বেত-পদ্ম, ওরা কালো ভ্রমর।' বেল্ট থেকে খুলে নিল লাল রঙের ভারী পাইপ রেঞ্চ।

'বেঁটে-খাটো ফুল, ভ্রমর ধরতে তৈরি?' কোল্টের উপর চোখ রাখল রানা, অফ করল সেফটি। দুই প্রহরীকে কাবু না করে বাড়ির ভিতর ঢোকা অসম্ভব। গোলাগুলির সুযোগ ওদের নেই। এই নব্য তেমুজিন সতর্ক লোক, কম্পাউণ্ডে রেখেছে কমপক্ষে আট-দশজন সশস্ত্র প্রহরী।

একটা নালার পাশ দিয়ে চলেছে রানা ও ববি। এসব জলাধার ঢুকেছে গিয়ে প্রাসাদের ভিতর। বাগানে একটু পর পর ফোয়ারা। ছেঁটে রেখেছে ফুলের ঝোপঝাড়। বাড়ির দরজার পঞ্চান্ন গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা ও ববি। ঘাসের ভিতর দিয়ে চলে গেল দামাস্কাস গোলাপের ঝাড়ের পিছনে। এ ঝাড় প্রায় ঘিরে রেখেছে প্রাসাদের এণ্ট্রিওয়ে। হলুদ গোলাপগুলো হাতের তালুর সমান, দারুণ দেখাচ্ছে। কাঁটাওয়ালা ডাল ও পাতার পিছন থেকে উঁকি দিল ওরা। পঞ্চাশ গজ দূরে চোখে পড়ল প্রহরীদের। বাড়ির কলামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ধরেই নিয়েছে, রাতে পাহারা দেয়া অর্থহীন। জানে, বাড়ির মালিকপক্ষ খানিক হাঁটাহাঁটি করে সন্ধ্যায়। যখন রাতে উলানবাটোর থেকে আসে, তখনকার কথা আলাদা। এমনিতে রাত দশটার পর

বাইরে দেখা যায় না তাদের।

ববিকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলল রানা, এরইমধ্যে পৌঁছবে ও লোকদুটোর কাছাকাছি। গোলাপ ঝাড়ে বসে রইল ববি, রওনা হয়ে গেল রানা। গোলাপ ঝাড় ঘুরে চলেছে। পঁয়তাল্লিশ গজ দূরে বাতির নীচে দাঁড়িয়ে প্রহরীরা। সামনে পড়ল ড্রাইভ ওয়ে। অন্ধকার। ড্রাইভ ওয়ের গোড়া থেকে শুরু করে বাড়ি পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা। খোয়া পাথরের উপর দিয়ে পা টিপে নিঃশব্দে রাস্তা পেরুলো রানা। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ডান দিকের বাগানে। বাড়ির সামনের ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে ছুটছে। থামল বড়সড় জুনিপার ঝাড়ের ভিতর। উঁকি দিয়ে দেখল বারান্দা। পাথরের মূর্তি দুটো টের পায়নি। আর মাত্র দশ গজ।

কুঁজো হয়ে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে সরছে রানা, শেষ ঝোপের কোনায় থামল। উঁকি দিয়ে দেখল পোর্টিকো। হাতে বেরিয়ে এসেছে পয়েন্ট ফোর্টি-ফাইভ। এবার অপেক্ষা করবে, খেলা শুরু করবে ববি।

ওদিকে বাগানে কোনও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি ববির। বাড়তি সময় দিয়েছে রানাকে। এবার গোলাপ ঝাড় ছেড়ে রওনা হতে হয়। দেখেছে পোর্টিকোর কলামগুলো ছাত থেকে নেমেছে একটা অ্যাঙ্গেলে, বারান্দা লক্ষ্য করে এগোলে খেয়াল করবে না গার্ডরা। কোনাকুনি ভাবে একটা কলামের পিছনে থাকতে চাইল ববি, তারপর বেরিয়ে এল গোলাপ ঝাড় থেকে।

হিসাব সোজা, ও যদি গার্ডদের দেখতে না পায়, তারাও ওকে দেখবে না। কলামের পিছনে যেতে সমস্যা হওয়া উচিত নয়। পা টিপে টিপে চলেছে। কিছুক্ষণ পর কলামের পিছনে

হাজির হলো। দরজাটা আর বড় জোর বিশ ফুট দূরে। পরিষ্কার দেখা গেল দুই গার্ডকে। বিন্দুমাত্র আওয়াজ করল না ববি, কলামের পিছন থেকে বেরিয়ে রওনা হলো এক প্রহরীকে লক্ষ্য করে। পাঁচ ফুটও পেরোয়নি, তার আগেই দা চালানোর ভঙ্গিতে ছুঁড়ল পাইপ রেঞ্চ।

দুই প্রহরী একইসঙ্গে লক্ষ করেছে গাঁট্টাগোট্টা ইতালিয়ানকে। প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি হলো তাদের। অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে রইল, চোখের কোণে দেখছে কী যেন ছিটকে আসছে। বুঝবার আগেই একজনের বুকে লাগল রেঞ্চ। একটা পাঁজর ভাঙল মড়াৎ করে। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল লোকটা, কাতরাচ্ছে ব্যথায়। দ্বিতীয়জন অজান্তেই সাহায্যে আসতে চাইল বন্ধুর, পরক্ষণে বুঝল তার সঙ্গী গুরুতর আহত নয়—লাফিয়ে উঠে তেড়ে এল সে ববির দিকে। ততক্ষণে ওখানে নেই ববি, পিছিয়ে আবার আড়াল নিয়েছে কলামের। হোঁচট খেয়ে দিক পরিবর্তন করল মঙ্গোল, ছুটছে কলামের দিকে। কিন্তু পিছনে শুনতে পেল পদধ্বনি। নতুন এই শত্রুকে মোকাবিলা করতে চরকির মত ঘুরতে চাইল সে, পরক্ষণে চোখের কোণে দেখল একটা কোল্টের বাঁট নেমে আসছে মাথার উপর।

মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে। টলে পড়ছে, তার দু' বগলে দু' হাত ভরে দিল রানা। আস্তে করে শুইয়ে দেবে মেঝের উপর, তার আগেই কলামের পিছন থেকে বেরিয়ে এল ববি। অচেতন লোকটাকে চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিল ওরা এক ঝোপের আড়ালে। হঠাৎ ববির চোখে সতর্কতা দেখল রানা।

'বসে পড়ো!' চাপা স্বরে বলল ইতালিয়ান।

দেরি না করে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা, ওর উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে গেল ববি। রানার পিছনে এসে হাজির হয়েছে রেঞ্চের ঘা খাওয়া প্রহরী, কোমর থেকে ছোরা বের করে তুলেছে গেঁথে দেবে শত্রুর পিঠে। উড়ন্ত ববির বামহাত লাগল লোকটার ডানহাতের কনুইয়ে। বেকায়দা ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ঘুরল সে, পরক্ষণে তার উপর নেমে এল ববি। ভারী ওজন নিয়ে নেমেছে লোকটার বুকের উপর। পরক্ষণে ধড়াস্ করে পড়ল দু'জন নুড়ি-পাথরে। আরও দুটো পাঁজর ভেঙে যাওয়ায় কোঁ-কোঁ করে উঠল প্রহরী, শ্বাস নিতে গিয়ে বড়বড় হলো চোখ দুটো। ববির ডানহাতি ঘুসি নামল তার ঘাড়ে খপ্ করে বন্ধ হলো লোকটার মুখ। অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য জ্ঞান হারিয়েছে।

'খুব কাছাকাছি এসে গেছিল,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ববি।

বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল না রানা। ওদের হিসাব অন্যরকম। বন্ধুর বিপদে পাশে থাকাই নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হয় না ওদের। উঠে দাঁড়াল রানা, চারপাশ দেখছে। বাগান থমথম করছে। বাড়ির ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। প্রহরীরা কোনও অ্যালার্ম বাজিয়ে থাকতে পারে, তবে তেমন কোনও আওয়াজ কানে আসেনি।

'চলো গার্ডদুটোকে সরিয়ে ফেলি,' বলল রানা। অচেতন প্রহরীর দু'পা ধরল ও, কলার ধরল ববি। লোকটাকে টেনে নিয়ে গেল ওরা আগের সেই ঝোপের ভিতর। ওখানে পাশাপাশি শুইয়ে দিল দু'জনকে। এদের ঘুম ভাঙতে দেরি হবে অনেক।

বন্ধুর উদ্দেশে বলল ববি, 'আশা করি চট্ করে শিফ্‌ট বদলে যায় না গার্ডদের।' বোঝা বয়ে হাঁপিয়ে গেছে। বন্ধুর দিকে সন্দেহ নিয়ে চাইল, চকচক করছে রানার চোখ। কারণ কী?

'এবার প্রহরীদের না বদলে উপায় কী?' মৃদু হাসল রানা। ইঙ্গিত করল সরু একটা জানালার দিকে।

পঁচিশ

চিকন, শিখা গিলছে ছেঁড়া পাতাগুলোকে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে গ্রেসি। প্রতিক্ষণে বাড়ছে আগুন। ভালমত ধরেছে বইয়ের পিরামিডে। আর নিভবে না। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের সামনে চলে গেল গ্রেসি। যে ফাইলগুলো নিতে চেয়েছেন উইলসন, সেগুলো নিয়ে চলল স্টাডি রুমের দরজার দিকে। ফাইলে রয়েছে ফন বোমারের বিস্তারিত ইমেজিং, সঙ্গে সাইসমিক ফল্টের মানচিত্র। ওগুলোর মধ্যে রয়েছে আলাস্কার মানচিত্র, লাল দাগে চিহ্নিত। ঘরের পিছনদিকে দাউ-দাউ করে ধরেছে হলুদ আগুন। একবার ঘুরে চাইল গ্রেসি, তারপর করিডোরে বেরিয়ে এসে রওনা হলো ফয়েই লক্ষ্য করে।

দ্রুত হাঁটছে, তবে ছুটছে না। মার্বেল পাথরের উপর হাই হিল তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলুক, তা চায় না। শিরায় শিরায় ছুটছে অ্যাড্রেনালিন, ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড। করিডোরটা মনে হচ্ছে অনেক লম্বা। বারবার মন বলছে, ওরা মুক্তির প্রান্তে। ওদের পরিকল্পনা সোজা। একবার ফয়েই পেরুলেই হলো। লুকিয়ে থাকবে ওরা। ভালমত আগুন ধরলে হৈ-চৈ শুরু করবে সবাই।

প্রহরীরা ছুটে ঢুকবে ভিতরে। সেই সুযোগে বাড়ি ছেড়ে বেরুবে ওরা। চেষ্টা করবে কোনও জিপ-গাড়ি যোগাড় করতে। ওটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে গেট ভেঙে। ভালই আগুন ধরেছে বাড়ির ভিতর, খানিকটা আত্মতুষ্টি হচ্ছে গ্রেসির। এবার বোধহয় পালাতে পারবে ওরা।

হাঁটবার গতি কমাল গ্রেসি, সামনে ফয়েই। করিডোর ছেড়ে বেরিয়ে এল, জানে কোথায় লুকিয়েছেন উইলসন। তাঁকে খুঁজছে ওর চোখ। যেখানে রেখে গেছে, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে উইলসন। কারুকার্য-খচিত একটা কলামের পাশে। তাঁর দিকে দ্রুত চলেছে গ্রেসি, কিন্তু আশঙ্কা কেন তাঁর চোখে? নীরবে চেয়ে রইলেন উইলসন! জবাবে হাসতে চাইল গ্রেসি, মাথা কাত করে বোঝাতে চাইল, ওর কাজ শেষ করেছে। হাসিখুশি উইলসন যেন ভয়ে পাথর হয়েছেন! হাসির বদলে মুখে ফুটে উঠেছে তিক্ততা!

তারপর উইলসনের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বলোর্মা! হাতে ছোট্ট একটা অটোম্যাটিক পিস্তল, তাক করেছে ভদ্রলোকের পিঠে! শয়তানী হাসি ঠোঁটে, গ্রেসির চোখের দিকে চেয়ে হিসহিস করে বলল, 'সান্ধ্যকালীন হাঁটাহাঁটি নিশ্চয়ই?'

বুকের ভিতর ভয়ে জমে গেল গ্রেসির হৃৎপিণ্ড। বাজে মেয়েলোকটা খল-খল করে হাসছে! হঠাৎ ভয় দূর হয়ে গেল ওর, বদলে ভীষণ রাগ হলো। ভাবল, যদি পারতাম তোর গলাটা টিপে ধরতে!

'ঘুম আসেনি আমাদের,' নরম স্বরে বলল গ্রেসি। 'অ্যানালাইসিসের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। অস্থির লাগছিল। গার্ডকে বুঝিয়ে বললাম। ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি এই রিপোর্টগুলো, ঘরে বসে দেখব।' ফাইলগুলো দেখাল গ্রেসি।

সাধ্যমত মিথ্যা বলছে। কিন্তু পরিষ্কার বুঝছে, এ পিশাচী একটা কথাও বিশ্বাস করছে না।

'গার্ড গেল কোথায়?'

'স্টাডির দরজা বন্ধ করছে।'

ঠিক তখনই ধুপ-ধাপ আওয়াজ এল করিডোর থেকে। আগুন-ধরা বুকশেলফ থেকে পড়ছে বই-পুস্তক! প্রশ্ন ফুটে উঠল বলোর্মার চোখে। এক পা সরল উইলসনের কাছ থেকে, ভাবছে ফয়েই পেরিয়ে ঢুকবে কি না করিডোরে। এখনও পিস্তল তাক করে রেখেছে উইলসনের কপাল লক্ষ্য করে।

গ্রেসিকে একবার দেখলেন উইলসন, মৃদু নড করল পরস্পর।

ওদের এটা যেন রিহার্সাল দেয়া অভিনয়, বাণ্ডিল ভরা কাগজ বলোর্মার মুখের উপর ছুঁড়ে দিল গ্রেসি। পিস্তলসহ মেয়েটির ডানহাত পাকড়ে ধরতে প্রায় লাফিয়ে পড়লেন উইলসন। কিন্তু সাপের মত ফোঁস করে উঠল বলোর্মা, আধ পাক ঘুরেই সরে গেল উইলসনের কাছ থেকে। কাগজগুলো লাগল না মুখে, মেঝের দিকে পড়ছে ঝরঝর করে। ঘুরেই এক পলকে গ্রেসির পাশে পৌঁছল বলোর্মা, চোয়ালে ঠেসে ধরল পিস্তলের নল। তখনও সব কাগজ মেঝেতে পড়েনি।

'তোমরা যা করেছ সেজন্য খুন করা উচিত তোমাদের,' গ্রেসির কানের কাছে হিসহিস করে উঠল বলোর্মা। বামহাতে ইশারা করে পিছিয়ে যেতে বলছে উইলসনকে। 'এবার দেখব আর কী বদমায়েশী করেছ তোমরা!'

গ্রেসির গালে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে এগুতে বাধ্য করল সে। ম্যাকারভ পিএম এত জোরে ঠেসে ধরেছে যে ব্যথায় পানি চলে

এল গ্রেসির চোখে। সিংহ্-কবাটের সামনে পৌঁছে গেল দু'জন। বামহাতে ছিটকিনি খুলল বলোর্মা, এক ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল দরজা।

'গার্ডস!' ধমকে উঠল। 'আমার সাহায্য দরকার!'

বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দুই প্রহরী। টিনের হেলমেট মাথার উপর চাপিয়ে রেখেছে। ঝড়ের গতিতে দৌড়ে ঢুকল তারা, মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে। প্রথম প্রহরী ছুটল উইলসনের দিকে, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। ওটা চেপে ধরল সে জিওফিসিস্টের পাঁজরে। দ্বিতীয় প্রহরী বেঁটে লোক, শক্ত করে ধরল সে গ্রেসির দুই হাত।

'নিয়ে যাও একে,' নির্দেশ দিল বলোর্মা, গ্রেসির গাল থেকে সরিয়ে নিল পিস্তল। হ্যাঁচকা একটানে গ্রেসিকে বলোর্মার কাছ থেকে সরিয়ে নিল প্রহরী। অসহায় চোখে একবার উইলসনের দিকে চাইল গ্রেসি। কিন্তু উইলসনের ভয়-উদ্বেগ মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে। জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো। পরক্ষণে গ্রেসি টের পেল অদ্ভুত কিছু ঘটছে। শক্ত করে ধরা হাতদুটো ছেড়ে দিয়েছে প্রহরী। তার বদলে খপ্ করে ধরেছে বলোর্মার কব্জি! পুষ্ট হাতদুটো যেন গাছের গুঁড়ি, প্রচণ্ড জোরে চাপ দিল বলোর্মার কব্জিতে। মেয়েটা বুঝবার আগেই ঠন-ঠনাৎ করে মেঝের উপর পড়ল পিস্তল। প্রহরী ছাড়েনি কব্জিদুটো, আরও জোরে মুচড়ে দিল আরেকদিকে। পরক্ষণে এমন ধাক্কা দিল যে মেঝের উপর ছিটকে গিয়ে পড়ল বলোর্মা, কাতরে উঠল ব্যথায়।

'কী করছ তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল সে। উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। অবশ দুই কব্জি কোলের কাছে রেখেছে। প্রথমবারের মত মনোযোগ দিল প্রহরীর দিকে। লোকটা সে খাটো, যে শার্ট

পরেছে সেটার হাতা অনেক লম্বা! লোকটা হাসছে! এ চেহারা কোথায় যেন দেখেছে আগে! দ্বিতীয় প্রহরীর দিকে চাইল বলোর্মা, ওই লোকের শার্ট খাটো হয়েছে! খুবই খারাপ, পিস্তল তাক করেছে সে ওরই দিকে! তার চেহারার দিকে চাইল বলোর্মা, এমন গাঢ় কালো চোখের মণি কোথায় যেন দেখেছে সে! কড়া চোখে চেয়ে রয়েছে লোকটা ওর দিকে! পরক্ষণে মনে পড়ল বলোর্মার, এ লোক তো সেই বৈকাল হ্রদের মাসুদ রানা! বাঁচিয়েছিল ওদের নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে।

'তুমি!' ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল বলোর্মা, আরও কিছু বলতে চাইলেও হারিয়ে গেল কণ্ঠ।

'কাকে আশা করেছ,' নিচু স্বরে বলল রানা। বলোর্মার পেটের দিকে তাক করেছে পিস্তল।

'কিন্তু... তোমরা... তোমরা না মরুভূমিতে মারা গেছ?' ভাঙা স্বরে বলল বলোর্মা।

'না তো, তবে তোমাদের নকল ভিক্ষুটা মরেছে,' বলল ববি। কুড়িয়ে নিল ম্যাকারভ পিস্তল।

ওর কথা শুনে শিউরে উঠল বলোর্মা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

'ববি, সত্যিই তোমরা তা হলে আমাদের নিতে এসেছ!' বলল গ্রেসি, আর কিছুই বলতে পারল না। পানি এসে গেল চোখে।

শক্ত করে হাত ধরল ওর ববি। নরম স্বরে বলল, 'তোমাকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়েছি বলে দুঃখিত।'

আস্তে করে মাথা দোলাল গ্রেসি, বুঝেছে।

'আপনাদের দেখে খুব ভাল লাগছে, মিস্টার রানা,' বললেন

উইলসন। 'আমরা নিজেরা এখান থেকে বেরুতে পারতাম না।'

'এডির কী করেছে দেখেছি আমরা,' ঠাণ্ডা চোখে বলোর্মাকে দেখছে রানা। 'ভাল হয়েছে আপনারা পালাতে চেয়েছিলেন, নইলে অনেক সময় লাগত খুঁজতে।'

'এবার বেরিয়ে যাওয়া উচিত,' বলল ববি। 'সত্যিকারের গার্ড হাজির হতে পারে।' গ্রেসির হাত ছাড়ছে না, দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল।

'একমিনিট,' বলল গ্রেসি। 'সাইসমিক রিপোর্টগুলো নেব। আমরা প্রমাণ করতে পারব এরা পার্শিয়ান গালফ আর আলাস্কায় টেকটোনিক ফল্ট নড়িয়ে দিতে চায়।'

'পাগলের মত কথা বলছ,' কড়া স্বরে বলল বলোর্মা।

'তোমার সঙ্গে কেউ আলাপ করছে না,' বলোর্মার বুকে ম্যাকারভ তাক করল ববি।

'গ্রেসি ঠিকই বলেছে,' বললেন উইলসন। কলিগের সঙ্গে ঝুঁকে তুলতে শুরু করেছেন রিপোর্টগুলো। 'এরা বৈকাল হ্রদের উত্তরে পাইপ-লাইন ধ্বংস করেছে। সেজন্য তৈরি হয় সেই সেইশ ওয়েভ। পার্শিয়ান গালফে নির্দিষ্ট ফল্টগুলো তাক করবে এরা। এদের আরেকটা কাজ আলাস্কা পাইপ-লাইন বিধ্বস্ত করা।'

'যা বলছেন গালফে ঠিক তা-ই করেছে এরা, আলাস্কার কথা আমরা এখনও জানি না,' বলল রানা।

'ডেটা মিলছে, সঙ্গে থাকবে সোহেলের তোলা ছবি,' বলল ববি।

কৌতূহল নিয়ে রানা ও ববির দিকে চাইছে উইলসন ও গ্রেসি।

'খানিক দূরে একটা ল্যাবোরেটরির ভিতর আছে অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে,' বলল রানা। 'ওটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে। এ ধরনের জিনিস পারস্য উপসাগরের ফ্যাসিলিটিগুলো ধ্বংস করেছে। দুটো বন্দর মুহূর্তে মিশে গেছে সাগরে। এখন যে প্রমাণ মিলবে, তার সঙ্গে যোগ হবে আপনাদের ডেটা। সব মিলে বেরিয়ে আসবে কী করা হয়েছে। আমরা এইমাত্র জানলাম এদের তালিকায় রয়েছে আলাস্কাও।'

দু'হাত ভরা কাগজ নিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রেসি। ঠিক তখনই করিডোরের ভিতর থেকে উঠল তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ! বই-পোড়া ধোঁয়া এইমাত্র ট্রিগার করেছে স্মোক ডিটেক্টরকে। চেঁচিয়ে মাথায় তুলছে পুরো বাড়ি!

'স্টাডি রুমে আগুন দিয়েছি,' বলল গ্রেসি। 'ভেবেছি এই সুযোগে পালাব।'

'আশা করা যায় পালাতে পারব,' মৃদু হাসল রানা। 'তবে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগেই ভাগতে হবে।'

লম্বা পা ফেলে দরজার কাছে চলে গেল রানা। ওর পিছু নিয়ে আসছে গ্রেসি ও উইলসন। কিন্তু পিছন-দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে বলোর্মা, আশা করছে আস্তে করে সরে পড়বে। তার দিকে চেয়ে হাসল ববি, কয়েক পা ফেলে খপ্ করে ধরল ওর সোয়েটারের কলার, একটানে হেঁচড়ে নিয়ে চলল বাইরে। অতি নরম স্বরে বলল, 'দুঃখের কথা, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে! নিজের পায়ে হাঁটবে, না কান টেনে তুলব?'

ঘুরে চাইল বলোর্মা, বেরিয়ে পড়ল দাঁতগুলো। বিড়ালের মত ফুঁসছে, কিন্তু কোনও উপায় না দেখে বেরিয়ে এল প্রাসাদের দরজা দিয়ে।

পোর্টিকো ধরে এগুতে শুরু করেছে রানা ও অন্যরা। চলেছে কলামগুলোর দিকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। একই সঙ্গে আওয়াজটা পেয়েছে সবাই। বাড়ির উত্তরদিক থেকে ছুটে আসছে কয়েকটা ঘোড়া! অ্যালার্মের আওয়াজ পেয়েছে গার্ডরা! হৈ-চৈয়ের আওয়াজ আসছে আস্তাবলের দিক থেকে। লণ্ঠন ও ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল। ছুটোছুটি করছে লোকজন। সিকিউরিটি কোয়ার্টার ছেড়ে ছুটে আসছে গার্ডরা! সবার লক্ষ্য এই বাড়ি!

একবার গ্রেসির দিকে চাইল ববি। যদি বাড়িতে আগুন না দিত সুন্দরী! মাত্র তিনমিনিট আগে বেরিয়ে এলে গার্ডদের ছুটোছুটি এড়িয়ে সরে যেতে পারত। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে গার্ডরা! রানার দিকে চাইল ববি।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'একমাত্র উপায় লুকিয়ে থাকা।'

মাথা ঝাঁকাল ববি। 'যদি সম্ভব হয়। গার্ডরা প্রাসাদে ঢুকলে পালাব।'

জুনিপার ঝোপের দিকে ইশারা করল রানা। বিজ্ঞানীকে বলল, 'চলুন, ঝোপের আড়ালে সরে যাই।'

বাগান ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক হাতে বলোর্মার কাঁধ চেপে ধরল ববি। রানার পিছনে ছুটতে শুরু করেছে সবাই। জুনিপার ঝোপ পর্যন্ত যাওয়া বিপজ্জনক, তার আগেই থামল রানা একটা গোলাপ কাঁটাঝোপের পাশে। ওটার ভিতর ঢুকে পড়ল গ্রেসি ও উইলসন। আপত্তি তুলতে চাইল বলোর্মা। কিন্তু একহাতে তার মুখ চেপে ধরল ববি, চোয়ালে ঠেসে ধরল ম্যাকারভ। ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে গিল ঝোপের ভিতর। চাপা স্বরে বলল, 'শ্‌শ্‌! নইলে এক চড়ে...'

ববির পাশে ঝোপের ভিতর বসেছে রানা, বেল্ট থেকে খুলে নিল ছোট্ট রেডিয়ো। নিচু স্বরে বলল, 'সোহেল, শুনছিস?'

'হ্যাঁ।' ভেসে এল বিসিআই অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের কণ্ঠ।

'বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কিন্তু বাইরে শুরু হয়েছে জমজমাট পার্টি। ভাগছি। পাঁচ থেকে দশ মিনিট, তারপর চলে আসিস সেতুর কাছে।'

'আমার কাজ প্রায় শেষ। গ্যারাজ থেকে একটা গাড়ি ধার নেব দশ মিনিটের ভিতর। আউট।'

মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা। আস্তাবল থেকে এসেছে তিন গার্ড, ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটছে। লোকগুলো এরইমধ্যে খেয়াল করেছে সিংহ-কবাটে প্রহরী নেই। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল তারা প্রাসাদের ভিতর। দরজার কাছে জ্বলে উঠল নিচু ওয়াটের কয়েকটা বাতি। ওই আলো পৌঁছবে না ঝোপ পর্যন্ত।

ঘোড়সওয়ারীরা এখনও পঞ্চাশ গজ দূরে। আরেক প্রান্তের গোলাপ ঝাড় দেখল রানা। আন্দাজ করতে চাইল ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কি না। মন সায় দিল না। ঘোড়সওয়ারীরা ভাববে না দরজার এত কাছে লুকিয়েছে ওরা। কপাল ভাল থাকলে গ্রেসির আগুন আরও ভাল করে ধরবে। নিভাতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সবাই।

আটজন ঘোড়সওয়ার, দ্রুত ছুটে আসছে। কিন্তু নুড়ি-পাথরের ড্রাইভ-ওয়েতে পড়ে রাশ টেনে কমিয়ে আনল গতি। চেয়ে রইল রানা, কু দিয়ে উঠল মনের ভিতর। অর্ধচন্দ্র তৈরি করে ছড়িয়ে পড়ছে লোকগুলো। যেন জাল টেনে আনছে পোর্টিকোর দিকে। তারপর একইসঙ্গে থেমে গেল। অস্বস্তি নিয়ে নাক ঝাড়ল দুটো ঘোড়া। শক্ত হাতে তাদের স্থির রাখল

আরোহীরা। প্রাসাদের ভিতর থেকে হঠাৎ থেমে গেল অ্যালার্ম। বাগানের আরেক প্রান্ত থেকে আসছিল আরও চার গার্ড, হঠাৎ থামল তারা ড্রাইভ-ওয়ের মুখে। হয় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, নইলে নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

কোন্‌টা ঘটেছে, ভাবছে রানা। হঠাৎ চমকে উঠল। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে। মাত্র একটা সুইচের চাপে একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে বারোটা সার্চ-লাইট। পোর্টিকোর র‍্যাফটার থেকে বাগানের উপর ফেলেছে দিনের আলো। চারপাশ এক পলকে পরিষ্কার করে দিয়েছে হ্যালোজেন বালবগুলো। গোলাপ ঝোপের দু'পাশ দেখল রানা। প্রখর আলোর নীচে পরিষ্কার ধরা পড়েছে ওরা!

কোল্ট অটোম্যাটিকের বাঁট শক্ত করে ধরল রানা, নল তাক করল কাছের ঘোড়সওয়ারীর বুকে। বাগানের আরেক প্রান্ত থেকে যে চার গার্ড পায়ে হেঁটে আসছিল, মনে হলো না তাদের কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু ঘোড়সওয়ারীরা সশস্ত্র। সঙ্গে রয়েছে তীর-ধনুক। শুধু তা-ই নয়, কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলেছে রাইফেলও! তাক করেছে ওদের দিকে! এক ঘোড়সওয়ারীর বুকে ম্যাকারভ তাক করেছে ববি, চোখের কোণে দেখল রানা। তাতেই বা কী? আটটা রাইফেলের বিরুদ্ধে কী করবে ওরা দু'জন?

গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়বে, ভাবছে দুই পক্ষ। ঠিক তখনই শ্বেত-পাথরের ফয়েই হতে ভেসে এল ছুটন্ত পদধ্বনি। বারান্দার উপর ছুটে বেরিয়ে এল চারজন লোক। যে তিন প্রহরী একটু আগে প্রাসাদে ঢুকেছে, তারা আরও দু'তিন কদম বাড়ল, তারপর থমকে দাঁড়াল। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা, ববি ও অন্যদের দিকে। আগুন নিভাতে গিয়ে কালিঝুলি মেখে গেছে

তাদের কমলা টিউনিকে, তবে চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। শক্ত হাতে ধরেছে একে-৭৪ অ্যাসল্ট রাইফেল!

তাদের পার হয়ে এল চতুর্থ লোকটি, ছুটে নেমে এল ড্রাইভ ওয়ের উপর। ভাব দেখে মনে হলো গোটা এলাকার মালিক সে-ই! কথাটা মিথ্যে নয়। নীল রোব পরে বেরিয়ে এসেছে জালাইর তেমুজিন। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখ পড়ল পাশের ঝোপে। উজ্জ্বল আলোর ভিতর উলঙ্গ তার অজ্ঞান দুই প্রহরী! টকটকে লাল চোখে রানার দিকে ঘুরে চাইল জালাইর তেমুজিন, মাপা ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'তোমরা যে-ই হও, শাস্তি পেতে হবে তোমাদের।'

অ্যানেকোয়েক চেম্বারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সোহেল আহমেদ। আগেও সাউণ্ডপ্রুফ টেস্ট চেম্বার দেখেছে। কিন্তু সেগুলোর ভিতর এত ধরনের শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। একের পর এক কম্পার্টমেন্ট ঠাসা রয়েছে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে। প্ল্যাটফর্মের বাইরের অংশে সারি সারি কম্পিউটার ও পাওয়ার র‍্যাক। একবার ওর সুযোগ হয় রানার সঙ্গে ট্রাইডেন্ট সাবমেরিনের ভিতর ঢুকবার। ওখানে ঠাসা ছিল কম্পিউার-প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট। কিন্তু এ ঘর যেন ছাড়িয়ে গেছে ওই সাবমেরিনকে। সব কিছুর বাড়া ঘরের মাঝখানে ঝুলন্ত জিনিসটা। তিনটি টিউব দিয়ে তৈরি, দশ ফুট উঁচু। খানিকটা সন্দেহ নিয়ে অ্যাকুস্টিক ট্র্যান্সডিউসারের দিকে চাইল সোহেল। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শিরশিরে অনুভূতি। ল্যারি কিঙের কথা মনে পড়ল—এই জিনিস তৈরি করে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প!

শীত-শীত ভাব দ্রুত কেটে গেল। চেম্বারের তাপমাত্রা কমপক্ষে এক শ' ডিগ্রি। অবাক হয়েছে সোহেল, এ চেম্বারের সমস্ত ইকুইপমেন্ট চলছে। বোধহয় কোনও ধরনের প্রিপ্রোগ্রাম্‌ড্ টেস্ট চলছে। চালু থাকা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির পাওয়ার সাপ্লাইগুলো থেকে তৈরি হয়েছে প্রচুর তাপ, ঘরটা হয়ে উঠেছে তপ্ত কড়াই। ল্যাব-কোট খুলে ফেলল সোহেল, তারপর ফাউল-ওয়েদার জ্যাকেট। ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে গিয়ে উঠল ঘরের মাঝখানের প্ল্যাটফর্মে। এক প্রান্ত থেকে শুরু করল। প্রতিটি ইকুইপমেন্টের ছবি তুলছে। দরদর করে ঘামছে গরমে। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্ম থেকে, খানিক ফাঁক করে দিল দরজার পাল্লা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল শীতল হাওয়া। করিডোর ধরে কেউ এলে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাবে। আবার রেডিয়োটাও কাজ করবে। রানা যোগাযোগ করতে পারে। দরজা খোলা রেখেই ফিরল সোহেল। একদিকের ইকুইপমেন্টের ছবি তোলা শেষ ওর। এবার থামল প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে।

ডানদিকে বিশাল এক কন্সোল। পিছনে চামড়া-মোড়া আরামদায়ক চেয়ার। বোধহয় সাইসমিক অ্যারের সিস্টেম অপারেটরের কন্ট্রোল স্টেশন। আয়েস করে চেয়ারে বসল সোহেল, চোখ রাখল জ্বলজ্বলে কালার ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটরে। স্ক্রিনের মাঝখানে জার্মান ভাষায় জ্বলছে একটা মেসেজ: টেস্ট রানিং। মোটামুটি জার্মান শিখেছে সোহেল এসপিওনাজ-এ এসে। কিছুদিন আগে শিখতে হয়েছে কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম। মাউস দিয়ে ক্লিক করল ও মেসেজ বক্সের ভিতর। এবোর্ট করে দিল প্রোগ্রামটা। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্‌ঘুটে এক ইমেজ ফুটে উঠল স্ক্রিনে।

এমনি সময়ে রানার কথা ভেসে এল। বাইরে জমজমাট পার্টির কথা শুনে বুঝল, এখন যে-কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যা খুশি। ওরা বিপদে পড়তে পারে। তাড়াতাড়ি কাজ সারার তাগিদ বোধ করল সোহেল। ফিরল কন্সোলের দিকে।

ঝকমক করছে মনিটরে থ্রি-ডিমেনশনাল সেডিমেন্টের লেয়ারগুলো। বাদামি থেকে শুরু করে সোনালী রঙের। এক দিকের স্কেল দেখিয়ে চলেছে পাঁচ শ মিটার। আন্দাজ করল সোহেল, এটা ল্যাবের নীচের সেডিমেন্টের স্ট্রেটিগ্রাফিক ইমেজ। টেবিলের উপর ট্র্যাকবল মাউস, ঝুঁকে বসল ও, কাছে নিয়ে এল ওটা। স্ক্রিনে নড়ে গেল কার্সার। জোরালো টিক-টিক আওয়াজ শুরু হলো। শব্দ আসছে কয়েক ফুট দূরের ট্র্যান্সডিউসার থেকে। মনিটরের ছবি বদলে যেতেই দেখা গেল নতুন আরেক সাবটেরেনিয়ান ইমেজ। পাশের স্কেল খেয়াল করল সোহেল। ওখানে দেখিয়ে চলেছে পাঁচ শ' পঞ্চাশ মিটার।

সন্দেহ কী, ফ্রেডারিখ ফন বোমার তাঁর সাইসমিক ইমেজিং সিস্টেম নিখুঁত করে গেছেন। মাউস সামনে-পিছনে নিল সোহেল, বারবার দেখা গেল শত গজ নীচের সেডিমেন্টারি লেয়ার, ঝকঝকে পরিষ্কার! ওর পাশেই ইলেকট্রিক মোটর টিকটিক আওয়াজে সরিয়ে নিয়ে চলেছে অ্যাকুস্টিক অ্যারে। প্রতিবার নতুন অ্যাঙ্গেলে তাক করছে ওটা। সোহেলের মনে হলো ছোট্ট কোনও ছেলে ও, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কম্পিউটার গেম নিয়ে। মাটির নীচে কোথায় সেসব মণি-মাণিক্য?

আরেকটু হলে শুনতেই পেত না রেডিয়োর টিট-টিট শব্দ। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, ছুটে গেল খোলা দরজার কাছে। দেরি না করে সাড়া দিল রেডিয়োতে। একবার মাথা বের করে

করিডোর দেখল। কেউ নেই। কিন্তু জবাব নেই রেডিয়ো থেকে। কী ব্যাপার? কী করছে রানা?

দ্রুত পায়ে প্ল্যাটফর্মের কাছে ফিরল সোহেল, ছবি তুলতে শুরু করল সাইসমিক অ্যারে ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টের। কাজটা শেষ করেই পরে নিল জ্যাকেট। রওনা হবে ফিরতি পথে, ঠিক তখনই চোখে পড়ল কন্সোলের উপর। একপাশে কিছু ডকুমেন্ট ও কাগজ। একটা দেখে মনে হলো ওটা অপারেটরের ম্যানুয়াল। ছোট্ট স্টেইনলেস স্টিলের ক্লিপবোর্ডের সঙ্গে আটকানো। সামনের দু'তিন পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। গতবার এসে কাজটা করেছে রানা। ম্যানুয়াল সহ ক্লিপবোর্ডটা জ্যাকেটের বুক পকেটে ভরে নিল সোহেল, দ্রুত পায়ে রওনা হলো দরজার দিকে। ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক তখনই রেডিয়োতে শোনা গেল কর্কশ এক পুরুষ কণ্ঠ।

ধক্ করে উঠল সোহেলের হৃৎপিণ্ড। ওই কণ্ঠস্বর রানার না! তার মানে, ধরা পড়েছে ওরা!

ছাব্বিশ

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, ডানহাতে ঝুলছে .৪৫ কোল্ট। চায় না ভুল করে কেউ গুলি করুক। বলোমাকে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ববি, কানের ফুটোর উপর ঠেসে ধরল ম্যাকারভ।

ভাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল মেয়েটাকে। ছটফট করে উঠল বলোর্মা, মুক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু তার কব্জি বামহাতে শক্ত করে ধরল ববি।

'ছেড়ে দে, শুয়োর কোথাকার!' হিসহিস করল বলোর্মা। 'এবার তোরা মরা লাশ!'

মৃদু হেসে ফেলল ববি, পরক্ষণে কব্জি ছেড়ে খপ করে ধরল এক মুঠো এলো চুল। বাধ্য হয়ে আকাশ দেখল বলোর্মা। কানের ফুটোর ভিতর গুঁতো দিল ম্যাকারভের নল। আর ছুটতে চাইল না সে, মুখ বিকৃত করল ব্যথায়।

সবার চোখ বলোর্মার উপর। আস্তে করে কোল্ট উপরে তুলল রানা, ফোর-সাইট চেয়ে রইল জালাইর তেমুজিনের হৃৎপিণ্ড বরাবর। সহজ ভঙ্গিতে বেল্টের উপর বামহাত ঘষল রানা। চালু হলো রেডিয়োর ট্র্যান্সমিশন বাটন। সোহেল বুঝবে এদিকে কী ঘটছে।

বোনের কষ্ট দেখে অন্যমনস্ক হলো জালাইর তেমুজিন। রানা ও ববির দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পরক্ষণে মনে পড়ল, এ লোকদুটো চিনা ডেলিগেশনের সেই দু'জন। 'অ্যাই, তোমরা! এখনও মরোনি?' কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'ট্রেসপাসিং? এদের সঙ্গে মরতে এসেছ!' মাথা কাত করে গ্রেসি ও উইলসনকে দেখাল।

তারা দু'জন বুদ্ধি করে বলোর্মার পিছনে সরে গেছে।

'তুমি তেল-খনি পাওয়ার জন্য খ্যাপা কুকুর হয়ে বহু মানুষকে খুন করেছ,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'এবার তুমি তো মরবেই, তোমার ভূমিকম্পও বন্ধ হবে।'

'তা-ই?' বলল লোকটা।

'আমরা বন্ধুদের নিতে এসেছি,' বলল রানা। 'সঙ্গে চেঙ্গিস খানকেও নেব।'

ভূমিকম্পের কথা বলেছে রানা, কোনও ছাপ পড়েনি জালাইর তেমুজিনের মুখে কিন্তু চেঙ্গিস খানের কথা শুনে শিউরে উঠল সে। সরু হলো চোখদুটো। বিটের মত লাল হয়ে উঠল চেহারা। হাতের ইশারা করে গার্ডদের দেখাল। 'তার আগেই মরবে তোমরা।'

'হয়তো। তবে বোন সহ মরবে তুমিও।'

এত সাহস কোথেকে পায় এ লোক? যা খুশি বলছে! জানের ভয় নেই? কড়া চোখে রানার দিকে চাইল জালাইর। ইস্পাতের মত কালো চোখ থেকে ঝরছে লোকটার দুঃসাহস! জালাইর তেমুজিনের আদর্শ চেঙ্গিস খান, সে নিজেও সেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মত কিছুই পরোয়া করে না। তার মন বলছে, এ লোকের কোনও দুর্বলতা থাকতে বাধ্য। এমন কিছু, যেটা সুবিধা দেবে তাকে।

'আমার গার্ডরা গুলি করে ঝাঁঝরা করবে তোমাদের,' হুমকির সুরে বলল সে। 'তবে আমি চাই না আমার বোন মারা যাক। ওকে ছেড়ে দাও। তোমার বন্ধুদের ছেড়ে দেব। যেখানে খুশি যাক।'

'না,' কড়া আপত্তি তুলল গ্রেসি। ববির পাশে চলে গেছে। 'ছেড়ে দিলে সবাইকে ছাড়তে হবে।' ফিসফিস করে ববিকে বলল, 'তোমাদের রেখে যাব না। এমনিতেই খুন করবে ও আমাদের। বাঁচলে একসঙ্গে, নইলে নয়।'

'কোনও দাবি করবে সেই জোর তোমাদের নেই,' ধমকে উঠল জালাইর। পায়চারি শুরু করেছে সে। রানা খেয়াল করল

লোকটা ফিল্ড অফ ফায়ার থেকে সরতে চাইছে। রানার কোল্টের নল অনুসরণ করছে লোকটাকে। কিন্তু চট্ করে এক প্রহরীর আড়ালে সরে গেল জালাইর।

ঠিক তখনই মনে হলো প্রকাণ্ড কেতলির ভিতর পড়ল ভয়াবহ বাজ, থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ নয়! গোটা কম্পাউণ্ড কাঁপতে লাগল। ল্যাবোরেটরির দিক থেকে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। থমকে গেল সবাই। বিশ সেকেণ্ড পর শুরু হলো দ্বিতীয় বিস্ফোরণ।

কী ঘটছে বুঝেছে বলোর্মা। ভয়ে কাঁপছে। ভাইয়ের দিকে চেয়ে বেসুরো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যারে! কেউ অ্যাক্টিভেট করেছে!' কানফাটা আওয়াজে হারিয়ে গেল তার কণ্ঠ।

তৃতীয়বারের মত ঘটল বিকট বিস্ফোরণ।

স্যাণ্ডহার্স্ট আর্মি অ্যাকাডেমি থেকে রানার সঙ্গে একই বছর ট্রেইনিং নিয়েছে সোহেল আহমেদ। একই সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইণ্টেলিজেন্স সার্ভিসে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত একটা হাত কাটা না পড়লে আজও থাকত সে অ্যাকটিভ এসপিওনাজে। চাপের মুখে মাথা গরম করে না সে। প্রথম কাজ ফোটোগ্রাফ নিয়ে কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তা-ই করবে যে-কোনও স্পাই। প্রমাণ পেলে কাজে নামবে মঙ্গোলিয়ান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কখনও কখনও ভুলে যেতে হয় ট্রেইনিং। আবেগ-প্রবণ বাঙালি বলেই হয়তো এমনটা হয়। বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যাবে, তা-ই কী সাংঘাতিক দ্রুত চলছে ওর মস্তিষ্ক। অস্ত্র বলতে একটা ক্রোবার। এ নিয়ে লড়তে চাইলে মরবে। হঠাৎ ওর মনে হলো, কেমন হয়, যদি জালাইর তেমুজিনের বিরুদ্ধে

কাজে লাগানো হয় তারই নিজের দানবকে?

অ্যানেকোয়েক চেম্বারে আবারও ঢুকে পড়ল সোহেল, দরজা বন্ধ করেই ছুটল কন্সোলের দিকে। ধপ করে বসল চেয়ারে, স্ক্রিনে চোখ রেখেই ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। সিস্টেম অন রেখে গেছে। ট্র্যাকবল মাউস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সোহেল। একটু আগে যে ইমেজ দেখেছে, স্ক্রল করে সেটা খুঁজছে। কমাণ্ড অনুযায়ী টিক-টিক আওয়াজে সরছে ট্রাইপড। কার্সার নেড়ে চলেছে সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর নির্দিষ্ট স্ট্রাটাম খুঁজে পেল। ওখানে সেডিমেন্টের দুটো স্তর হঠাৎ উঁচু হয়েছে। দুটোর মধ্যে রয়েছে ফারাক। পাথরের মাঝখানে নয়টি গোলাকার ফাটল। ওগুলো সত্যিই ফল্ট কি না, কে জানে! বলা যায় না, হয়তো এ মুহূর্তে যথেষ্ট প্রেশার নেই ওখানে। হয়তো কাজে লাগবে না অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারে। ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। হাতে নতুন কোনও তাস নেই যখন।

কার্সার নামিয়ে নিয়ে গেল সোহেল সেডিমেণ্টারি কাট পর্যন্ত, তারপর ক্লিক করল বাটনে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো নীল রঙের ক্রসহেয়ার, জ্বলছে দপদপ করে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পেয়ে নড়ছে ট্রাইপড। কার্সার বুলিয়ে স্ক্রিনের উপর দিকে হাজির হলো সোহেল, স্ক্রল করতেই উপর থেকে নেমে এল কয়েকটা মেন্যু। কপাল বেয়ে চোখে পড়ল ঘাম, চোখ ডলল সোহেল, খুঁজছে জরুরি কমাণ্ড। সব জার্মান ভাষায় লেখা। এসব সফটওয়্যার তৈরি করেছেন ফ্রেডারিখ ফন বোমার ও তাঁর টিম। ল্যারি কি যেন বলেছিল, মনে করতে চাইল সোহেল। হ্যাঁ। ইমেজ পাওয়ার জন্য কনসেনস্ট্রেটেড হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ ব্যবহার করেন বোমার। মেন্যু থেকে হাইয়েস্ট-ফ্রিকোয়েন্সি সেটিং বেছে

নিল সোহেল। ওখানে সবচেয়ে কম থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পাওয়ার লেভেল রয়েছে। হাইয়েস্ট-এ ক্লিক করল ও, সিলেক্ট করল রিপিটেটিভ সাইকেল। বিশ সেকেণ্ড পর পর চলবে। স্ক্রিনে ফুটে উঠল লাল বক্স। বোল্ড অক্ষরে লেখা: অ্যাক্টিভিয়েরেন। আল্লা-মাবুদ জানে কী হবে, বিড়বিড় করে বলল সোহেল, পরক্ষণে ক্লিক করল বাটনে।

প্রথমে কিছুই ঘটল না। তারপর সফটওয়্যারের দীর্ঘ এক স্ক্রিপ্ট নামতে লাগল স্ক্রিন বেয়ে। থামছে না। অনেক কথা ওটার পেটে। ক্ষুধার্ত কাকের মত চেয়ে রইল সোহেল। কিছু তো হোক! দীর্ঘ পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর একই সঙ্গে জেগে উঠল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারগুলো, ব্যস্ত হয়ে উঠল কম্পিউটারগুলো। নিচু গুনগুন আওয়াজে ভরে উঠল ঘর! কপাল ও চোখ থেকে ঘাম মুছল সোহেল। ওর মনে হলো এক পলকে ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে দশ ডিগ্রি। খেয়াল করল টিক-টিক করে আবারও নড়ছে ট্রাইপড। আওয়াজটা বেড়ে গেছে অনেক। মুহূর্তের জন্য নিভল বৈদ্যুতিক বাতিগুলো। মেঝের দিকে তাক হলো ট্রাইপডের মুখ, শুরু হলো চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। সোহেলের মনে হলো কানের কাছে বাজ পড়ছে। গোটা দালান থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে ডিসচার্জ হলো অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট। চেয়ার ছেড়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল সোহেল। কান দুটো ঝনঝন করছে তীব্র আওয়াজে। টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে। একবার চাইল চারপাশে। তিক্ত হয়ে গেল মন। কিছুই তো হলো না! ফল্ট নড়ল কই?

সব হজম করে নিয়েছে এই শব্দ নিরোধক ঘর! সবচেয়ে ঘন সাউণ্ড ওয়েভ দিয়েও কিছু করতে পারল না অ্যাকুস্টিক অ্যারে!

সিস্টেম চালু করলেই চলবে না! ওয়েভ যেখানে পৌঁছে দিতে হবে, সে জায়গাই তো বন্ধ! মাটির ভিতর ঢুকতে দিতে হবে ওয়েভ! এটা তো অ্যানেকোয়েক চেম্বার? তোর বারোটা বাজিয়ে দেব!

ক্যাটওয়াক থেকে ফোমের মেঝের উপর লাফিয়ে নামল সোহেল, দৌড়ে হাজির হলো ট্রাইপডের সামনে। পরক্ষণে দু'হাতে ঢাকল কান। যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হবে দ্বিতীয় ব্লাস্ট। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ডিসচার্জ করল ট্র্যান্সডিউসার টিউবগুলো। প্রচণ্ড আওয়াজে বধির হয়ে গেল সোহেল। শুধু ভনভন করছে কানের ভিতর! জানে না কখন হাঁটুমুড়ে বসেছে। তারই ফাঁকে মন বলছে, যা করবার এখনই করো! চার হাত-পায়ে চলে গেল সোহেল ট্রাইপডের নীচে। পাগল হয়ে উঠল, দু'হাতে ছিঁড়তে চাইল ফোমের মেঝে। মুখে জোরে জোরে গুনছে এক থেকে। বিশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে তৃতীয় বিস্ফোরণ!

ভাগ্য সাহায্য করছে সোহেলকে। মেঝের সঙ্গে সেঁটে দেয়া হয়নি ফোমের প্যানেল। চৌকো একটা অংশ একটানে তুলে নিল, ছুঁড়ে ফেলে দিল। নীচের মেঝে টাইল দেয়া, কিন্তু সাধারণ নয়—রুপালি সীসা দিয়ে তৈরি টাইল। নীচে যেতে পারছে না শব্দ। নয় সেকেণ্ড পর্যন্ত গুনেছে সোহেল, পরক্ষণে ছুটল কন্সোলের দিকে। টেবিল থেকে একটানে তুলে নিল ক্রোবার, কয়েক পা সরে নামিয়ে আনল টাইলের উপর। ঘা দিতেই মেঝে থেকে উঠে এল ভারী টাইল। ছুঁড়ে ফেলল ওটা। আঠারো সেকেণ্ড পর্যন্ত পাত্তা দিল না সোহেল। ততক্ষণে টাইল তুলেছে আরও তিনটে। সাইসমিক অ্যারের ঠিক নীচে ফাঁকা হয়েছে এক বর্গফুট জায়গা।

পরের সেকেণ্ডে এক লাফে সরে গেল সোহেল, হাতের তালু দিয়ে ঢাকল কান। দুই পা সরবার আগেই শুরু হলো তৃতীয় অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট! টাইলসের নীচে শুধু কংক্রিটের পাতলা মেঝে। তার নীচে সাধারণ ভিত্তি।

প্রচণ্ড আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই নিজের মনে বলল সোহেল, 'আর কিছু করার নেই।' দ্রুতপায়ে চলল দরজার দিকে। একটানে খুলে ফেলল কবাট। ভেবেছিল অপেক্ষা করবে সশস্ত্র গার্ড। কিন্তু কেউ নেই। গেছে সব ওই প্রাসাদে। করিডোরে বেরিয়ে এল সোহেল। গার্ড নেই বটে, কিন্তু করিডোরের আরেক প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে পায়জামা ও স্লিপার পরা বিজ্ঞানীরা। সোহেলকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, পরক্ষণে হই-হই করে তেড়ে এল!

উল্টো তেড়ে গেল সোহেল। ভাবটা এমন, একাই দশজনকে কাত করে দেবে। কিন্তু পরের দরজাটা পেয়েই ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। দরজা আটকে দিয়ে চারপাশ দেখল। অন্য ল্যাবগুলোর মতই এটাও। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। মাঝখানে ধূসর-রঙা একটা ডেস্ক। একদিকের দেয়ালে লম্বা ল্যাব টেবিল। তার উপর অজস্র ইলেকট্রনিক্স্। অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগবে না কিছুই। কিন্তু তাতে কী? সোহেলের চোখ আটকে গেল মাঝারি জানালার উপর। কম্পাউণ্ডের পিছন দিক দেখা যায় ওটা দিয়ে। গ্রিল নেই। জানালার সামনে চলে গেল সোহেল। মনে মনে বলল, 'লক্ষ্মী ববি, তুমি সবসময় সঙ্গে রেখো ক্রোবার।' পরক্ষণে শক্ত করে ধরল ক্রোবারের হাতল, ভারী মাথাটা নামিয়ে আনল কাঁচের একদিকে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সব। চোখা কাঁচগুলো ক্রোবার দিয়ে সরিয়ে দিল সোহেল, পরক্ষণে ডাইভ

দিল। উড়ন্ত চামচিকের মত সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। মাটিতে পড়বার আগেই শুরু হলো অ্যাকুস্টিক অ্যারের চতুর্থ ও শেষ ব্লাস্ট। মাটিতে পড়ে অবাক হলো সোহেল। আওয়াজ আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়েছে! ধুশ্-শালা!

ল্যাবের ভিতর থেকে হৈ-চৈয়ের আওয়াজ এল। কাঁচ ভাঙা ল্যাবে ঢোকেনি বিজ্ঞানীরা ; যা খুশি করগে, যা—লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল, পরক্ষণে ঝেড়ে দৌড় দিল আঁধার রাতে। মন ভাল নেই, লোকগুলো ডি-অ্যাকটিভেট করবে ওর অস্ত্র। আর কোনও ব্লাস্ট হবে না। খেল্ খতম, পয়সা হজম! রানাকে উদ্ধার করতে চাইলে অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে!

সাতাশ

দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজ কমে আসতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল জালাইর তেমুজিন। নির্দেশ দিল তার দুই ঘোড়সওয়ার প্রহরীকে। ছুটল তারা ল্যাবোরেটরির দিকে। দেখতে দেখতে আঁধারে মিলিয়ে গেল। তখনও চাপা গর্জন শেষ হয়নি। তৃতীয়বারের মত আবারও শুরু হলো গম্ভীর আওয়াজ। ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি হারিয়ে গেল মুহূর্তে। চাপা পড়ল দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজও।

'সঙ্গে আরও বন্ধু?' গর্জে উঠল জালাইর। উপরের ঠোঁট সরে

যাওয়ায় মনে হলো খ্যাপা কোনও কুকুর সে।

'চমক আরও আছে,' বলল রানা।

'আরও লোকজন? সবকটা খুন হয়ে যাবে।'

ল্যাবোরেটরির দিক থেকে এল কাঁচ ভাঙবার ঝনঝন আওয়াজ। প্রায় একইসঙ্গে শুরু হলো অ্যাকুস্টিক সাইসমিক অ্যারের চতুর্থ বিস্ফোরণ! তারপর চারপাশে নামল নীরবতা।

'আমার গার্ডরা তোমার বন্ধুদের শেষ করবে,' নিষ্ঠুর হাসল জালাইর তেমুজিন।

টিটকারির হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি, তার আগেই এল বজ্রপাতের মত গুড়গুড় আওয়াজ। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরছে প্রতিধ্বনি। বহু দূরে বজ্রপাত, কিন্তু থামছে না গর্জন—উল্টো বেড়েই চলেছে! প্রবল ভূমিধসে যে ধরনের আওয়াজ হয়, ঠিক তেমন! কম্পাউণ্ডের বাইরে থেকে হাউ-উ-উ-উ করে উঠল একপাল নেকড়ে, করুণ সুরে ডাকছে। ডেকে উঠল কম্পাউণ্ডের সমস্ত ঘোড়া, নাক ঝাড়ছে। হয়তো সঙ্কেত পেয়েছে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের। এসব ঘটে যাওয়ার পরে বোঝে মানুষ।

সোহেলের তিন কনডেন্স্‌ড্‌ সাউণ্ড ওয়েভ প্রচণ্ড সংকট সৃষ্টি করেছে সমতল থেকে এক হাজার মিটার নীচে। ওই সেডিমেণ্টারি কাট সত্যিই প্রাচীন যুগের কোনও ফল্ট। সাইসমিক অ্যারের প্রথম দুটো ব্লাস্ট হজম করেছে অ্যানেকোয়েক চেম্বার, শুধু মৃদু টোকা পড়েছে ফল্টের উপর। কিন্তু তৃতীয় ব্লাস্ট তৈরি করল প্রচণ্ড শক ওয়েভ। সেডিমেণ্ট স্থির রইল, তবে সাইসমিক ওয়েভ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল ফল্ট লাইনকে। চতুর্থ ব্লাস্ট আসতেই ফেটে চুরচুর হলো ফল্ট। ঠিক উটের পিঠ ফেটে যাওয়ার মতই!

যে-কোনও ফল্ট লাইন ফাটলওয়ালা পাথর-স্তর, সহজেই নড়ে। ফল্ট লাইন থেকে শক্তি নিঃসরণ হলে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফল্টের নির্দিষ্ট কোনও অংশে চাপ সৃষ্টি হলে নড়ে পাথর-স্তর, বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড শক্তি। অন্য কোথাও সরে না গেলে উঠে আসে সমতলে। তৈরি হয় বহু মাত্রার ভূমিকম্প।

এ পাহাড়ি এলাকার নীচে যে ফল্ট, তার উপর চতুর্থবারের মত আঘাত হেনেছে অ্যাকুস্টিক ওয়েভ। ফলাফল ভয়াবহ। মাটির নীচে টর্পেডোর মত আঘাত করেছে সাউণ্ড ওয়েভ। সাইসমিক ভাইব্রেশন নড়িয়ে দিয়েছে ফাটল, ছড়িয়ে পড়েছে প্রচণ্ড শক্তি, ছুটেছে চারদিকে। সিকি মাইল নীচের ফল্টের ভিতর তৈরি হয়েছে খোঁড়ল। ছোট্ট ফাটল, নড়েছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কিন্তু সেটাই কাঁপিয়ে দিল চারদিক।

প্রচণ্ড শক ওয়েভ তৈরি হলো মাটির উপর। রিখটার স্কেল পরিমাপে যে ভূমিকম্প শুরু হলো, তার ম্যাগনিচুড সাত দশমিক পাঁচ মাত্রার। তবে রিখটার স্কেল সবসময় সঠিক ভূমিকম্প নির্ণয় করে না। যারা মাটির উপর দাঁড়িয়ে রইল, তাদের মনে হলো শুরু হয়েছে কেয়ামত।

সবার সঙ্গে শুনছে রানা, চারপাশ থেকে শুরু হয়েছে নিচু গর্জন। দেখতে দেখতে বাড়তে লাগল আওয়াজ। মনে হলো মাটির নীচ দিয়ে গুড়গুড় শব্দে ছুটছে মালগাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড পর সমতলে পৌঁছুল ভূ-কম্পন। পায়ের নীচে থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি। সামনে-পিছনে দুলছে জমিন। মনে হলো নানাদিকে ছুটছে পৃথিবী। ক্রমশ আরও জোরে নড়তে লাগল জমিন।

ভূমিকম্প শুরু হওয়ায় রানার দিকে কড়া চোখে চাইল

গার্ডরা। কিন্তু তা ক' মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণে ধুপ-ধাপ মাটির উপর পড়ল বেশিরভাগ লোক। এক প্রহরী বারান্দার সিঁড়ির ধাপে পিছলে পড়েছে, খেয়াল করেছে রানা। তার সাব-মেশিনগান পড়েছে দেড় ফুট দূরে। দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেনি রানা, বদলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাটির উপর। দেরি না করেই কোল্ট সহ ডানহাত বাড়িয়ে দিল সামনে। হালকা ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্র বাড়তি সুবিধা এনে দিল ওকে। কাছের লোকটা এখনও দাঁড়াতে চাইছে। তার বুকে পিস্তল তাক করল রানা, টিপে দিল ট্রিগার। থরথর কাঁপছে জমিন, কিন্তু ভুল হলো না লক্ষ্যভেদে। উল্টে পড়ে গেল গার্ড। দ্বিতীয়জনের দিকে তাক করল রানা। বসে পড়েছে সে লোক, সামলে নিতে চাইছে। তারই ফাঁকে ঘুরিয়ে নিল একে-৭৪। পরপর তিনবার তার বুকে গুলি করল রানা। লাগল দুবার। কাত হয়ে পড়ে গেল গার্ড, কিন্তু তর্জনী পেঁচিয়ে গেছে ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল এক পশলা গুলি। রানার বামদিকের জমিতে বিঁধল বুলেট।

বসেই চরকির মত ঘুরল রানা, পিস্তল তাক করল প্রথম প্রহরীর দিকে। এই লোকই পিছলে পড়েছে জালাইরের সামনে। ওদিকে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে তেমুজিন, সিঁড়ি বেয়ে ছুটছে দরজার দিকে। নিশানা পাল্টে গুলি করল রানা জালাইয়ের মাথা লক্ষ্য করে। কবাটে গিয়ে লাগল বুলেট, পরক্ষণে দরজা গলে ভিতরে হারিয়ে গেল লোকটা। তার পিছু নিল প্রহরী, চলে গেল চৌকাঠে। গুলি করল রানা। পিছন থেকে গুলি করল অন্য কেউ। ববি। বলোর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে-ও। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে ভূমিকম্প, প্রচণ্ড দুলছে চারপাশ। রানা-ববি দুজনেই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ। টলতে টলতে দরজার ফাঁকে

ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রহরী। পরের সেকেণ্ডে আর দেখা গেল না তাকে

দক্ষিণের প্রহরীরা এখনও বিপদের কারণ হয়ে ওঠেনি। চারপাশে নাক ঝাড়ছে ঘোড়াগুলো, জানে না কেন পায়ের নীচে নড়ছে মাটি। ভীষণ ভয়ে পিছনের দু' পায়ে পিছাতে চাইল তিনটে ঘোড়া। প্রাণভয়ে গলা ধরে ঝুলছে ওগুলোর আরোহীরা। চতুর্থ ঘোড়াটা ঘুরেই ছুটল আস্তাবলের দিকে। মৃত প্রহরীদের মাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

প্রায় পুরো এক মিনিট চলল প্রবল ভূমিকম্প। বারবার সবাইকে আকাশে ছুঁড়তে চাইল জমিন। জালাইর তেমুজিনের প্রাসাদের ভিতর থেকে এল কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ। একে একে নিভছে বাতিগুলো। আঙিনার বাতিগুলোও নিভল। ল্যাবোরেটরি দালান থেকে হাহাকার করে চলেছে একাকী এক অ্যালার্ম ঘণ্টি।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল ভূমিকম্প। কয়েক সেকেণ্ড পর থামল গুড়গুড় আওয়াজ। থমথম করতে লাগল চারপাশ। ভৌতিক আবহ। পোর্টিকোর বাতিগুলো আগেই নিভেছে। রানা-ববি সবাই হারিয়ে গেছে আঁধারে। মাটিতে চুপচাপ শুয়ে রইল রানা, জানে শেষ হয়নি গোলাগুলি।

চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় সঙ্গীদের দিকে চাইল। গ্রেসি ও উইলসন সম্পূর্ণ সুস্থ, তবে বাম পায়ে গুলি লেগেছে ববির। রক্তের কালো রেখা নামছে উরু বেয়ে। ব্যাপারটা পাত্তা দিতে চাইল না ববি, চাপা স্বরে বলল, 'তেমন কিছু না, রানা। বুলেট ছিটকে লেগেছে, হাড়ে লাগেনি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ঘোড়সওয়ারীদের দিকে চাইল। ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত তারা। 'জলদি!' নির্দেশ দিল রানা। 'পোর্টিকোর কলামগুলোর পিছনে চলো।' ওর কথা শেষ হতে না

হতেই রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়ল এক অশ্বারোহী।

পাল্টা গুলি করল রানা। কাভারিং ফায়ার দিল সঙ্গীদের।

একটু খুঁড়িয়ে রওনা হলো ববি কলামের দিকে। সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে বলোর্মাকে। প্রায় উবু হয়ে ছুটল গ্রেসি ও উইলসন, চলে গেল একটা কলামের আড়ালে। বলোর্মাকে নিয়ে পাশের কলামের পিছনে থেমেছে ববি। সবাই সরে যেতেই আঁধারে দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল রানা, পরক্ষণে ছুটল তৃতীয় এক কলামের দিকে। নিরাপদে পৌঁছে গেল ওটার পিছনে। আপাতত বাগান বা বাড়ি থেকে ছোঁড়া গুলি গায়ে লাগবে না।

ঘোড়া সামলে নিয়েছে গার্ডরা। এখনও মোটমাট পাঁচজন লোক তারা। ইচ্ছা করলেই কলাম লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে। কিন্তু তাদের শক্ররা লুকিয়ে পড়েছে। এদিকে নিজেরা তারা রয়েছে খোলা জমিতে। হঠাৎ কলাম ঘুরে বেরিয়ে গেল ববি, দ্রুত দু'বার গুলি করল কাছের ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে। পরক্ষণে ফিরল কলামের আড়ালে। যাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে, তার ডান হাঁটুর বাটি গুঁড়িয়ে গেছে। রাইফেল ফেলে এক হাতে পা ধরল সে, রাশ টেনে ঘোড়া নিয়ে সরে গেল পাশের এক ঝোপে।

রানার উদ্দেশে বলল ববি, 'ওরা আবার আসবে। এক ডলার বাজি। ঘোড়া থেকে নামছে এখন।'

'হ্যাঁ, ঘিরতে চাইবে,' সায় দিল রানা। রেডিয়োর কথা মনে পড়ল। সোহেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বেল্ট হাতড়ে দেখল, রেডিয়ো নেই! ভূমিকম্পের সময় পড়ে গেছে। 'সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না,' ববিকে বলল।

'খুব বেশি ক্ষতিও নেই,' বলল ববি। 'ওই বা কী করবে। আমার কাছে মাত্র পাঁচটা বুলেট।'

রানার কোল্টে সাতটা বুলেট। উইলসন ও ববি দুজনেই খোঁড়াচ্ছে। চাইলেও দ্রুত সরতে পারবে না ওরা। গার্ডরা নিশ্চয়ই পোর্টিকো ঘিরে আসছে। তিনদিক থেকে হামলে পড়বে। একবার খোলা দরজার দিকে চাইল রানা। পরক্ষণে ববির দিকে চাইল। একমাত্র উপায় বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়া। আত্মরক্ষা করতে হবে।

ববি ভাবছে, বাড়ির ভিতর রয়েছে জালাইর তেমুজিন। সঙ্গে ওই প্রহরী। প্রহরী যদি গুলি খেয়ে থাকে, রইল শুধু জালাইর।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, সবাইকে নিয়ে দৌড়ে ঢুকবে বাড়ির ভিতর। নির্দেশ দিতে হাঁ করল, কিন্তু তার আগেই কালো একটা ছায়া সরে যেতে দেখল দরজা থেকে। পিছনের আবছা আলোয় সরেছে লোকটা। কবাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাইফেলের মাযল। ঠিক তখনই গোলাপ ঝাড়ের এক পাশ থেকে সরসর করে এগোল কেউ! বুঝল রানা, দেরি হয়ে গেছে। ওরা ইঁদুর-কলের ফাঁদে পড়েছে। ফস্কে যাওয়া অসম্ভব! যথেষ্ট বুলেট নেই, লোকবল নেই, লুকাবার সুযোগও থাকল না! তিক্ত হাসল রানা। ববিকে পাশে নিয়ে শেষবারের মত লড়বে ও!

ঠিক তখনই আবার ভারী গম্ভীর আওয়াজ এল পাহাড় থেকে। ভূমিকম্পের গুড়গুড় শব্দের মতই, তবে কোথায় যেন ফারাক! যেন গর্জে উঠেছে উত্তাল সাগর!

নতুন করে শুরু হলো অচিন্ত্যনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ!

নিয়ে এল ধ্বংস ও মৃত্যু!

আটাশ

কান পেতে শুনছে রানা, পাহাড়ে চলছে গুমগুম আওয়াজ, মাটির নীচ থেকে নয়! বজ্রপাতের মত, কিন্তু থামছে না! প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে! গুমগুম বদলে গিয়ে শুরু হলো শোঁও-শোঁও আওয়াজ! পাহাড়ি খরস্রোতা নদীর বানের মত! গেটের কাছে ক্ষীণ দুটো আর্তনাদ হলো। সবাই চেয়ে রইল মেইন গেটের দিকে। ওদিকে কী যেন ঘটছে! যেন বারোটা সেভেন-ফোর-সেভেন জাম্বো জেট একইসঙ্গে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে!

হঠাৎ উল্টে পড়ল প্রকাণ্ড গেট। মুহূর্তে হারিয়ে গেল ওটা। ধসে পড়ল দু' পাশের দেয়াল। ছুটে এল বারো ফুট উঁচু পানির ভয়াবহ এক প্রাচীর!

সিকি মাইল উজানে গভীর খাদ তৈরি করেছে ভূমিকম্প, বদলে দিয়েছে নদীর গতিপথ। ওদিকের ক্যানিয়ন ভরে উঠতেই সরতে চেয়েছে বিপুল জলরাশি, কিন্তু সামনের পথ পাহাড়-ধসে বন্ধ! মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে ছুটেছে নদী। সহজ পথ ধরে নেমেছে খালে। তার পরেই সামনে জালাইরের কম্পাউণ্ড!

গভীর খাদ টই-টম্বুর ভরে সড়কের পাশে ছুটেছে নদী। খালের বামদিকের সব ভাসিয়ে নিয়েছে! একদিকে বাঁধ তৈরি করেছে শুধু ওই উঁচু রাস্তা। পাহাড় ধসে পড়ায় এগুনোর পথ নেই নদীর। ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কম্পাউণ্ডের প্রাচীরের উপর। পানির

উচ্চতা দ্রুত বেড়েছে, তারপর গেট নিয়ে ধসে পড়েছে চুন-সুরকি-পাথরের দেয়াল। মুহূর্তে কম্পাউণ্ড ডুবিয়ে এগিয়ে এল পাহাড়ি বান! দেয়ালের বাধা সরতেই জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা নামল ছ' ফুটে। বরফ-ঠাণ্ডা পানির প্রাচীর এখুনি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রাসাদের উপর!

আগেই জানে রানা, দৌড়ে লাভ নেই। অতি দ্রুত আসছে জলোচ্ছ্বাস! উইলসন ও ববি সুস্থ থাকলেও পালাতে পারত না। বাঁচবার একটাই মাত্র উপায়! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'সবাই পিলার জড়িয়ে ধরুন!'

গোল কলামগুলো খাঁজ কাটা, ধরে রেখেছে পোর্টিকোকে। আগে নড়ে উঠল গ্রেসি ও উইলসন। পিলারকে মাঝখানে রেখে মুখোমুখি হলো ওরা, শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরে রাখল। ম্যাকারভ ছাড়ল না ববি, এক হাতে জড়িয়ে ধরল পিলার। চোখে ভয় নিয়ে ওকে দেখল বলোর্মা। পালাবে কোথায়? লোকটা সত্যিই গুলি করবে! জানের ভয়ে ববির কোমর জড়িয়ে ধরল সে। নিজের পিলারের গোড়ায় শুলো রানা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল পিলার। মাত্র একবার শ্বাস নিতে পারল, পরক্ষণে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশাল তরল প্রাচীর!

ডুবে যাওয়ার আগে কয়েকটা আর্তনাদ শুনল ওরা। ড্রাইভ-ওয়ে ঘিরতে এসে তীব্র বন্যায় ভেসে যাবে, বোঝেনি প্রহরীরা। প্রচণ্ড স্রোতের টানে পিছলে পড়েছে তারা, উন্মত্ত ঢেউ তাদের নিয়ে চলল প্রাসাদের দেয়ালে আছড়ে মারতে। ডুবে যাওয়ার আগে এক প্রহরীকে দেখল রানা, ডানদিকের পিলারে বাড়ি খেল লোকটা, পরক্ষণে থেমে গেল তার আর্তনাদ! কম্পাউণ্ড ডুবিয়ে দিল নদী, সামনে যা পেল ভাসিয়ে নিল।

উত্তর দিকে নিচু জমিন, প্রাসাদের চারপাশ দিয়ে সেদিকে চলেছে নদী। দক্ষিণে কম ডুবল ল্যাবোরেটরি ও গ্যারাজ। জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কায় থরথর করে কাঁপল প্রাসাদ। মাটির নীচ থেকে এল গম্ভীর গর্জন।

রানার ধারণা ভুল হয়নি, প্রথম আঘাত সামলে নিল মার্বেলের পিলার। পা দুটো গ্যাস বেলুনের মত ভেসে উঠল ওর। প্রাসাদের ভিতর টেনে নিতে চাইল স্রোত। প্রাণপণে পিলার আঁকড়ে রইল ও। দেড় মিনিট পেরুনোর আগেই নামতে লাগল জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা। কিছুক্ষণ পর ভেসে যাওয়ার ভয় রইল না, কিন্তু বরফ-ঠাণ্ডা হিমেল স্রোত কাঁপিয়ে দিয়েছে ওদেরকে। জলোস্রোত এতই শীতল যে প্রচণ্ড ধাক্কার মত লাগল রানার কাছে, ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। মনে হলো প্রতি ইঞ্চি ত্বকে হাজারো তীক্ষ্ণ পিন ফুটছে! পিলার ধরে উঠে দাঁড়াল রানা। উরু ডুবিয়ে চলেছে হিম-স্রোত। মনে হচ্ছে নীচের অংশটুকু নেই। পাশের পিলারের দিকে চাইল, এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে ববি। এক হাতে টেনে তুলেছে বলোর্মাকে। কেশে চলেছে সে বেদম, সঙ্গে হিড়হিড়ে কাঁপুনি। এক সেকেণ্ড পর উঠল গ্রেসি ও উইলসন। শীতে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত লাগছে খটাখট।

প্রাসাদে ঢুকেছে পানির প্রাচীর, পথ খুঁজে বেরিয়ে যাচ্ছে উত্তর দিক দিয়ে। এখন সিংহ-কবাট নেই। সেখানে থইথই করছে দু'ফুট গভীর পানি। পানির উচ্চতা আরও কমছে। নতুন পথ খুঁজে নিয়ে টিলা থেকে নামছে নদী। ওখানে বিশাল এক জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। অনেক দূরে করুণ চিৎকার শুনল ওরা। যেসব প্রহরী এখনও মারা যায়নি, তাদের ভাসিয়ে পাহাড় থেকে নীচে ফেলছে জলপ্রপাত! প্রচণ্ড জোরে ঝপাস্ আওয়াজ এল উত্তরদিক

থেকে! প্রাসাদের এক অংশ ধসে পড়ল পানির টানে।

ড্রাইভ-ওয়েের সামনে থেকে সরছে পানি। স্রোতের প্রচণ্ড টান আর নেই। ববির পিলারের দিকে পা বাড়িয়ে ডানদিকে চোখ পড়ল রানার, পানিতে ভাসছে আড়ষ্ট কিছু দেহ—হাবু-ডুবু খেয়ে চলেছে উত্তর দিকে। ববির পিলারের সামনে দাঁড়াল রানা। গ্রেসি হি-হি করে কাঁপছে। পাথরের মত শক্ত মানুষ ববি, সে-ও যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। এমনিতেই গুলি খেয়েছে উরুতে, তার উপর হিম-পানিতে ভিজেছে—শুরু হয়েছে বড় ধরনের শক। বরফ-পানি থেকে সরতে হবে, বুঝল রানা, নইলে এরপর ধরবে হাইপোথারমিয়া।

'চলুন সবাই, শুকনো জমিতে উঠতে হবে,' বলল রানা। হাতের ইশারায় ল্যাব দেখাল। ওদিকে রয়েছে খানিক উঁচু জমি। গ্রেসির হাত ধরে ওদিকে পা বাড়ালেন উইলসন। ববির পাশেই থাকল রানা, খেয়াল রেখেছে যেন পালাতে না পারে বলোর্মা। কোনও ঝামেলা করল না সে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর শীতের প্রকোপে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

নদীর ধারা কম্পাউণ্ডে এসে দু' ভাগে ভাগ হয়েছে। প্রধান এক অংশ মেইন গেট ও প্রাসাদের উত্তর দিক দিয়ে চলেছে। ওদিকে নড়বড়ে মার্বেলের দেয়াল খাবলে নিতে চাইছে স্রোত। দ্বিতীয় ধারা গেছে ল্যাবোরেটরির দিকে, তারপর বাঁক নিয়ে ফিরেছে আবার পোর্টিকোর দিকে। ওদিক দিয়ে প্রাসাদে ঢুকছে স্রোত। সব মিলে মনে হলো, যেন অথৈ সাগর ঘিরে ফেলেছে প্রাসাদকে।

পোর্টিকোর জলধারা ঘিরে রেখেছে রানাদের। সবাইকে নিয়ে দক্ষিণ-মুখো হলো রানা, বাগানের গভীর জায়গাগুলো পেরিয়ে যেতেই উচ্চতা কমল পানির। রাস্তার দিকে খানিক যাওয়ার পর

শুধু গোড়ালি সমান পানি থাকল। চারদিকে ছুটছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি। নানাদিক থেকে আসছে হৈ-চৈ, চিৎকার। ল্যাবোরেটরির ভিতর পানির স্রোত ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সায়েন্টিস্টরা। গ্যারাজের ভিতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল। পরক্ষণে গর্জে উঠল একটা ইঞ্জিন। গ্যারাজের বাইরে হাউমাউ করছে অনেকে। ভূমিকম্পের সময় আস্তাবল থেকে ছুটে গেছে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো, এদিক-ওদিক ছুটছে। চাপা পড়বার ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে লোকজন।

হঠাৎ পাশেই হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল গ্রেসি, থমকে গেল রানা। উইলসনকে সঙ্গে নিয়ে তুলে ধরল গ্রেসিকে।

'জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে,' ফিসফিস করে বলল উইলসন।

গ্রেসির দিকে চাইল রানা, মেয়েটির চোখে কোনও ভাষা নেই। থরথর করে কেঁপে চলেছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ত্বক। শুরু হয়েছে হাইপোথারমিয়া।

'ওর দ্রুত তাপ দরকার, শুকনো কাপড়ও,' বললেন উইলসন।

পানির ভিতর কী-ই বা করবে ওরা? পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠল হঠাৎ—গ্যারাজের বে ডোর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা ভেহিকল! জ্বলজ্বল করছে হেডলাইটগুলো!

গ্যারাজের চারপাশে এক ফুট গভীর পানি বইছে। তারই ভিতর দিয়ে ট্যাঙ্কের মত ছুটছে গাড়িটা। ড্রাইভার বাঁক নিল, তেড়ে এল রানাদের দিকেই! হেডলাইটের হাই-বিম দিয়েছে, কয়েকবার ডিপ করল। একমিনিটও পেরুল না, তার আগেই উজ্জ্বল বাতির আলো এসে পড়ল রানাদের উপর। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে তেড়ে এল ড্রাইভার!

বাগানের খোলা এক অংশে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ববি ও

অন্যরা। পালাবে কোথায়! গোড়ালি উঁচু কালো পানি বইছে চারপাশে। দৌড়াতে পারবে না, লুকানোর জায়গাও নেই। শান্ত চোখে গাড়ির দিকে চাইল রানা, চাপা স্বরে উইলসনকে বলল, 'গ্রেসিকে একমিনিটের জন্য ধরে রাখুন।'

কাঁধ থেকে মেয়েটিকে নামিয়ে দিল ও, সোজা হয়েই কোল্ট তাক করল গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে। ওটার পিছনে থাকবে ড্রাইভার।

হাত কাঁপছে রানার, শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল ট্রিগার। ড্রাইভার পাত্তা দিল না, ধেয়ে আসছে। সামনের বাম্পার ও ফেণ্ডার ওয়েল থেকে ছলকে পড়ছে পানি। একেবারে কাছে চলে এল গাড়িটা, আসছে একপাশ দিয়ে। তারপর হঠাৎ থামতে শুরু করল। গুলি ছুঁড়ল না রানা, চেয়ে রইল কালো রঙের সুপারচার্জ্ড্ রেঞ্জ রোভারের দিকে। গাড়িটা পানি ছিটিয়ে আধপাক ঘুরেই থামল। রানার দলের তিন ফুট দূরে থেমেছে লোকটা। ড্রাইভারের দিকের উইণ্ডশিল্ড দেখছে রানা, হাতে উদ্যত কোল্ট। এক পা সামনে বেড়ে বাগিয়ে ধরল পিস্তল।

এক মুহূর্ত চুপচাপ থমকে রইল জিপগাড়ি। ওটার নীচ থেকে হিসহিস করে উঠছে বাষ্প। তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেল কালো টিণ্টেড জানালা। গাড়ির ভিতর অন্ধকার ছিল, জ্বলে উঠল ছোট্ট বাতি। তাতে দেখা গেল সুদর্শন এক যুবককে।

'কারও ট্যাক্সি দরকার?' হাসছে সোহেল!

রেঞ্জ রোভারের পিছনের দরজা খুলে ফেলল রানা, সিটে শুইয়ে দিল গ্রেসিকে। ধাক্কা দিয়ে বলোর্মাকে পাশে ঠেলল ববি। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠলেন উইলসন। হিটার ছেড়ে দিল সোহেল, কিছুক্ষণের ভিতর গরম হয়ে উঠল ভিতরটা। গ্রেসির জুতো খুলে ফেলেছে ববি, উপরের কাপড়-চোপড়ও। নিজে

এখনও একটু একটু কাঁপছে। গাড়ির ভিতর স্বাভাবিক তাপ ফিরতেই প্রায় সুস্থ হয়ে উঠল সবাই। অবাক করল গ্রেসি, উঠে বসেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করল ববির উরুতে।

'ভাল দেখালি,' সোহেলের দিকে চেয়ে হাসল রানা। এখনও পানিতে দাঁড়িয়ে। উঠে এল গরম হয়ে ওঠা গাড়ির ভিতর।

'সত্যিই, দারুণ!' প্রশংসা করল ববি।

'সব প্রশংসা ফ্রেডারিখ ফন বোমারের,' মৃদু হাসল সোহেল। 'সত্যিই চমৎকার সাইসমিক ডিভাইস বের করেছেন! বাটন টিপতেই শুরু হলো ভূমিকম্প!'

'ঠিক সময়ে বেরিয়ে এসেছিস, নইলে...

'কাজের কাজই করেছেন, মিস্টার সোহেল,' বলল ববি। 'কিন্তু মনে কষ্ট লাগছে অন্য কারণে। বরফ-পানির ভিতর আমাদের না চুবালে বেশি খুশি হতাম।'

'ভূমিকম্প শেষ হতেই ল্যাবোরেটরিতে আগুন ধরে গেল, এল বান,' বলল সোহেল। 'সেজন্য আমাকে দায়ী করা যায়?'

ল্যাবোরেটরির দিকে চাইল রানা। দ্বিতীয় তলার জানালাগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা। গ্যাসের কোনও পাইপ ফেটেছে ওই দালানে, হয়তো জ্বলন্ত চুলা থেকেই ধরেছে আগুন। সায়েন্টিস্টদের দেখা গেল ওদিকে। উস্কোখুস্কো চুল, পোশাক মলিন; ব্যস্ত হয়ে ইকুইপমেন্ট, রিসার্চের যন্ত্রপাতি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বের করছেন। অবস্থা দেখে মনে হলো পুরো দালানে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

গাড়ির ভিতরের গরম সুস্থ করে তুলেছে বলোর্মাকে, হঠাৎ ফোঁস করে উঠল সে, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে! এ গাড়ি আমার ভাইয়ের!'

'গাড়িটা সত্যিই ভাল,' বলল সোহেল। 'পরে মনে করিয়ে দিয়ো, তোমার ভাইকে ধন্যবাদ দেব।'

'নামুন গাড়ি থেকে!'

পাত্তা দিল না সোহেল, রানার দিকে চাইল। 'তুই ড্রাইভ করবি? আমি বরং বনবিড়ালীর কোলে গিয়ে বসি।'

'একটা কাজ রয়ে গেল,' প্রাসাদের দিকে চাইল রানা। 'জালাইরকে ধরা দরকার।'

'যা না, মর্,' অভিশাপ দিল বলোর্মা। 'ওর হাতেই তোর মরণ আছে!'

যথেষ্ট সহ্য করেছে ববি, ডানহাতে ছোট্ট একটা জ্যাব করল ডাইনীর চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস-ফাঁস থেমে গেল। জ্ঞান হারিয়ে সিটে পড়েছে বলোর্মা।

'গত ক'দিন এ-ই চেয়েছি, এখন মনটা একটু ভাল লাগছে,' খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলল ববি। রানার দিকে চাইল। 'তোমার ব্যাকআপ লাগবে।'

'তুমি পারবে না, কারণ তুমি আহত,' ববির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা দেখিয়ে দিল রানা। 'এদিকে সোহেলের অন্য কাজ আছে। তোমাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবে ও। এদিকে আরও ঝামেলা হতে পারে।'

'গ্রেসি বা উইলসন জিপ নিয়ে যেতে পারে,' বলল সোহেল।

'ওরা কেউ চেনে না ফিরতি পথ। আঁধারে হারিয়ে যাবে।' মাথা নাড়ল রানা। 'তোরই বেরিয়ে যেতে হবে। এদিকে জালাইরকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। ফস্কে গেলেই ডুব দেবে। আমি ফিরছি।'

'হিম প্যানির ভেতর বেশিক্ষণ টিকবি না তুই,' আপত্তি তুলল

সোহেল। খেয়াল করেছে, একটু একটু কাঁপছে রানা। জিপ থেকে নেমে পড়েছে।

'আমার বেশিক্ষণ লাগবে না,' বলল রানা।

ভারী জ্যাকেট খুলল সোহেল। 'এটা নে।'

ভেজা পোশাক ছাড়ল রানা, পরে নিল জ্যাকেট। 'এবার রওনা দে তুই। এদিকের মাটি ফস্কা—আবারও হতে পারে ভূমিধস। উঁচু কোথাও গিয়ে থামবি। আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিবি, এরমধ্যে না এলে সোজা উলানবাটোরে ফিরবি।'

'অপেক্ষা করব আমরা,' দৃঢ় স্বরে বলল সোহেল। গিয়ার ফেলে রওনা হলো। পানি ছলকে দিয়ে মেইন গেটের দিকে চলেছে। গেট নেই, দু'পাশের প্রাচীর ধসে পড়েছে। সামনে খণ্ড-খণ্ড কংক্রিট ও আবর্জনা। ভাঙা প্রাচীরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল রেঞ্জ রোভার। কয়েক সেকেণ্ড লাল টেইল-লাইট দেখা গেল, তারপর হারিয়ে গেল আঁধারে।

পানির ভিতর ফিরতি পথ ধরেছে রানা। চলেছে আঁধার প্রাসাদে। হঠাৎ নিজেকে বড় একা লাগল। কী ঘটবে ওই প্রাসাদে? পাওয়া যাবে জালাইরকে?

ঊনত্রিশ

তীব্র বন্যা নেই, প্রাসাদের ভিতর আধ ফুটে নেমে এসেছে পানির উচ্চতা। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দার উপর উঠল রানা। সামনেই হাঁ করা

চৌকো ফোকর। ভিতরে গিয়ে পড়েছে সিংহ-কবাট। তার উপর ভাসছে চিত হওয়া এক লাশ। ডান পায়ের উপর পড়েছিল বিরাট এক প্ল্যাণ্টার, সরতে পারেনি। মুখটা লক্ষ করল রানা। যে প্রহরীকে গুলি করেছিল, এ লোক সে নয়। এখনও ডান হাতে কাঠের বর্শা। ফোকরের পাশে ক' সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। ডানহাতে কোল্ট, কাভার করল ফয়েই। কেউ নেই। লাশের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা, খুলে নিল কমলা টিউনিক। বামহাতে ছাড়িয়ে নিল বর্শা। টিউনিকের বগলের ভিতর গলিয়ে দিল বর্শা। জিনিসটা সামনে রেখে এগুবে, আঁধারে কেউ ধোঁকা খেতে পারে।

মেঝের উপর দিয়ে কুল-কুল আওয়াজে বইছে স্রোত। দূরে বাড়ির পিছন সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ছে জলধারা। এ ছাড়া চারপাশ থমথমে। বিদ্যুৎ নেই, তবে দূরে কোথাও জেনারেটর চলছে। হলওয়ের ছাতে একটু পর পর লাল ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে, করিডোরে ফেলছে বর্ণিল আলো। তবে সে আলোয় বেশি দূর দেখা যায় না।

ফয়েই থেকে গেছে তিনটে করিডোর। ফয়েই পেরুল রানা, একে একে প্রতিটি করিডোরে উঁকি দিল। বাড়ির উত্তর উইং চোখে পড়ল। ওদিকের করিডোর দিয়ে বইছে নদীর স্রোত। সঙ্গে নৌকা না থাকলে ও পথে যাবে না জালাইর। বাকি থাকে অন্য দুই করিডোর। গ্রেসির বর্ণনা অনুযায়ী, স্টাডি-রুম প্রধান করিডোরে। নিঃশব্দে ওদিকে চলল রানা, ঢুকে পড়ল চওড়া প্যাসেজওয়েতে। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে। হাতে তৈরি কোল্ট। বামহাতে বাড়িয়ে ধরেছে বর্শা। ডগা থেকে ঝুলছে কমলা টিউনিক। রানার আড়াই ফুট সামনে করিডোরের মাঝখান দিয়ে

চলেছে ওটা।

ধীর পায়ে হাঁটছে রানা। সতর্ক, যেন ছলকে না ওঠে পানি। সত্যি বলতে, অন্য উপায় নেই ওর। নদীর পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। অবশ হয়ে এসেছে দুই পা। মন বলছে, যে-কোনও মুহূর্তে ধুপ করে পড়বে। এখন ছুটতে হলে? তিক্ত হাসল রানা। ভারসাম্য রক্ষা করাই কঠিন!

ধৈর্য ধরে এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে পড়ল কয়েকটা ছোট ঘর। ভিতরে ঢুকল না রানা। দরজা পেরিয়ে থামছে, দু'মিনিট অপেক্ষা করছে। কেউ বেরিয়ে এল না, পিছু নিল না কেউ। ডানদিক থেকে প্যাসেজের উপর পড়েছে একটি কাবার্ড, সঙ্গে ভাঙা কিছু মূর্তি। ওখানে থামতে বাধ্য হলো, হলওয়ের মাঝে সরে আবারও এগোল। বোধহয় বামদিকে পড়বে কিচেন, এখনও প্যাসেজে ভাসছে সুস্বাদু খাবারের সুবাস। আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। দেয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে চলল। সামনে বাড়িয়ে ধরা বর্শা। করিডোরের মাঝ দিয়ে চলেছে টিউনিক।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পানি। অবশ হয়ে আসছে শরীর। কান পাতল। চাইছে পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ থাক। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। কিন্তু হঠাৎ সামনে ঘষা খেল কিছু। থেমেও গেল। শুধু স্রোতের শব্দ? না মনে হয়—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে! সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। কল্পনা করেছে? পাথরের মত স্থির হয়ে গেল রানা, আরও বাড়িয়ে ধরল বর্শা। একটু একটু করে নাড়ছে টিউনিক।

পরক্ষণে খানখান হলো নৈঃশব্দ্য! কড়-কড়াৎ শব্দে কান ফাটা আওয়াজ! কেউ গুলি করছে করিডোরে! আবছা আলোয় ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল টিউনিক! রানার দু'ফুট সামনের ছিন্নভিন্ন হলো দেয়াল!

মাযল ফ্লাশ এসেছে কিচেনের দরজা থেকে! পাল্টা তিনবার গুলি ছুঁড়ল রানা। লক্ষ্যে লাগল কি না, কে জানে!

করিডোরে হারিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। তারপর শোনা গেল দুর্বল ঘড়ঘড় আওয়াজ। কেউ গড়গড়া করছে কিচেনে। পরক্ষণে ধাতব ঠন-ঠনাৎ আওয়াজ এল। স্টিলের প্যানে পড়েছে রাইফেল। পানির ভিতর ঝপাস্ করে পড়ল কেউ। বোধহয় মৃত প্রহরী!

'জারগাঘান?' করিডোরের দূর থেকে ভেসে এল জালাইর তেমুজিনের কণ্ঠ।

গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেল। থমথম করছে করিডোর। অপেক্ষা করছে রানা। মন বলছে, আর কোনও প্রহরী থাকবে না। সামনে শুধু জালাইর তেমুজিন। টিউনিক সহ বর্শা নামিয়ে রাখল রানা, নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল। ওর পা দুটো যেন সীসা দিয়ে তৈরি, নড়তে চাইছে না। করিডোরের বামদিকে সরে গেল, দেয়াল ধরে ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলেছে। সামনে ছপাস্ ছপাস্ আওয়াজ চলছে, তারপর করিডোর থেকে বেরিয়ে গেল জালাইর তেমুজিন।

প্রাসাদের একপাশ থেকে জোর আওয়াজ উঠল। উত্তর উইঙের এক অংশ ধসে পড়েছে নদীতে। থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা দালান। কেঁপেই চলেছে বাড়ির মাঝখানটা। বোধহয় একে একে ধসে পড়ছে সব। রানার মনে পড়ল, উত্তর দিকে টিলা ও খাদ দেখেছে। হয়তো গোটা প্রাসাদ পিছলে গিয়ে নামবে ওই খাদে! একবার মন চাইল, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তবে পরক্ষণে নাকচ করল চিন্তাটা। সামনেই থাকবে জালাইর তেমুজিন। লোকটাকে ধরবে ও। বন্দি করবে। সম্ভব হলে জীবিত নিয়ে যাবে।

দ্রুত হাঁটতে চাইছে রানা। দু' পাশে ছোট কিছু ঘর। ওগুলো পেরিয়ে একটু ইতস্তত করল। সামনে আগুনে পোড়া স্টাডি-রুম। শীতে কাঁপছে সারা শরীর। অন্যদিকে সরাতে চাইল মন। চারপাশ দেখতে মনোযোগ দিল করিডোরে। হেঁটে চলেছে, করিডোরের প্রায় শেষে পৌঁছুল। জলধারার আওয়াজ অনেক বেড়েছে। হলওয়ের শেষে জ্বলছে একটা লাল ইমার্জেন্সি বাতি। সামনের ঘর থেকে ঝরঝর করে ঝরছে পানি। বোধহয় কোনও সিঁড়ি থেকে। দরজার এক কোনা থেকে উঁকি দিল রানা।

প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুম মনে হলো। এক পাশে একটা সিঁড়ি। পুরু কার্পেট মোড়ানো ধাপগুলো নীচে নেমেছে। ওখান দিয়ে ঝরঝর করে নামছে নদীর পানি। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত তিনদিকে বিশাল উঁচু জানালা। বাড়ির এ দিকের অংশ বোধহয় ক্যান্টিলিভার। জানালা দিয়ে চোখ গেল, দেড় তলা নীচে নদীর ধারা।

জানালা দিয়ে আলো আসছে। ফ্যাকাসে চাঁদ উঠেছে পুবে। ঘরের ভিতর চোখ বোলাল রানা। কোথায় জালাইর তেমুজিন? শুধু পানির ঝরঝর আওয়াজ। নড়াচড়া নেই কারও। জায়গায় জায়গায় কালো স্তূপ। বুক-শেলফ্, বার, সোফা, বড় একটা টেবিল, ওটা ঘেরা চেয়ার। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল রানা। মিশে গেল কালো রঙের এক বুক-শেফফের সঙ্গে। যেদিকে চোখ পড়ছে, সেদিকে তাক করছে কোল্ট। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে ওর। মন বলছে, ও মস্ত বিপদে পড়েছে! কিন্তু জানে না, কোন্ দিক দিয়ে আসবে বিপদটা।

নিখুঁত সময় বেছে নিল জালাইর তেমুজিন। কনফারেন্স টেবিলের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল সে। শত্রু ঘরের বামদিকে

পিস্তল তাক করেছে।

বড় দেরি হয়ে গেছে রানার। খস্ শব্দ শুনে চরকির মত ঘুরল, পরক্ষণে শুনল তোয়াং করে উঠল কিছু! জালাইর তেমুজিন ওদিকের আঁধারে! তাক না করেই গুলি ছুঁড়ল রানা! লক্ষ্য ভেদ করল না বুলেট। জালাইর তেমুজিনের পিছনদিকে ঝনঝন করে ভাঙল আলমারির কাঁচ।

রানা লক্ষ্যভেদ করতে না পারলেও, জালাইর তেমুজিন ঠিকই পেরেছে!

পলকের জন্য কী যেন দেখেছে রানা—পালক লাগানো কিছু। পরক্ষণে ঠকাস্ আওয়াজে হৃৎপিণ্ডের উপর বিঁধল তীর! প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা মেঝের উপর! চোখ তখনও খোলা, আবছা দেখল জালাইর তেমুজিনকে। পাশে এসে দাঁড়াল সে, হাতে ক্রসবো! চাঁদের আলোয় ঝকঝক করল তার চোখা দাঁতগুলো। হাসছে, তৃপ্তির হাসি!

বুজে গেল রানার চোখদুটো!

ত্রিশ

ভাঙা প্রাচীরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল রেঞ্জ রোভার, পানি ছিটিয়ে রওনা হলো বামদিকে। রাস্তার ওদিকে উঁচু এক ঢিবির দিকে চলেছে। মাটি কামড়ে ঢিবির উপর উঠল জিপ, ওটার নাক

ঘুরিয়ে নিল সোহেল। নীচে পরিষ্কার চোখে পড়ল জালাইর তেমুজিনের কম্পাউণ্ড। প্রাসাদের ভিতর দিয়ে বইছে নদীর স্রোত। আরেক দিকে ল্যাবোরেটরি, দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। দরজা-জানালা দিয়ে গল-গল করে বেরোচ্ছে ধোঁয়া।

'সব ভেসে যাক, সব পুড়ে ছাই হোক—আমি খুশি হবো,' বললেন উইলসন। তৃপ্তি নিয়ে দেখছেন ধ্বংস-লীলা।

'সবচেয়ে কাছের ফায়ার ডিপার্টমেন্ট তিন শ' মাইল দূরে,' বলল ববি। 'আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে।'

গাড়ির হিটার তপ্ত হাওয়া ছাড়ছে। দ্রুত শুকিয়ে আসছে ভেজা পোশাক। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ববি, চেয়ে রইল কম্পাউণ্ডের দিকে। ঠিক তখনই প্রাসাদের ভিতর থেকে এল গুলির আওয়াজ। ব্রাশ ফায়ার করেছে কেউ। দুই সেকেণ্ড পর পাল্টা জবাব দিল একটা পিস্তল। পর পর তিনবার। আর কোনও আওয়াজ নেই।

কাকে যেন বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল ববি, সোহেলের দিকে চাইল। 'একা যাওয়া উচিত হয়নি ওর।'

'ওকে থামানো যেত না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। চট্ করে ঘড়ি দেখল। 'ও না ফিরলে ঠিক একঘণ্টা পর যাব আমি।' অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর। মন বলছে, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে রানা।

একবার মধ্যযুগীয় ক্রস-বো'টা দেখল জালাইর তেমুজিন, তারপর অ্যান্টিক-সংগ্রহর তাকে রেখে দিল। দ্রুত চলে গেল উত্তর দিকের জানালায়। নীচে চেয়ে চমকে উঠল। প্রাসাদ ঘিরে ঘূর্ণি তৈরি করছে স্রোত, কল-কল করে গিয়ে পড়ছে পাহাড়ি খাদে। চওড়া জলপ্রপাত হয়ে নীচে পড়ছে। চেঙ্গিজ খানের এই অদ্ভুত সুন্দর প্রাসাদ গেছে, এবার সমাধিটাও না যায়! পিছনে উঠানের মাটি

খুবলে নিয়ে চলেছে স্রোত। তিক্ত চোখে পাথরের সমাধি দেখছে সে। কবর অবশ্য উঁচু জমিতে, তবুও বিপদ হতে পারে। সমাধির ছাত ধসে পড়েনি, তবে প্রবেশ-পথ বিধ্বস্ত হয়েছে ভূমিকম্পের সময়।

নিথর পড়ে থাকা লোকটা মারা গেছে, তার দিকে চাইল না জালাইর তেমুজিন, ছুটল সিঁড়ির দিকে। একেকবারে দুটো করে ধাপ নামতে শুরু করল। ঠাণ্ডা পানি ছলকে লাগছে পায়ে। পিছলে পড়তে গিয়েও শক্ত করে ধরল রেলিং। সাবধানে নেমে এল ল্যাণ্ডিঙে। একবার চেঙ্গিস খানের পোরট্রেইট দেখল, আস্তে করে মাথা দোলাল। নীচে নেমে টের পেল, ঊরু ডুবিয়ে ছুটছে স্রোত। প্যাসেজের শেষে পৌঁছে খুলে ফেলল দরজার ছিটকিনি, বেরিয়ে এল আঙিনায়। দ্রুত চলতে গিয়ে হোঁচট খেল, সামলে নিয়ে চলল সমাধির দিকে। পাঁচ মিনিট পর বারান্দার উপর উঠল জালাইর তেমুজিন। গুহার মত প্রবেশ-দ্বারটা আর নেই। ধসে পড়েছে পাথরগুলো। তার মধ্য দিয়ে পথ করে ঢুকে পড়ল সে। ভিতরে জ্বলছে কিছু মশাল। মেঝের উপর দিয়ে ছুটছে দু'ইঞ্চি উঁচু স্রোত।

মশালের লাল আভা পড়েছে কবর দুটোর উপর। পাশে চলে গেল জালাইর তেমুজিন। না, এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। ছাতে চোখ পড়তেই কুঁচকে গেল ভ্রূ। গম্বুজে ফাটল! ভূমিকম্প সমাধিটাকে ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। চার দেয়ালে মাকড়সার জালের মত ফাটল! আবার চোখ চলে গেল গম্বুজের দিকে। ধসে পড়বে না তো! তার পাওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার চেঙ্গিস খান! চোখের কোণে দেখল দুলে উঠেছে একটা শিখা। বোধহয় নড়ছে কোনও ছায়ামূর্তি!

'তোমার পৃথিবী ধসে পড়ছে, জালাইর। সঙ্গে চলেছ তুমিও।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল জালাইর। বিস্ফারিত হলো চোখদুটো। ভূত দেখছে সে! কক্ষের একধারে দাঁড়ানো ওটা মাসুদ রানার শব! বুক থেকে এখনও ঝুলছে তীর। ডানহাতে পিস্তল। ওর বুকের দিকে চেয়ে রয়েছে নলের নিষ্ঠুর, কালো গহ্বর। অবিশ্বাস্য! লোকটা মরেনি কেন? মাসুদ রানার দিকে চোখ সরু করে চাইল জালাইর তেমুজিন। এগিয়ে আসছে মৃতদেহটা।

কালো কবরের খানিক দূরে থামল রানা। পিস্তলের নল দিয়ে দূরের কবরগুলো দেখাল। 'ভাল লোক তুমি, তা-ই না? কাছেই রেখেছ আত্মীয়-স্বজন। তোমার বাপ-দাদা?'

নিঃশব্দে মাথা দোলাল জালাইর। মরা মানুষ জেগে উঠেছে, ধাক্কাটা সামলে নিতে চাইছে।

'এক ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্টের কাছ থেকে চেঙ্গিস খানের নক্শাটা চুরি করে তোমার দাদা,' বলল রানা। 'তার পর চলে আসে এখানে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' তিক্ত শোনাল জালাইরের কণ্ঠ। 'আমরা চেঙ্গিস খানের বংশধর। এই পাহাড় কেটে প্রাসাদ আর সমাধি খুঁড়ে বের করি আমরা।' তার চোখ দেয়াল থেকে দেয়ালে সরছে। কোনও অস্ত্র পেতে চাইছে।

পিছিয়ে কক্ষের মাঝখানে চলে গেল রানা। বাম হাতে দেখাল গ্র্যানিটে বাঁধানোপ কবরদুটো। 'ডানদিকের কবরটা চেঙ্গিস খানের?' শীতে কাঁপছে রানা, জমে আসছে শরীর, কেমন যেন ঘোর লাগছে ওর। সামনে শুয়ে রয়েছে দুনিয়ার সেরা এক যোদ্ধা! 'জালাইর, তোমার উপর খেপে যাবে মঙ্গোলিয়ানরা। পিছন আঙিনায় শুইয়ে রেখেছ চেঙ্গিস খানকে।'

'মঙ্গোলিয়ার সবাই বুঝবে আমি জাগিয়ে তুলেছি নতুন এক

সূর্য,' বলল জালাইর। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠ, 'তেমুজিনের শপথ, আমরা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব আমরা কী। আবারও দুনিয়ার সেরা জাতি হবে মঙ্গোলিয়ানরা। আম্যাদের সামনে হামাগুড়ি দেবে সব জাতির মানুষ।'

আরও কিছু বলতে চাইল জালাইর, কিন্তু ঠিক তখনই প্রচণ্ড আওয়াজ শুরু হলো। মেঝের নীচ থেকে আসছে! প্রাসাদের উত্তর উইং ঝপাস্ করে ভেঙে পড়ল পানির ভিতর! আগেই নড়ে গেছে ভিত্তি! মাটির উপর পিছলে রওনা হলো প্রাসাদের বড় এক অংশ! ঢালু জমি বেয়ে নামছে পাহাড়ি খাদে! যেখানে ছিল অপূর্ব প্রাসাদ, সেখানে রইল শুধু ধ্বংসাবশেষ আর থই-থই পানি!

ভয়ঙ্কর আওয়াজ এল! পাহাড়ের নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ল ভাঙাচোরা অংশ! থর-থর করে কাঁপতে লাগল গোটা কম্পাউণ্ড! দ্রুত নড়ছে পুরো সমাধি! ভারসাম্য রাখতে পারল না রানা ও জালাইর, পড়ে গেল মেঝের উপর। কম্পনের ভিতর ঝট্ করে উঠে বসল রানা, পিস্তল তাক করল জালাইরের উপর।

'চলো, গুলি খেয়ে মরতে না চাইলে চলো আমার সঙ্গে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল মঙ্গোল। হঠাৎ থেমে গেল জমির কাঁপুনি। উঠে দাঁড়িয়ে ছাতের দিকে চাইল জালাইর। বিস্ফারিত হলো চোখদুটো। মাথার উপর চড়চড় করে ফাটছে ছাত! পাথর ও সুরকির প্রকাণ্ড এক অংশ দড়াম করে নামল ঠিক তার পাশে!

ছাতের দিকে চাইল রানা। সমাধির পিছন দিকটা ধসে পড়ল! ছাত থেকে নামছে আরও পাথর-সুরকি! চারপাশ আঁধার করে তুলল ঘন ধুলো, কিছুই দেখা গেল না! টের পেল রানা, পাথরের প্রকাণ্ড সব টুকরো পড়ছে চেঙ্গিসের কবরের পাশে! অমন একটা উপরে পড়লে ছাতু হয়ে যাবে ও। কাজেই...

হঠাৎ থেমে গেল পাথর বৃষ্টি। বিশ সেকেণ্ড পর দৃষ্টি পরিষ্কার হলো। থিতিয়ে আসছে ধুলো। তাজা হাওয়া লাগছে ত্বকে, টের পেল রানা। উঠে দাঁড়াল, চার পাশ দেখছে। দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে মশালগুলো। পুরো দালানের পিছন দিক ধসে গেছে। পানির ভিতর পিছলে সরেছে সমাধিক্ষেত্র! ছাতের অর্ধেক অংশ আর নেই! ধসে পড়েছে ডানদিকের দেয়াল, স্তূপ হয়ে গেছে পাথরের। চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল করালটা। ওই তো, ভিতরে পার্ক করা রয়েছে প্রাচীন গাড়িটা!

পাথরের স্তূপের নীচে চাপা পড়েছে জালাইর তেমুজিন। মাথা ও বুকটা বেরিয়ে আছে কেবল। কবরের পাশে চলে গেল রানা, ঝুঁকে দেখল লোকটার মুখ। নড়ছে না জালাইর। হঠাৎ চোখদুটো খুলে গেল তার। ঠোঁটের কোণ বেয়ে তিরতির করে নামছে রক্ত। পাথর পড়ে ভেঙে গেছে ঘাড়। ঝাপসা দৃষ্টি স্থির হলো এসে রানার মুখে। চোখে ফুটে উঠল রাগ।

'তুমি... বেঁচে আছো... কী-কী করে?' থমকে থমকে জানতে চাইল জালাইর।

জবাবটা জানা হলো না তার। আস্তে করে কাত হয়ে গেল মাথা। সবসময় চেঙ্গিস খানের ছায়ার নীচে থাকতে চেয়েছে সে, মরলও দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কবরের পাশে।

ভাঙাচোরা লোকটার প্রতি কোনও সহানুভূতি এল না রানার মনে। আস্তে করে নামিয়ে নিল কোল্ট। বামহাতে খুলল বুক পকেটের চেইন, জ্যোৎস্নার আলোয় উঁকি দিল ভিতরে। ওখানে ধাতব ক্লিপবোর্ড সহ সাইসমিক অ্যারের ম্যানুয়াল। বুক পকেটে রেখেছিল সোহেল। ম্যানুয়ালের পাতাগুলো বিদ্ধ করেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্রস-বোর তীর! পাতাগুলো পেরিয়ে ফুটো করতে

চেয়েছে ক্লিপবোর্ড। ট্যাপ খেয়ে গেছে ওটা। ছিল ঠিক রানার হৃৎপিণ্ডের উপর!

এক পলক জালাইরকে দেখল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'আমার কপালটা ভাল, তাই!'

প্রাসাদের উত্তর উইং আর নেই। সেদিক দিয়ে হুড়মুড় করে আসছে নদী! পানির উচ্চতা বাড়ছে উঠানে। এভাবে মাটি ভিজলে ভিত্তিসহ সমাধি পিছলে নামবে গিরিখাদে! চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে চেঙ্গিস খানের ঐতিহাসিক কবর!

আবারও দেয়াল ধসতে পারে। একবার কবরটা দেখল রানা, পরক্ষণে রওনা হলো করালের দিকে। ভাবছে, আমিই কি একমাত্র লোক, যে শেষবারের মত দেখল এই কবর? ঠিক তখনই অদ্ভুত চিন্তা এল মনে। জমাট শীতে হি-হি করে কাঁপছে, তবুও হেসে ফেলল। বিড়বিড় করে বলল, 'দোস্তো, দেখা যাক শেষ যুদ্ধে কেমন করো!'

একত্রিশ

করালের ভিতর ঢুকে পড়েছে রানা। যা চাইছে, আগে দেখেছে এখানে। ওয়্যাগনগুলোর কাছে পেল জং-ধরা কোদাল ও শাবল—কয়েক ক্রেট ভরা। ওখান থেকে একটা শাবল নিয়ে ফিরল বেড়ার কাছে। তিনটে খুঁটি উপড়ে ফেলতে লাগল পাঁচ

মিনিট মত। ততক্ষণে শীত ভেগেছে। গা থেকে টপটপ করে ঝরছে ঘাম। সরিয়ে নিল বেড়ার দশ ফুটি এক অংশ। ধূলি ধূসরিত প্রাচীন গাড়ি থেকে শুরু করে বেড়া পর্যন্ত যত জঞ্জাল সরিয়ে নিল। পথ এবার তৈরি, ইঞ্জিন চালু হলেই হয়! সব কাজ সেরে মনে পড়ল, গাড়িতে পেট্রোল আছে তো?

গাড়িটা উনিশ শ' একুশ সালের সিলভার গোস্ট ওপেন ট্যুরার রোলস্ রয়েস। বিখ্যাত ইংলিশ কোচ নির্মাতা পার্ক ওয়ার্ডের হাতে-তৈরি বডি। এখন সব ধূলো-ময়লায় মাখা, আবছা চেনা যায় ওটার রং ছিল এগপ্লান্ট পার্‌প্‌ল। অ্যালুমিনিয়ামের বডি, নইলে বহু আগেই ক্ষয়ে যেত জং ধরে। এখনও হঠাৎ-হঠাৎ লণ্ডনের সড়কে দেখা যায় এই অভিজাত গাড়ি। মঙ্গোলিয়ায় কীভাবে এল, কে জানে! রানার মনে পড়ল, জগদ্বিখ্যাত লরেন্স অভ অ্যারাবিয়া এরকম একটা তৈরি করিয়ে নেন উনিশ শ' চোদ্দ সালে—সিলভার গোস্ট চেসিসের উপর ওটা ছিল আর্মার্ড। আরব-তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন মরুভূমি অভিযানে। খুবই শক্ত জান এ গাড়ির। হয়তো কোনও এক সময়ে গোবি মরু ডিঙিয়ে নিয়ে আসা হয় এখানে। হতে পারে মঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সময় এটা জালাইরের দাদার কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি তারা।

এ নিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, চোখের সামনে দেখছে রোলস রয়েসের নাক থেকে ঝুলছে ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেল। বহু কাল আগে ইলেকট্রিক স্টার্টারের পাশাপাশি এ কোম্পানি ক্র্যাঙ্ক হ্যানডেলও সাপ্লাই করত। রানার মনে একটু আশা জাগছে তাই। ব্যাটারি বহু আগে ঘুমিয়ে পড়বার পরও, চালু হবে ইঞ্জিন।

ড্রাইভারের দরজা খুলে ফেলল রানা, দ্রুত হাতে নিউট্রাল

করল গিয়ার শিফট, ফিরে এল গাড়ির নাকের সামনে। ক্র্যাঙ্কের উপর পা রেখে জোরে লাথি দিল। নড়ল না ক্র্যাঙ্ক। দাঁতে দাঁত খিঁচিয়ে আবার লাথি ছুঁড়ল রানা। এক ইঞ্চি উপরে উঠল ক্র্যাঙ্ক। পরের দুই লাথিতে উঠল তিন ইঞ্চি। এইবার দু'হাতে ক্র্যাঙ্ক ধরল ও, দু'হাতের জোরে উপরে টানতে চাইল। এতক্ষণে কাজ হলো, ক্যাঁচ করে উঠল ক্র্যাঙ্ক, ছুটে গেল জ্যাম। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে ঘুরে উঠল ছয় পিস্টন।

অ্যান্টিক গাড়ি সবসময় টানে রানাকে। ব্যক্তিগত ছোট্ট একটা জাদুঘর রয়েছে ওর আমেরিকায়। ও জানে এসব গাড়ি কী ধরনের আচরণ করে। ড্রাইভারের দরজায় আবার ফিরল রানা, বসে পড়ল সিটে। অ্যাডজাস্ট করল থ্রটল, স্পার্ক ও গভার্নর কন্ট্রোল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে খুলল ইঞ্জিন হুড, চোখ পড়ল দস্তার এক ক্যানিস্টারের উপর। ওটা খুদে পাম্প। ভিতরে থাকবে পেট্রোল। যদি থাকে আর কী! আছে, কিন্তু ধুলোয় ভরে গেছে পাম্প। খালি হাতে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করল রানা, ইঞ্জিন হুড আটকে ফিরল ক্র্যাঙ্কের সামনে। আবার দু'হাতে ধরল দণ্ড, ঘোরাতে শুরু করল।

একপাক করে ঘুরছে ক্র্যাঙ্ক, খুক-খুক কাশি দিচ্ছে প্রাচীন মোটর, টেনে নিতে চাইছে বাতাস ও ফিউল। কিন্তু শেষ হয়ে আসছে রানার শক্তি। পুব-দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে টানা হাওয়া। জমে আসছে হাত-পা। একবার করে কাশি দিচ্ছে ইঞ্জিন, রানার মন বলছে, এইবার চালু হবে মোটর। কিন্তু হচ্ছে না। বারবার ভাবছে, কই, কিছুই তো ঘটছে না! দশমবার জোরেশোরে কেশে উঠল ইঞ্জিন। আরও কয়েকবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরানোর পর ঠির-ঠির করে উঠল মোটর। তারপর থেমে গেল। আর কোনও সাড়া নেই! হাতের তালু দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল পরিশ্রান্ত রানা, নতুন

উদ্যমে ক্র্যাঙ্কশাফট ঘোরাল। ষোলোবার ঘোরানোর পর জ্বলে উঠল বাতাস ও ফিউল, ভিট-ভিট আওয়াজে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

দু'হাঁটুর উপর হাত রেখে এক মিনিট বিশ্রাম নিল রানা। ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে প্রাচীন ইঞ্জিন। জং ধরা এগযস্ট পাইপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ। ওয়্যাগনগুলোর কাছে চলে গেল রানা, কী যেন খুঁজতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর পেয়েও গেল যা চাইছে। এক পিপে ভরা শিকল। গড়িয়ে নিয়ে এল গাড়ির পাশে। পিছনের সিটে তুলল শিকল, বেরিয়ে গিয়ে আবার উঠল ড্রাইভিং সিটে। অবশ বামপায়ে ক্লাচ দিয়েই গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল সামনের দিকে। দুলতে দুলতে চলল রোল্স রয়েস।

'এক ঘণ্টার বেশি হলো রানা গেছে,' গম্ভীর সোহেল হাতঘড়ি দেখল।

টিবির কিনারে দাঁড়িয়েছে ববি ও সোহেল। নীচে জালাইরের কম্পাউণ্ড, ধ্বংস-স্তূপ। এখনও জ্বলছে ল্যাবোরেটরি। উজ্জ্বল শিখাগুলো আকাশ ছুঁতে চাইছে। উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া। আগুনের হলদেটে আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রাসাদের এক অংশ হারিয়ে গেছে। সেখানে বইছে পাহাড়ি নদী।

'একবার ঘুরে আসব গাড়ি নিয়ে?' বলল ববি।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'না। দশ মিনিট পর আমি একা যাব। আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন। যদি না আসি, ফিরতি পথ ধরবেন। পথ আপনার চেনা।'

'রানা হয়তো আহত।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ববি। মনে মনে

জানে, কিছুতে ফেলে যাবে না বন্ধুদের। প্রায় এক ঘণ্টা হলো গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছে ওরা। অনেক আগেই ফিরে আসবার কথা রানার।

গাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। ঠিক তখনই নীচ থেকে এল ভারী ধরনের আওয়াজ। এবার ভূমিকম্প নয়, ভূমিধস। পাহাড়ি স্রোত সরিয়ে নিয়ে চলেছে মাটি। ঘুরে চাইল ওরা। বুঝে গেছে এর পর কী ঘটতে চলেছে। উপর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ভেঙে পড়ছে প্রাসাদ, যেন তাসের ঘর। উত্তর উইং নড়ে উঠল। সিনেমার দৃশ্যের মত একের পর এক দেয়াল কাত হয়ে ধসে পড়ছে! হয়তো কোনও স্ট্রাকচারাল ফেইলিওর ছিল, নইলে এমন হওয়ার কথা নয়। বাড়ির মাঝখানটা দু' টুকরো হলো, এক অংশ হেলে পড়ল অন্য অংশের উপর। সব গ্রাস করল নদী। ম্যাচের কাঠি যেভাবে দু'টুকরো করা যায়, ঠিক সেভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পোর্টিকোর পিলারগুলো। এবড়ো-খেবড়ো কিছু অংশ জেগে রইল পানির উপর। ভিত্তির বড় এক অংশ পিছলে রওনা হলো উত্তর দিকে। পাহাড়ি নদীর উন্মত্ত স্রোত যা পেল নিয়ে ফেলল গিরিখাদে। প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ ছিল, কয়েক মুহূর্ত পর আর কিছুই রইল না। গিরিখাদের নীচ থেকে এল বজ্রপাতের মত আওয়াজ।

পরস্পরের দিকে চাইল সোহেল ও ববি। শুকিয়ে গেছে মুখ। রানা যদি ওই বাড়ির ভিতর থাকে, এখন আর বেঁচে নেই। একটা কথাও বলল না দু'জন। চেয়ে রইল। প্রাসাদ যেখানে ছিল এখন সেখানে খলবল করছে নদী। খানিক দূরে জলপ্রপাত হয়ে ঝরছে গিরিখাদে। শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছে প্রমত্তা নদী, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিড়বিড় আওয়াজে জ্বলছে ল্যাবোরেটরির আগুন। এ ছাড়া

কোথাও কোনও শব্দ নেই।

'ওটা আবার কীসের আওয়াজ?' হঠাৎ বলল ববি।

যেখানে ছিল বিধ্বস্ত প্রাসাদ, সেদিকে চেয়ে রইল ওরা। দক্ষিণ দিকে জমিন বেশ উঁচু, সেদিকে বন্যা নেই। ওদিক থেকেই আসছে এ শব্দ। অতি দ্রুত চলছে কোনও ইঞ্জিন। কর্কশ, ভারী আওয়াজ। ক্ষণে ক্ষণে কেশে উঠছে, যেন হুমকি দিচ্ছেঃ থেমে যাবে। পরক্ষণে নতুন উৎসাহে গর্জে উঠছে আবার। পুব-দক্ষিণের ঢালু জমি বেয়ে উঠে এল দুটো বাতি।

ল্যাবোরেটরির আগুনের আভা জিনিসটার উপর পড়তেই মনে হলো, ওটা কোনও গুবরে পোকা। ধুলো-মাখা প্রকাণ্ড এক গুবরে পোকা, উঠে এসেছে গর্ত থেকে! গোল দুটো ঝাপসা হলদেটে চোখ। পিছনে আসছে ধাতব দেহ। ধুলো-মাটি-পাথর পিছনে ছুঁড়ছে। দানবীয় পোকা ফোঁস-ফোঁস শব্দে বাষ্প ছাড়ছে!

প্রতি কদম ফেলতে অনেক কষ্ট ওটার। ধীরে ধীরে উঠে এল ঢালু জমি বেয়ে। হঠাৎ ওটার উপর থেকে ধুলো ও ধোঁয়া সরিয়ে নিল জোর হাওয়া। ওটা কোনও দানবীয় গুবরে পোকা নয়। চট্ করে পরস্পরের দিকে চাইল সোহেল ও ববি। ধীরে ধীরে আসছে একটা অ্যান্টিক রোলস-রয়েস!

'ওটা দেখেছি জালাইরের করালে,' বলল ববি।

'ওই বুড়ো গাড়ি রাতের আঁধারে কে চালিয়ে আনছে, আন্দাজ করতে পারছি,' হেসে ফেলল সোহেল।

হই-হই করে উঠল ববি।

এক দৌড়ে রেঞ্জ রোভারে এসে উঠল ওরা দু'জন। গাড়ি নিয়ে টিবি বেয়ে নামতে শুরু করল সোহেল, চলেছে জালাইরের কম্পাউণ্ডের উদ্দেশে। একমিনিট পেরুনোর আগেই জিপের আলো

পড়ল রোলসের উপর। ইঞ্চি ইঞ্চি এগিয়ে আসছে বিট্রিশ গাড়ি। পিছনে টানটান মোটা শিকল। উঁচু জমি বেয়ে কী যেন টেনে আনছে!

রোলস রয়েসের ভিতর ব্যস্ত রানা, হেসে ফেলল সোহেলদের রেঞ্জ রোভার দেখে। ওর নিজের গাড়ি এখনও একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। প্রায় অবশ ডান পা মেঝের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটর পেডাল। ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেণ্ড গিয়ার দিতে পারেনি। পিছনের চাকাদুটো বনবন করে ঘুরছে, পিছনে ছুঁড়ছে মাটি। টায়ারগুলোর ভিতর বাতাস নেই, ক্ল্যাপ-ক্ল্যাপ আওয়াজে ঘুরছে। মাটিতে দাঁত বসাতে চেয়েও ব্যর্থ। পিছনে অতি ভারী জিনিস নিয়ে এগুতে চাইছে। বনেটের নীচে শেষ হয়ে আসছে ইঞ্জিনের ক্ষমতা। বারবার ঝাঁকি দিয়ে বন্ধ হতে চাইছে। অতি তপ্ত, যে কোনও সময়ে সিজ করবে ইঞ্জিন।

হঠাৎ পাশের জানালার ডোরপোস্ট ধরল কেউ! ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা। ববি! চওড়া হাসি হাসছে, একবার চোখ টিপে লেগে গেল গাড়ি ঠেলতে। হাজির হয়েছে সোহেল, গ্রেসি ও উইলসনও! সবাই মিলে হেঁই-আ হেঁই-আ বলে ঠেলছে পিছন থেকে!

ওদের সবার শক্তি যোগ হওয়ায় প্রায় লাফিয়ে সামনে বাড়ল গাড়ি। তিরিশ ফুট পিছনে আসছে বড়সড় এক খণ্ড গ্র্যানিট। ঢিবি বেয়ে উঠছে গাড়ি। তিন মিনিট পর উঁচু জমিতে উঠে এল। শুকনো জমিতে গ্র্যানিট খণ্ড উঠে আসতেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। বনেট থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে এল ঘন সাদা বাষ্প।

বাষ্প সরে যেতেই রানা দেখল, বেশ কিছু লোক ঘিরে ফেলেছে ওকে! সায়েন্টিস্ট, টেকনিশিয়ান। সঙ্গে দু'তিনজন প্রহরীও! লড়াই করবার ইচ্ছা নেই, হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা।

ছুটে এসেছে এখানে কী ঘটছে দেখতে।

গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল রানা, মন্থর পায়ে চলে গেল শিকল বাঁধা গ্র্যানিটের খণ্ডের পাশে। ওখানে ভিড় করল সবাই, দেখতে চাইছে জিনিসটা ঠিক আছে কি না।

আগেই নিরাপত্তার দিকে খেয়াল দিয়েছে রানা ও ববি, হাতে চলে এসেছে পিস্তল। মঙ্গোলিয়ানরা যেন পাত্তাই দিল না ওদের, প্রায় ঘিরে এল। তবে আক্রমণ করতে নয়।

সবার চোখ সার্কোফাগাসের উপর—পাথরের কফিনে ঘুমিয়ে রয়েছেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা চেঙ্গিস খান! বন্যা থেকে মুক্ত।

হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠল সায়েন্টিস্ট ও টেকনিশিয়ানরা। তাদের দেখাদেখি প্রহরীরাও! রানার মুখেও ফুটেছে হাসি।

বত্রিশ

ইউনাইটেড আরব আমিরাত থেকে উত্তর দিকে রওনা হয়েছে ইউএস নেভির ক্রুজার জে এফ কেনেডি। এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে হরমুজ প্রণালীর ভিতর, চলেছে পারস্য উপসাগরের দিকে। টিকোণ্ডারোগা-ক্লাস ঈজিস ক্রুজার, প্রকাণ্ড কোনও জাহাজ নয় ওটা। অবশ্য ওটাই আরব সাগরে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-জাহাজ। সুপারস্ট্রাচারের ভিতর বিভিন্ন ধরনের রেইডার সিস্টেম। ওগুলো জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে দু' শ' মাইল রেডিয়াসের ভিতর সব ধরনের

শত্রুকে টার্গেট করতে পারে। একটা বাটন টিপলে ছিটকে রওনা হয় এক শ' একুশটা টমাহক মিসাইলের একটা। সাধারণ মিসাইলও ছুঁড়তে পারে এ জাহাজ, অতি সহজে ভেদ করতে পারে লক্ষ্য।

জাহাজের বুকের ভিতর রয়েছে কমব্যাট ইনফর্মেশন সেন্টার, নিয়ন্ত্রণ করছে হাইটেক আর্সেনালগুলো। আবছা নীল আলোর নীচে বসে রয়েছেন ক্যাপ্টেন জন মোর্স, দেয়ালে আঁটা প্রকাণ্ড প্রোজেকশন স্ক্রিনগুলোর একটার উপর চোখ। ওখানে হরেক রঙে ফুটে উঠেছে উপসাগরের বিভিন্ন এলাকা। বেশির ভাগ আকৃতি সিম্বল ও জ্যামিতিক। রেইডার সিস্টেম জানান দিয়ে চলেছে, ওগুলো জাহাজ না বিমান। একটা লাল বিন্দু জে এফ কেনেডির গতিপথের দিকে আসছে।

'বারো মাইল দূরে ইন্টারসেপশন, স্যর,' এক অফিসার জানাল। বে-র আরেক মাথায় কম্পিউটার সেন্টারে বসে রয়েছে সে।

'খুব ধীরে আসছে,' বলল আরেক অফিসার। কথা শেষে নিজের মনে ডুব দিল সে। স্ত্রী-সন্তান রেখে এসেছে নিউ ইয়র্কে। ছুটি পেতে অনেক দেরি।

'তিন মাইল দূরে ইরানিয়ান জলসীমা,' ক্যাপ্টেনের পাশ থেকে সাবধান করল তরুণ ট্যাকটিকাল অপারেশন্স অফিসার। 'ওরা যত দ্রুত সম্ভব ইরানের জলসীমায় ঢুকতে চাইছে।'

'খার্গ আইল্যাণ্ডের পর ওদের জায়গা দেবে ইরানিয়ানরা?' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তোমরা নজর রাখো। আমি ব্রিজে চললাম। তোমাদের ওপর নির্দেশ রইল, প্রয়োজনে আঘাত হানতে পারো।'

'আই, ক্যাপ্টেন। কোনও দরকার পড়লে যোগাযোগ করব।'

প্রায় অন্ধকার কমাণ্ড সেন্টার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন মোর্স, উঠে এলেন ব্রিজে। চারপাশে ঝকঝকে সূর্যের আলো। উপসাগরের ঢেউ শান্ত, ওগুলোর গায়ে পড়ে ঝলসে উঠছে সূর্য। এক সোনালী চুল অফিসার হেলম্‌স-এর পাশে দাঁড়িয়ে বিনকিউলারে দেখছে বহু দূরের কালো জাহাজটা।

'ওটাই কি আমাদের টার্গেট, কমাণ্ডার?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

জে এফ কেনেডির চিফ অপারেশন্স ইন্টেলিজেন্স অফিসার কমাণ্ডার পিট থমাস। আস্তে করে মাথা দোলাল।

'জী, স্যর। ওই ড্রিল শিপই। এয়ার রেকন থেকে জানি, ওটা মালয়েশিয়ান জাহাজ। কুয়ালালামপুর থেকে এসেছে। ভূমিকম্পের আগে এই একই জাহাজ দেখেছে আমাদের স্যাটালাইট রাস টানুরা ও খার্গ আইল্যাণ্ডে।'

ফরওয়ার্ড ডেকের দিকে চাইলেন জন মোর্স। ওখানে জটলা করছে মেরিনরা। এরইমধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে অ্যাসল্ট গিয়ার। এবার নামানো হবে জোডিয়াক বোট।

'ওরা তৈরি, স্যর,' বলল কমাণ্ডার থমাস।

রেডিয়ো কমিউনিকেশন অফিসারের পাশে চলে গেলেন মোর্স। জানিয়ে দিলেন কী বলতে হবে। প্রথমে ক্রুজার থেকে ইংরেজি ভাষায় নির্দেশ দেয়া হলো। এর পর আরবিতে। থামতে বলা হলো কালো ড্রিল শিপকে। আমেরিকান সৈন্যরা উঠবে তাদের জাহাজে, তদন্ত করে দেখবে। পাত্তা দিল না ড্রিল শিপ, এগিয়ে চলেছে ইরানিয়ান উপকূলের দিকে।

'স্পিড আগের মতই,' রিপোর্ট করল রেইডার অপারেটর।

'হর্নেটগুলো দেখেনি, তা হতেই পারে না,' বলল পিট থমাস।

বিমানবাহী জাহাজ রোনাল্ড রেইগান থেকে উড়াল দেয় দুটো এফ/এ-১৮৫ এয়ারক্র্যাফট, তার পর থেকে বারবার উড়ছে ড্রিল শিপের উপর দিয়ে।

'মনে হয় গোলা ফেলতে হবে,' বললেন মোর্স। ক্রুজারে রয়েছে বিধ্বংসী দুটো পাঁচ ইঞ্চি কামান।

ড্রিল শিপের দুই মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল ক্রুজার। রেইডার অপারেটর কর্কশ স্বরে বলল, 'গতি কমিয়েছে, স্যর।'

রেইডার স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ক্যাপ্টেন মোর্স। দক্ষিণ দিকে ছুটছে না ড্রিল শিপ।

'ওটার পাশে নিয়ে চলো, মেরিনদের তৈরি থাকতে বলো।'

ধূসর রঙের ক্রুজার আড়াআড়ি ভাবে উত্তর-পুবে রওনা হলো। আর মাত্র আধ মাইল দূরে ড্রিল শিপ। বারোজন মেরিন সহ পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো তিনটে জোডিয়াক। ওগুলো ছুটল কালো জাহাজের দিকে। হঠাৎ আড়ষ্ট স্বরে বলল পিট থমাস, 'স্যর, ড্রিল শিপের স্টার্ন থেকে দুটো নৌকা নামিয়েছে। লোকগুলো বোধহয় জাহাজ ত্যাগ করছে।'

বিনকিউলার নিয়ে চাইলেন ক্যাপ্টেন মোর্স। দুই লাইফবোট ভরা ক্রু তাঁরই জাহাজের দিকে আসছে! ড্রিল শিপের দিকে ফিরে চাইলেন তিনি। ওখানে নীচের ডেক থেকে উঠছে কালো ধোঁয়া। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে লোকগুলো নিজেদের জাহাজে!

'ওরা প্রমাণ রাখছে না,' বললেন তিনি। 'পিট, বোর্ডিং পার্টিকে ফিরিয়ে আনুন।'

ড্রিল শিপ ও ওটার নাবিকদের দিকে চেয়ে রইল জে এফ কেনেডির বিস্মিত নাবিকরা। ড্রিল শিপের ভিতর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। ঝাঁকি খেল জাহাজটা, ডুবতে শুরু করল।

এক মিনিট পেরুলো না, তার আগেই ঢেউয়ের নীচে ডুবে গেল বো। নিশ্চয়ই জাহাজের খোলে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। আকাশে মাথা উঁচু করল স্টার্ন, পরক্ষণে রওনা হলো নীচের দিকে। হুউস্ শব্দে ডুবে গেল জাহাজ। উঠতে লাগল বড় বড় বুদ্বুদ।

আস্তে করে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন মোর্স। 'পেন্টাগন খুশি হবে না। ওরা চেয়েছিল জাহাজটা জব্দ করি আমরা। হারিয়ে গেল নতুন এক টেকনোলজি।'

'ওটার ক্রুদের হাতে পাব আমরা,' হাতের ইশারা করল কমাণ্ডার। দ্রুত ছুটে আসছে দুই লাইফবোট। 'পেন্টাগন চাইলে জাহাজ তুলতে পারে। ডুবেছে ইরানিয়ান জলসীমা থেকে দু' শ' ফুট দূরে।'

'তুলল,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তার পর? জাহাজের সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে ক্রুরা। পাবেটা কী?'

'ছাই ছাড়া কিছুই না!' আস্তে করে মাথা দোলাল কমাণ্ডার।

তেত্রিশ

বারখান খালদুন পাহাড়ের নীচের অংশ এটা। বইছে হু-হু শীতল হাওয়া, কাঁপিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। মঞ্চের সামনে উড়ছে হলুদ নকশা আঁকা লাল-নীল মঙ্গোলিয়ান রাষ্ট্রীয় পতাকা। সবচেয়ে বড় পতাকা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট, উড়ছে প্রকাণ্ড এক কারুকার্যময়

গ্র্যানিট মৌসোলিয়ামের ছাতে। তাড়াহুড়ো করে স্থানীয় শিল্পীরা তৈরি করেছে এ সৌধ। ফাঁকা এ সৌধের চারপাশে জমায়েত হয়েছেন সমাজের অভিজাত সম্মানিত ভিআইপি নাগরিক ও আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথিরা। ভিড় করেছেন সাংবাদিকরা। সবাই নিচু স্বরে কথা বলছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, যে-কোনও সময়ে পৌঁছবে সৌধের মালিক।

হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল সবাই, পরক্ষণে থেমে গেল সব আওয়াজ। পদশব্দ ভেসে এল। এগিয়ে আসছে মঙ্গোলিয়ান আর্মির এক কোম্পানি সৈন্য। বেরিয়ে এল তারা পাইন গাছের আড়াল থেকে। কুচকাওয়াজ করে আসছে সামনের উঁচু জমি লক্ষ্য করে। সেখানে ভিড় করেছে হাজারো মানুষ। অপেক্ষা করছে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সেনাবাহিনীর প্রথম দলটির পিছু নিয়ে এল একের পর কোম্পানি। তারা চেঙ্গিস খানের দেহাবশিষ্ট ঘিরে এগিয়ে এল। আজ থেকে ওই মৌসোলিয়ামে বাস করবেন মঙ্গোলিয়ার সর্বকালের সেরা নেতা।

চিনের উত্তর-পশ্চিমে ওয়াইনচুয়ান-এ এক যুদ্ধে ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হন চেঙ্গিস খান। ক'দিন পর মারা যান। তাঁর দেহ গোপনে নিয়ে আসা হয় মঙ্গোলিয়ায়, এই বারখান খালদুন পাহাড়ে। বারো শ' সাতাশ সালে সমাহিত করা হয়। কীভাবে, কোথায়, তা লেখা নেই ইতিহাসের পাতায়। চেঙ্গিস খানের সহযোগীরা মুছে দেন তাঁর সৌধের অস্তিত্বের সমস্ত প্রমাণ। প্রায় আট শতাব্দী পর আবারও নতুন করে সমাহিত হবেন দুর্ধর্ষ এই যোদ্ধা।

সাধারণ জনগণ দেখবে সেজন্য রাষ্ট্রীয় এক ভবনে রাখা হয় চেঙ্গিস খানের দেহাবশিষ্ট। ওখানে সাত দিন রাখবার পর নিয়ে

আসা হয়েছে এই সৌধে সমাহিত করতে। অবিশ্বাস্য, মঙ্গোলিয়ার তিরিশ লক্ষ জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দেখে গেছে চেঙ্গিস খানের কফিন, মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। খেনতি পর্বতে তাঁর কবরে তিনদিন ধরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। এখানে এসেছে কয়েক লাখ মানুষ। শুভকাঙ্ক্ষীদের হাতে ছিল প্রাচীন এই নেতার প্রতিকৃতি ও রাষ্ট্রীয় পতাকা।

চেঙ্গিস খানের কেইসন পাশ দিয়ে যেতেই হাত নাড়ল শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ। হাহাকার করল অনেকে, যেন প্রিয় আত্মীয়কে শেষবিদায় দিচ্ছে। আজ জাতীয় শোকদিবস ঘোষণা করা হয়েছে। শোকযাত্রার তৃতীয় অংশে সবার পোশাক কালো বর্ণের। গত কয়েকদিন ধরে ঢালু পথ তৈরি করা হয়েছে। সে পথ বেয়ে বারখান খালদুন পাহাড়ের কোলে উঠে এল কারাভাঁ। কথিত আছে এখানেই জন্ম-গ্রহণ করেন চেঙ্গিস খান।

ডিগনিটারিদের সঙ্গে প্রথম সারিতে বসেছে রানা, সোহেল, ববি, জোসেফ কার্ক, গ্রেসি ও উইলসন। কয়েক সিট পরেই মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্টের আসন। তাঁর বামে বসেছেন সাংসদরা। ঘুরে চাইল রানা, ওর পিছনে বসা এক কিশোরকে লক্ষ্য করে চোখ টিপল। হেসে উঠল গান্টামুর। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শোকযাত্রা, সেদিকে মন দিল আবার। রানার বিশেষ অতিথি আজ সে ও তার বাবা-মা। আসবার পর থেকে চারপাশের কর্মকাণ্ড দেখছে ছেলেটা। হঠাৎ বিস্ফারিত হলো তার চোখ, কাছে চলে এসেছে কেইসন। ওই তো! চেঙ্গিস খানের কফিন!

দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা চেঙ্গিস খান, তাঁরই উপযুক্ত ওই প্রকাণ্ড হলুদ কাঠের ওয়্যাগন। সুন্দর ধবধবে সাদা আটটি স্ট্যালিয়ন টেনে চলেছে কেইসন। মনে হলো একইসঙ্গে পা ফেলছে

ঘোড়াগুলো। ওয়্যাগনের উপর হলুদ কফিন, তার ভিতর শুইয়ে রাখা হয়েছে গ্র্যানিটের খণ্ড। ভিতরে রয়েছেন সম্রাট চেঙ্গিস। কফিন ঢেকে দিয়েছে পদ্মফুল

একদল প্রাচীন লামা নিঃশব্দে অবস্থান নিলেন মৌসোলিয়ামের সামনে। পরনে তাঁদের গেরুয়া আলখেল্লা আর হলুদ টুপি। পাহাড়ের উপর থেকে রাডোং বাজিয়ে দিলেন দুই সন্ন্যাসী। চোঙার মত বাদ্যযন্ত্র গভীর, গম্ভীর আওয়াজ তুলছে। উপত্যকার চারপাশে ছড়িয়ে গেল বিষণ্ন সুর। যেন থমকে গেছে উন্মাতাল হাওয়া। লামারা শুরু করলেন প্রার্থনা। দীর্ঘক্ষণ চলল সেই অনুষঙ্গ। তারই ফাঁকে বাজতে লাগল ঢাক, সেই তালে নাচছেন ভিক্ষুরা। চারপাশ ভরে গেল আগরবাতির সুবাসে। অনুষ্ঠানের শেষদিকে ওয়্যাগনের উপর উঠলেন লামারা, খানের কফিনের দু'পাশে অবস্থান নিলেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন মঙ্গোলিয়ার উত্তর অংশের এক যাজক, কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ দাড়ি নেড়ে নাচতে লাগলেন তিনি। পরনে ক্যারিব্যুর চামড়া। বিরাট এক আগুনে ফেললেন ভেড়ার হাড়। তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন। প্রার্থনা করলেন, যাতে প্রশান্তি মেলে খানের দেহাবশিষ্টের। বললেন, যেন নীলাকাশের ওপারে শান্তি মেলে তাঁর আত্মার। যেন জয় করে নিতে পারেন গোটা স্বর্গ।

শোক প্রকাশ ও প্রার্থনা শেষে চেঙ্গিস খানের কফিন তোলা হলো মৌসোলিয়ামের উপর। কফিন ঠেলে নামিয়ে দেয়া হলো গহ্বরে। পাশ থেকে একটা ক্রেন তুলছে পালিশ করা ছয় টন ওজনের পাথর খণ্ড, ঢাকনি হিসাবে নামিয়ে দিল গহ্বরের উপর। ঠিক তখনই বিস্মিত হলো সবাই। সুনীলাকাশ নির্মেঘ, কিন্তু দূর থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের আওয়াজ! যেন আটকে গেল কোনও

দরজা। চেঙ্গিস খান আবারও ফিরেছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে। এ পাহাড়ে চিরদিনের জন্য রইল তাঁর সমাধি। হাজার হাজার বছর ধরে আসবে ট্যুরিস্টরা, আসবেন ইতিহাসবিদরা। মঙ্গোলিয়ার জনগণ আসবে তো বটেই।

মানুষের জটলা মৌসোলিয়াম থেকে সরছে। পিছন সারি থেকে সামনের দিকে এলেন পাভেল রেদোরভ ও আন্দ্রেই আভেতিসিয়ান, বিদায় জানিয়ে এসেছে রাশান অ্যাম্বাসেডরকে।

রেদোরভ হাত মেলালেন রানা, সোহেল, ববি, জোসেফ কার্ক, উইলসন ও গ্রেসির সঙ্গে। হেসে ফেললেন। 'রানা, জানতাম আপনি গুপ্তধন উদ্ধার করতে ওস্তাদ। দ্যানিয়া জাহাজটা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা থেকে শেষ পর্যন্ত এত কিছু?'

'আমাদের কপাল ভালো, মরিনি,' হাসল ববি।

'আমাদের যৌথ রিসার্চ প্রোজেক্ট কিন্তু শেষ হয়নি,' বললেন রেদোরভ। রানার হাত ছাড়ছেন না। 'আসছেন তো বৈকাল হ্রদে? পরের মৌশুমে তৈরি থাকবে দ্যানিয়া।'

'অন্য কাজে আটকা না পড়লে আসতে চাই,' বলল রানা।

'আর কোনও সেইস ওয়েভ না থাকলে,' যোগ করল ববি।

আগের মতই চওড়া হাসি আন্দ্রেইর মুখে। 'দারুণ দেখালেন। রানা-ববি, যোগ দিন আমাদের সিক্রেট সার্ভিসে। এমন মানুষই দরকার রাশার।'

'যোগ্য লোকের এতই অভাব?' হাসছে ববি।

এই প্রথম দেখা গেল খোঁচা খেয়ে ম্লান হলো লোকটার হাসি। হাত নেড়ে ভিড়ের ভিতর কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

এগিয়ে এলেন মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট, দলীয় নেতারা প্রায় ঘিরে রেখেছে তাঁকে। রেদোরভকে দেখে মৃদু হাসলেন। দু'চার

কথা শেষে চলে গেলেন রেদোরভও। প্রেসিডেন্ট মধ্যবয়সী, নিখুঁত ইংরেজি বলেন। 'মিস্টার রানা, মিস্টার ববি, মিস্টার সোহেল—মঙ্গোলিয়ার জনগণের তরফ থেকে ধন্যবাদ নিন। আমরা কখনও ভাবিনি চেঙ্গিস খানকে ফিরে পাব।'

'বর্ণিল ইতিহাস হারিয়ে যাওয়াটা দুঃখজনক,' বলল রানা। 'ভাল হতো যদি সমাধির সমস্ত অ্যান্টিক রক্ষা করা যেত।'

'তা-ই আসলে। হারিয়ে গেছে চেঙ্গিস খানের বিপুল ধনরত্ন, সব ছড়িয়ে গেছে দুনিয়া জুড়ে। জালাইর ও তার ভাই-বোন নিজেদের পকেট ভারী করেছে। কিন্তু বদলে পেয়েছি তেলক্ষেত্র, হয়তো সে টাকা দিয়ে কিছু অ্যান্টিকুইটি কিনে নেব আমরা।'

'আরেকটা সমাধিতে ঘুমিয়ে কুবলাই খান,' মনে মনে বলল রানা। 'কোথায় সে?' চেঙ্গিস খানের মৌসোলিয়ামের দিকে চাইল ও। কারুকার্যময় গ্র্যানিট দিয়ে তৈরি ওটা। রানার চোখ আটকে গেল একটা খোদাইয়ের উপর। একাকী এক নেকড়ে, নীল রঙে আঁকা।

'ওটার আরেক ইতিহাস,' বললেন প্রেসিডেন্ট, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন। 'জালাইর তেমুজিন কিন্তু কুবলাই খানের সমাধি খুঁজে পায়নি। হয়তো ওটাও পেয়ে যাব আমরা।' শ্রাগ করলেন। 'খুবই ভাল হলো আপনারা জালাইরের পরিবারের অন্যায়গুলো তুলে ধরেছেন। সরকারের ভিতর তাদের কী ধরনের হাত ছিল, সেটা তদন্ত করতে বলেছি আমি। একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে জালাইর তেমুজিন, কিন্তু তার সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে সব।'

'বলোর্মা অনেক তথ্য দেবে,' বলল ববি।

'তা তো দেবেই,' হেসে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর জানা আছে, ওই মেয়েকে দেশের সবচেয়ে কঠোর কারাগারে রাখা

হয়েছে। 'ওর সাহায্য তো মিলবেই। আশা করি আরও সাহায্য পাব আপনাদের কাছ থেকে।' গ্রেসি ও উইলসনের দিকে চাইলেন তিনি। 'যে তেলক্ষেত্র আমরা পেয়েছি সেটা কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলব নতুন এক মঙ্গোলিয়া।'

'ইনার মঙ্গোলিয়াকে ফিরে চাইছে না চিন?' জানতে চাইল কৌতূহলী ববি।

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি বড় জটিল, ওই প্রদেশ চাইলেও ফেরত পাবে না চিন। ইনার মঙ্গোলিয়ার জনগণ মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। না, চিন খুশি থাকবে যে আমরা তাদের কম দামে তেল সরবরাহ করব। রাশান বন্দর নাখোদকা পর্যন্ত তেল পাইপ না নেয়া পর্যন্ত এমনই চলবে।' বেশ খুশি মনে হলো প্রেসিডেন্টকে। একবার চট্ করে দেখলেন দূরে দাঁড়ানো রাশান অ্যাম্বাসেডারকে।

'একটা অনুরোধ করব,' বলল রানা। 'আমরা গোবি মরুভূমিতে একটা বিমান পেয়েছি। ভিতরে তিনটে মৃতদেহ ছিল। ভাল হতো যদি সেগুলো যার যার দেশে পাঠিয়ে দেয়া হতো।'

'অ্যান্টিকুইটির ডিরেক্টর আমাকে জানিয়েছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ওই এয়ারক্র্যাফ্ট এক্সকেভেট করবে মঙ্গোলিয়ান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল। মৃতদেহগুলো যেন তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, সেটা আমরা দেখব।'

এক এইড প্রেসিডেন্টের কোটের আস্তিন ধরে টান দিলেন। সবার উদ্দেশে মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট এরিক বোক। 'ভাল থাকুন আপনারা। আশা করি আবার দেখা হবে।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, চলেছেন রাশান অ্যাম্বাসেডরের দিকে। হঠাৎ থমকে ঘুরে চাইলেন রানার চোখে। 'আপনার জন্য সামান্য উপহার। শুনেছি এ জিনিস

আপনার খুব প্রিয়।' টিলার দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি, জিনিসটা দেখিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

টিলার কোলে দাঁড়িয়ে একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। তার উপর তারপুলিন দিয়ে ঢাকা বড়সড় কিছু। ওদিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইল ওরা। দুই কর্মীকে নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছে কেউ, তারা সরিয়ে নিল তারপুলিন। কড়া রোদে দেখা গেল সেই ধুলোভরা রোলস্ রয়েস।

'অবসরে নতুন করে গড়ে তুলবেন,' বললেন জোসেফ কার্ক।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'চল্ যাই?' বলল সোহেল।

নড়ল না রানা।

তিন সপ্তাহের জন্য ছুটি পেয়েছে রানা ও ববি। সোহেলকে বুড়োর খুবই দরকার—আগামীকাল দেশে ফিরছে ও।

'একটা ভালুকের জন্য ভাল নার্স দরকার,' হঠাৎ বলল রানা। চোখ হাসছে। 'গ্রেসি, তুমি কি ববিকে সঙ্গে নেবে? ভালুক সুস্থ হলে দায়িত্ব নেবে ওর অফিস।'

'মন থেকে চাইছি আমার সঙ্গে থাকুক,' লাজুক হাসল গ্রেসি।

ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ববি, ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মোড়ানো পা। সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল।

ছুটি কাটিয়ে নুমা হেডকোর্টারে ফিরবে ববি, মঙ্গোলিয়ায় ফিরবে গ্রেসি। উইলসন ও কার্ক ফিরছেন আমেরিকায়।

পাশ দিয়ে আবারও চলেছে আন্দ্রেই, হঠাৎ থেমে বলল, 'মঙ্গোলিয়ান এনার্জি মিনিস্টারের কাছে শুনলাম এক দিনে তেলের দাম কমেছে বিশ ডলার। বরজিন অয়েল কোম্পানি লাল বাতি জ্বেলেছে শুনেই বোধহয়। সবাই জেনে গেছে কারা ভূমিকম্প

তৈরি করত। এটাও জেনেছে ইনার মঙ্গোলিয়ায় বিপুল ক্রুড পাওয়া গেছে।' দ্রুত পায়ে চলে গেল আন্দ্রেই।

'তা হলে হয়তো রিসেশন হবে না,' বলল সোহেল।

'তবে শিক্ষা হলো সবার,' বললেন উইলসন। 'নিশ্চয়ই এবার জোরেশোরে তৈরি করতে চাইবে রিনিউয়েবল এনার্জি।'

'তা করবে না,' বললেন জোসেফ কার্ক। 'ক্রুড অয়েল যতদিন থাকবে, ততদিন গা নাড়বে না কেউ। মানুষ এমনই। শুনলাম পেন্টাগন খুব না-খোশ আপনাদের উপর। ওরা ভেবেছিল, অন্তত একটা সাইসমিক ডিভাইস পাবে।'

'পেলে ব্যবহার করত অন্য দেশ ধ্বংসের কাজে,' স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা।

মুখ কালো করল না ববি, তবে বলল, 'এ জটিল প্রসঙ্গ বাদই দাও না হয়।'

জোসেফ কার্ক বলে উঠলেন, 'নুমা একটা সাইসমিক অ্যারে পেত আরেকটু হলে। হাওয়াই-এ আমাদের একটা দল জালাইর তেমুজিনের ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে। ওই লোক আলাস্কা পাইপ-লাইন ধ্বংস করতে রওনা হয়েছিল। কিন্তু জাহাজটা ডুবে যায়। ডুবুরি নামিয়ে দেখা গেছে, জাহাজের নীচে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে সাইসমিক অ্যারে!'

'খানিকটা শুনেছি,' বলল রানা। 'সমুদ্রের নীচে প্রাচীন চিনা জাহাজ পেয়েছে মিতা আর রাশেদ। জালাইরের ভাই ওটা দখল করতে চেয়েছিল।' দূর পাহাড়ে চোখ রাখল রানা, কেমন আনমনা হয়ে গেল। কী যেন মনে আসতে চাইছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখদুটো।

'আমরা যদি সাইসমিক অ্যারের রিসার্চ মেটারিয়াল পেতাম,

আফসোস করলেন কার্ক। 'সব শেষ হয়ে গেল জালাইরের ল্যাবোরেটরির সঙ্গে।'

'তাই আসলে,' বলল ববি। 'সোহেলের কাছে যে ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল, ওটাও নষ্ট। কপাল মন্দ।'

কারও বলবার মত কথা নেই। ভেঙে গেল ওদের জটলা।

টিলার দিকে হাঁটছে রানা ও সোহেল। চলে গেল ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের কাছে। সোহেল হঠাৎ বলল, 'তুই তো জানিস, ডিজিটাল ক্যামেরা বিসিআইয়ের হাতে পৌঁছে গেছে। নুমা আর সিআইএ-র হাতে গেছে নষ্ট একটা। কিন্তু যদি ফিরে পেতাম ওই ম্যানুয়ালটা!'

'ওটা নেই তা কে বলেছে তোকে?' মৃদু হাসছে রানা। লাফ দিয়ে উঠল ট্রাকের উপর।

'আছে? পানিতে নষ্ট হয়নি? আগে তো বলিসনি!'

'ওটা ছিল নাগালের বাইরে।'

'তবে তো ফ্রেডারিখ ফন বোমারের কাজ অনুসরণ করা যায়!'

রোলস রয়েসের লাগেজ র‍্যাক খুলে ফেলল রানা, হাতড়ে দেখল বড়সড় চামড়ার ট্রাঙ্ক। ওটার মেঝে থেকে তুলে নিল অপারেটরের ম্যানুয়াল। এখনও তীরবিদ্ধ!

নিচু স্বরে শিস দিয়ে উঠল সোহেল। 'চল্, রওনা হয়ে যাই। পরে ওরা গাড়িটা পৌঁছে দেবে তোকে।'

ট্রাক থেকে নামল রানা, ম্যানুয়াল থেকে খুলে ফেলল তীরটা, পরক্ষণে প্যান্টের পকেটে চলে গেল অপারেটরের ম্যানুয়াল।

ভাড়া নেয়া জিপের দিকে পা বাড়াল ওরা। সোহেল বলল, 'ছুটি কোথায় কাটাবি, রানা?'

চট্ করে চেঙ্গিস খানের মৌসোলিয়ামের দিকে চাইল রানা, তারপর বলল, 'খুঁজে বের করব একাকী এক নেকড়েকে!'

চৌত্রিশ

ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, কিন্তু গরম কাটছে না। পাথুরে লাভার অঙ্গুলি কাহাকাহাকেয়া পয়েন্ট, ওটা ঘুরে কেলিউলি কোভের দিকে চলেছে নুমার জাহাজ লিংকন। সামনে কোভের মুখে ভাসছে লাল এক বয়া। সত্তর ফুট নীচে ডুবেছে বরজিন অয়েল কোম্পানির ড্রিল শিপ। ওটা পাশ কাটিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন জেমস পার্কার। সামনে অগভীর সাগর, আর এগুতে সাহস পেলেন না। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল জাহাজের, ফেলা হলো নোঙর।

'কেলিউলি বে,' ব্রিজে ঘোষণা দিলেন পার্কার। ঘুরে চাইলেন।

'পৌঁছে গেলাম।' মেহগনি কাঠের টেবিলে বিগ আইল্যাণ্ডের চার্ট, ঝুঁকে দেখছে মাসুদ রানা। পাশেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস। আরেক পাশে মোড়ানো চিতার চামড়া। ওটা পেয়েছে রানা গোবি মরুভূমির ভিতর, ভূপাতিত বিমানে। টেবিলে ওর পাশে বসেছে রাশেদ ও মিতা। চোখে কৌতূহল।

আজ ভোরে হাওয়াই এসে পৌঁচেছে রানা। উলানবাটোর থেকে ইরকুতস্ক, সেখান থেকে টোকিও, তারপর হনলুলু। সকাল ন'টায় উঠেছে নুমার জাহাজে। তখন ডাইনিং হলে ছিল মিতা, সামনে ডায়রি। লিখছে:

আমি একা আছি চন্দন-বনে, পর্ণকুটিরে হতভাগী,

যদি ফেরে সেই স্বপ্নসখা, পথ চেয়ে আছি তার লাগি।

আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কখন যেন নিঃশব্দে মাসুদ ভাইকে নিয়ে হাজির হয়েছে রাশেদ।

'কীরে, কবিতা চলছে বুঝি?' জানতে চেয়েছে রাশেদ, সঙ্গে আবার গা জ্বালিয়ে দেয়া হাসি!

ঝট্ করে খাতা লুকাতে চেয়েছে মিতা। হয়ে ওঠেনি। ওটা কেড়ে নিয়েছে রাশেদ। মাসুদ ভাইকে পড়ে শুনিয়েছে।

লজ্জায় লাল হয়েছে মিতা।

'শুরুটা শুনে তো মনে হচ্ছে ভাল কবিতা দাঁড়াবে,' শুধু এটুকু বলেছে রানা।

ওর গভীর কালো চোখদুটো একপলক দেখেছে মিতা, তারপর চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

'দুই ঘণ্টা পর ব্রিজে এসো, সারপ্রাইজ দেব,' বলে ডাইনিং হল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রানা।

সংক্ষিপ্ত রিসার্চ ওর শেষ, উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। 'তেমুরের সঙ্গে এখানে লড়াই হয় তোমাদের?'

'জী,' বলল রাশেদ। 'ড্রিল শিপের উপর মার্কার বয়া রেখেছে মিতা। আর প্রাচীন চায়নিজ জাহাজ কোভের ঠিক মাঝখানে।' জানালা দিয়ে ডানদিক দেখিয়ে দিল সে।

'যে আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছ, সব তেরো শতাব্দীর?' জানতে চাইল রানা।

'এখন পর্যন্ত,' বলল মিতা। 'সমস্ত সিরামিক সুং ডাইন্যাস্টির, তা নয়। কিছু আছে ওয়াইউয়ান ডাইন্যাস্টির। কাঠ যা পাওয়া গেছে, সব বারো শ' আশি সালের। আমরা খোঁজ নিয়েছি,

চায়নিজ লংজিয়াঙ্গ শিপইয়ার্ড ওই এলম্ কাঠ জাহাজে ব্যবহার করত। এটাও একটা প্রমাণ।'

'স্থানীয় জিওলজিকাল রেকর্ড ঘেঁটেছি,' বলল রাশেদ। 'যেহেতু জাহাজকে ঢেকে দিয়েছে লাভা-স্তর, বিগ আইল্যাণ্ডের ভলক্যানিক ইরাপশনগুলো খেয়াল করেছি। এদিকে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ আগ্নেয়গিরি কিলাউয়ে। এ ছাড়া হুয়ালালাই আর মৌনা লাও বারবার লাভা উদ্গিরণ করে। আমাদের কাছাকাছি হলো মৌনা লাও, ওটা গত দেড় শ' বছরে ছত্রিশবার লাভা উগরেছে। এর আগে প্রতি শতাব্দিতে লাভা ছিটিয়েছে। স্থানীয় জিওলজিস্টরা সাগরের-তলের চারকোলের স্যাম্পল রেডিয়োকার্বন ডেট পরীক্ষা করেছে। কাছের পোহুয়ে বে-তে একটা স্যাম্পল থেকে জানা গেছে, লাভার বয়স আট শ' বছর। জানি না ওই লাভা এসে এ কোভে পড়ে কি না, বা ডুবিয়ে দেয় কি না ওই জাহাজ। কিন্তু হতে পারে তা-ই ঘটেছে। আর তা-ই যদি হয়, আমাদের জাহাজের জন্ম তেরো শ' শতকে।'

'এই চিতার চামড়া আর এদিকের উদ্গিরণ, দুটোর মধ্যে কীসের সম্পর্ক, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল মিতা।

'মুখে বলা কঠিন।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু এসব ছবি বলছে এক দীর্ঘ অভিযানের কথা। তার সঙ্গে মিলে যায় এদিকের উদ্গিরণ। ডুবে যাওয়া চায়নিজ জাহাজ ছিল বিশাল। চারটে মাস্তুল ছিল। জিনিসটা চায়নিজ জাঙ্ক। তোমাদের আবিষ্কৃত জাহাজের সঙ্গে মেলে ওই ছবিগুলো। তোমরা তো হাল পেয়েছ। শুনেছি ওটা প্রকাণ্ড?'

'জী,' বলল রাশেদ।

'চিতার চামড়ার উপর আরও কিছু লেখা থাকলে ভাল হতো।

আছে শুধু, এক দীর্ঘ অভিযানে চলেছে তারা, যাবে স্বর্গে।'

চেয়ারে বসে পড়ল রানা, চিতার চামড়ার দুই ডিমেনশনাল আর্টিস্ট্রির উপর চোখ। কয়েকটা ছবিতে পরিষ্কার দেখিয়েছে—চার মাস্তুলওয়ালা প্রকাণ্ড এক জাঙ্ক পাল তুলে চলেছে। দু'পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো জাহাজ। কয়েকটা ছবিতে জাহাজগুলো এগিয়ে চলেছে সাগর চিরে। তারপর জাহাজ পৌঁচেছে আটটি দ্বীপের কাছে। তার মধ্যে বড় একটা দ্বীপের আকৃতি ঠিক বিগ আইল্যাণ্ডের মত। উঁচু টিলার নীচে বড় এক গুহা, তার সামনে থেমেছে তিন জাহাজ। টিলার কোলে নামানো হয়েছে অসংখ্য ক্রেট। চারপাশে কালো ধোঁয়া। চারদিক জ্বলছে। আগুন ধরেছে বড় জাহাজেও, মাস্তুলে জ্বলছে পতাকা। ওটা কৌতূহল জাগায়।

'ছবি দেখলে মনে হয় চারপাশে জঙ্গল, তার ভিতর আগুন ধরেছে। এটা মস্ত ধোঁকা দেবে চোখকে,' বলল রানা। 'আসলে আগুন নয়, লাভা উদ্গিরণ করে আগ্নেয়গিরি।'

'আর ওসব ক্রেট?' বলল মিতা। 'নিশ্চয়ই ভিতরে গুপ্তধন? আপনি ফোনে বলেছেন, জালাইর তেমুজিন ও তার ভাই-বোন জানত চায়নিজ জাহাজে কী থাকবে। আর তা-ই লাভা সরাতে চেয়েছিল তেমুর।'

'লোকটা বোকামি করেছে,' বলল রানা। 'ট্রেজার, বা যাই থাক, জাহাজে ছিল না। ছবি বলছে আগেই তীরে সরিয়ে নেয়া হয় মালামাল। এরপর ধ্বংস হয় জাহাজ।'

'ধ্বংস হয়ে যায়?' একটু মনমরা হলো রাশেদ।

'তাই তো হবে, বুঝিস না? লাভার স্রোতের ভিতর টিকবে কী করে?' এখনও ভাইয়ের উপর রেগে আছে মিতা।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে শেষ ছবিটা দেখছে রানা। কালো

পাথর ঘিরে ধরেছে বাক্সগুলো। দূরে ধোঁয়া, কিন্তু কোনও ক্রেট পুড়ছে না।

রানার পাশ থেকে খেয়াল করছে মিতা। বলল, 'কোনও ক্রেটে আগুন নেই। ক্রেটগুলো কি উদ্ধার করা সম্ভব, মাসুদ ভাই?'

'চেষ্টা তো করবই। চলো, পানিতে নেমে দেখি কী পাই।'

'লাভার নীচ থেকে উদ্ধার করা? কী করে সম্ভব?' প্রায় প্রতিবাদ করে উঠল রাশেদ।

'একটু ধৈর্য ধরো,' উঠে দাঁড়াল রানা। দুই স্যাঙাতকে নিয়ে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল।

আশা-আকাঙ্ক্ষা জমেছে রাশেদ ও মিতার মনে। একই সঙ্গে জাগছে সন্দেহ। মাসুদ ভাই কি পারবেন ওগুলো উদ্ধার করতে?

রানার পিছু নিয়ে জাহাজের স্টার্নে চলে এল দু'জন। তিনটে ডাইভ গিয়ার নিল ওরা, রাখল জোডিয়াকের উপর। ওদের সহ সাগরে জোডিয়াক নামিয়ে দিল ফকম্যান। ছুঁড়ে দিল বোটের দড়ি, কৌতুক করতে চাইল, 'যে আগে মিং ভাস পাবে, তাকে এক বোতল টাকিলা দেব।'

'সুইস আইসক্রিম আমার জন্য,' পাল্টা জানিয়ে দিল মিতা।

জোডিয়াক নিয়ে তীর লক্ষ্য করে রওনা হলো রানা। আড়াআড়ি ভাবে কোভের ভিতর দিকে চলেছে। ডানদিকের সার্ফ লাইনের কাছে থামল, নামিয়ে দিল নোঙর। ডাইভ গিয়ার পরে নিল ওরা।

'আমরা সার্ফ লাইন ধরে বামে এগুব,' বলল রানা। 'আমার পিছনে আসবে তোমরা।'

'আমরা ঠিক কী খুঁজব?' জানতে চাইল রাশেদ।

'সরাসরি স্বর্গে উঠবার পথ,' রহস্য-ঘেরা হাসি রানার ঠোঁটে। মাস্ক পরে নিল, পরক্ষণে নেমে পড়ল সাগরে। ডুবে গেল। মাস্ক ও রেগুলেটর অ্যাডযাস্ট করল মিতা ও রাশেদ, তারপর নামল ওরাও।

মাত্র বিশ ফুট নীচে সাগর-তল। ঢেউ উত্তাল, চারপাশ আঁধার করছে কয়েক পরার্ধ বালি-কণা। পাথুরে তীর, আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ফুঁসে উঠছে ফেনা, সাগরে ফিরছে বালি নিয়ে। সামনে বড়জোর তিন ফুট দেখা যায়। রানাকে পাশেই পেল মিতা। মানুষটা হাতের ইশারা করল, তারপর এগুতে শুরু করল। পিছু নিল মিতা। জানে, পিছনে আসবে ওর ভাই।

সাগর-তল খোঁচা-খোঁচা কালো লাভা দিয়ে ভরা। সামনে ও বামে রুক্ষ টিলা। পানির নীচে জোরালো স্রোত। ধাক্কা দিয়ে চলেছে ওদের। টিলার উপর আছড়ে ফেলতে চাইছে। বাধ্য হলে সাগরের দিকে ঘুরছে মিতা, স্থির থাকতে চাইছে, তারপর সুযোগ বুঝে আবার এগিয়ে চলেছে।

রানার ফিন অনুসরণ করছে মিতা, বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। কোথায় চলেছে জানে না। তারপর হঠাৎ সামনে থেকে অদৃশ্য হলো মাসুদ ভাই। চারপাশে শুধু সাগরের ঘোলা পানি। আন্দাজ করল মিতা, কোভের অর্ধেক পথ পেরিয়েছে। আরেক অংশ এখনও দেখা হয়নি। ঠিক করল, আর দশ মিনিট এগুবে, তারপর ক্ষান্ত দেবে। ভেসে উঠে দেখবে কোথায় পৌঁচেছে।

সার্ফ লাইন অনুসরণ করছে, ডানদিকে পড়ল এবড়ো-খেবড়ো এক টিলা—ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সাগরে। ফিন নেড়ে সরতে চাইল মিতা, কিন্তু বিস্মিত হলো। স্রোত টেনে নিয়ে ফেলতে চাইছে টিলার উপর! সামলে নিতে পারল না, তার আগেই পিঠ

দিয়ে পড়ল লাভার প্রাচীরের উপর। পাথরের সঙ্গে ঠনাৎ করে লাগল স্টিলের ট্যাঙ্ক।

টিলার সঙ্গে মিতাকে গেঁথে ফেলেছে ঢেউ। অপেক্ষা করবার ফাঁকে ভাবল ও, কপাল ভাল আহত হইনি। ঢেউ চলে যেতেই সরে এল। ঘুরে চাইতেই চোখে পড়ল টিলার উপরের অংশ। ওর মাথা থেকে খানিক উপরে কালো এক বড়সড় গর্ত। কাছে চলে গেল মিতা। ভাবছে, এ কীসের গর্ত? মন বলছে, কালো কোনও টানেল। উপরের দিকে উঠেছে। তীরের দিকেই গেল? ঘোলাটে পানির ভিতর বেশিদূর চোখ চলে না। ডাইভ-ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল মিতা, আলো ফেলল ভিতরে। বোধহয় গভীর টানেল! আলো কোথাও বাধা পাচ্ছে না।

ধক্-ধক্ করছে মিতার বুক, মন বলছে এটাই খুঁজেছেন মাসুদ ভাই! একহাতে টানেলের মুখ ধরল ও, ঢুকবে কি না বুঝতে পারছে না। আবার এল বিরাট এক ঢেউ। ওটা পেরিয়ে যেতেই ট্যাঙ্কের সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট আটকে নিল মিতা, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে চলে এল রাশেদ। আবছা আলোয় বোনের দিকে চাইল। হাতের ইশারা করল মিতা, বলতে চাইছে, চল্ এগিয়ে যাই। পরিষ্কার বুঝছে, লাভা দিয়ে তৈরি এই টিউব। দেয়ালগুলো গোলাকার। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কোনও মেশিন দিয়ে কেটেছে কেউ। আসলে গরম লাভা ওটার ভিতর দিয়ে নেমেছে সাগরে। একটা খোসার মত রয়ে গেছে টিউবটা। প্রায়ই দেখা যায় এ জিনিস। কোনও কোনওটা পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কয়েক মাইল লম্বা টিউব আগেও দেখেছে মিতা। সেটা ছিল ছয় ফুট ডায়ামিটারের।

ডেপথ্ গজ দেখল মিতা। তিরিশ ফুট নীচে চলে এসেছে ওরা। বাঁকা পথ সামনে উঠে গেছে। খানিক এগুনোর পর হঠাৎ চওড়া হলো টিউব, তারপর মিলিয়ে গেল। পায়ের নীচে পাথুরে মেঝে। ভেসে উঠল ওরা। ট্যাঙ্ক থেকে টর্চ খুলে নিল মিতা, চারপাশে ফেলল আলো।

এটা যেন পাতালপুরি! তার ভিতর ছোট কোনও নোনা সরোবর! কুচকুচে কালো পানি, একটুও নড়ছে না। উপরের দিকে টর্চ তাক করল ওরা। অনেক উপরে ছাত, গ্র্যানিট দিয়ে তৈরি। এ গুহাকে তিনদিক দিয়ে ঘিরেছে দেয়ালগুলো। অন্যদিকে বেশ গভীর গুহা। তার খানিক আগেই থমকে গেছে সরোবর, ওদিকে শুকনো উঁচু মেঝে। সাঁতার কেটে ওইদিকে চলল দু'জন। একমিনিট পেরুনোর আগেই তীরে পৌঁছে গেল, দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে এল মেঝের উপর। মুখ থেকে রেগুলেটর খুলে ফেলল।

'অদ্ভুত,' বলল মিতা। 'পানির নীচে গুহা, তার মুখ থেকে নেমেছে লাভার টিউব।' নাক কুঁচকে গেল ওর। বাতাস গুমোট। তাতে বিশ্রী গন্ধ। গন্ধক পুড়লে যেমন হয়। আবার রেগুলেটর পরে নিল ও।

গুহার ভিতর দিক থেকে বলে উঠল রানা, 'আগে এ গুহা প্রকাণ্ড ছিল। কিন্তু টিলা থেকে লাভা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'আগে কখনও কোনও গুহার মুখে লাভার টিউব দেখিনি,' বলল রাশেদ।

'এখানে গুপ্তধন আছে?' বেসুরো স্বরে বলল মিতা।

একদম চুপ রানা, কিছুই বলছে না। তার পর মৃদু হাসল। 'হয়তো।'

ট্যাঙ্ক ও ওয়েইট বেল্ট মেঝের উপর ফেলল রাশেদ, জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে চারপাশ দেখছে। গুহার খানিক দূরে কী যেন চোখে পড়ল। 'দেখেছিস্, মিতা!' অবাক হয়ে বলে উঠল ও।

চমকে গেছে মিতা, অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে ও!'

ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে লোকটা!

'মাটি দিয়ে তৈরি যোদ্ধা,' বলল রাশেদ।

সামনে আলো ফেলল মিতা, ওই যোদ্ধার একটু দূরে আরেকজন! প্রমাণ আকৃতির মূর্তি! রঙের পোঁচ দিয়ে তৈরি ইউনিফর্ম, হাতে মাটির তলোয়ার। মাথা ভরা চুল। চওড়া গোঁফ। কাঠ-বাদামের মত চোখ। একেবারে মঙ্গোল চেহারা। যত্নের সঙ্গে তৈরি করেছে শিল্পী। মূর্তিগুলো অবাক হয়ে দেখছে মিতা।

আনমনে বলল রাশেদ, 'তেরো শ' শতকের মাটির যোদ্ধা?'

রানার দিকে চাইল মিতা, 'এরা এখানে কেন, মাসুদ ভাই?'

যোদ্ধাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মূর্তি দুটোর মাঝখান দিয়ে গেছে সরু এক গলি। দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে দেয়াল। 'এসো, এরা পথ দেখিয়ে দেবে অন্য এক জগতে যাওয়ার।' পা বাড়াল রানা।

পিছু নিল রাশেদ ও মিতা।

বারকয়েক বাঁক নিল সরু গলি, তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে গেল—সামনে প্রকাণ্ড এক কক্ষ! ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে পুরো দেখা গেল না। সামনে ও দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে একের পর এক যোদ্ধা—সব মাটির। কণ্ঠে ঝুলছে ভারী সোনার নেকলেস, হাতে পুরু সোনার বালা, তার উপর পান্না-হীরা বসানো। সামনের যোদ্ধাদের পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। একটু যেতেই পড়ল গোল হয়ে দাঁড়ানো কিছু মূর্তি—বিভিন্ন প্রাণীর। সব প্রমাণ আকৃতির।

মূল্যবান জেড বা অন্য কোনও পাথর দিয়ে তৈরি, সোনায় কারুকার্যময়। চোখ ধাঁধিয়ে দিল সোনার তৈরি প্রকাণ্ড এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ ও মাদি ঘোড়া! চোখগুলো বৈদূর্য-মণির; জ্বলজ্বল করছে আলো পড়ে!

ঘোটকীর মূর্তি পেরিয়ে সামনে পড়ল চৌকো এক ল্যাকার করা টেবিল। এক মাথায় বিশাল এক সিংহাসন। তাতে বসানো সোনার পাত ও মণিমুক্তা। দু'পাশে সেগুন কাঠের চেয়ার। প্রতিটির সামনে সোনার ম্যাট্রেস। তার উপর বাসন-জগ-পাত্র-গ্লাস-ফুলদানী, সব সোনার তৈরি!

টেবিল পাশ কাটিয়ে একপাশে দশটা বড় কেবিনেট। সবই ধুলো-মাখা। কেবিনেটের মাথার উপর রাখা সোনা ও রূপার অলঙ্কার, তাতে আরবি ও চায়নিজ স্ক্রিপ্ট। দু' পাশে ছোট কিছু টেবিল, তার উপর চকচক করছে আয়না, ছোট বাক্স, ছোটখাটো শিল্প ইত্যাদি। ওগুলোর উপর বসানো নীল ও হলুদ হীরা। একটা কেবিনেটের সামনে থামল মিতা। ওটার উপর আঁকা যুদ্ধের দৃশ্য। একটা ড্রয়ার টেনে খুলল। প্রথম ট্রে দেখেই বিস্ফারিত হলো ওর চোখ। অ্যাম্বার, স্যাফায়ার, রুবি, সাদা ও নীল হীরা—কী নেই সিল্কের উপর!

এসব যেন টানছে না রানাকে, আর্টিফ্যাক্টের দিকে খেয়াল নেই, চেয়ে রয়েছে চেম্বারের মাঝখানে। ওখানে উঁচু এক পাথুরে মঞ্চ! তার উপর রাখা হলুদ রঙের লম্বা এক বাক্স। প্যানেলগুলো খোদাই করা। মঞ্চের সামনে চলে গেল রানা, ফ্ল্যাশলাইট তুলে বাক্সের উপর ফেলল আলো। এক পাশে স্টাফ করা এক নেকড়ে, সামনের দুই পা খামচে ধরছে বাতাস। চোখে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, বেরিয়ে এসেছে দাঁতগুলো। বাক্সের উপর দিকে আলো ফেলল

রানা। মৃদু হাসল ও নীল নেকড়ের ছবিটা দেখে।

'এসো, ওয়াইউয়ান সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের,' বলল রানা। 'এরা রাশেদ আর মিতা; আর ইনি হচ্ছেন কুবলাই খান, দি গ্রেট।'

ওর পাশে এসে থামল রাশেদ ও মিতা। 'আমি শুনেছিলাম চেঙ্গিস খানের কাছাকাছিই কোথাও কবর দেয়া হয়েছিল তাঁকে,' বলল রাশেদ।

'কিংবদন্তী তা-ই বলে। কিন্তু সে গল্প ঠিক বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। জালাইরের দাদা নকশা চুরি করে চেঙ্গিস খানের সমাধি পেল। কিন্তু কখনও কুবলাই খানকে খুঁজে পায়নি। সাইসমিক ডিভাইস দিয়ে চেষ্টা করেছে জালাইর। তাকে মেনে নিতে হয়েছে, আশপাশে নেই ওই সমাধি। এরপর এখানে হাজির হলো ডক্টর ঈ-র ছদ্মবেশে জালাইরের ভাই তেমুর। আলাস্কা পাইপ-লাইন ধ্বংস করতে রওনা হয়েও এখানে এসে থেমে গেল সে। এর আগে ওরা মঙ্গোলিয়ায় খালি একটা সমাধি পায়। তখনই বোঝে মঙ্গোলিয়ায় নেই কুবলাই খান, আছেন অন্য কোথাও। তেমুর বুঝতে পারে, রাজকীয় জাহাজ নিশ্চয়ই এই বিগ আইল্যাণ্ডে এসেছিল, কাজে কাজেই এখানে পাবে কুবলাই খানকে।'

'মঙ্গোলিয়ায় নেই, কিন্তু এখানে এল, সেটা হলো কী করে?' জানতে চাইল মিতা।

'চিতার চামড়াটা পাওয়া যায় সান-তু এক্সকেভেশনের সময়,' বলল রানা। 'ওটার সঙ্গেই যোগাযোগ কুবলাই খানের। এই সম্রাট শিকার করার সময় পোষা চিতা ব্যবহার করতেন। ওই চামড়া বোধহয় এসেছে তাঁর কোনও মরা চিতা থেকে। এক্সকেভেশনের শেষদিন ওটার সঙ্গে পাওয়া যায় সিল্কের একটা মানচিত্র। ওটা

থেকে বোঝা যায় কোথায় আছেন চেঙ্গিস খান। জালাইর তেমুজিনের দাদা সিল্ক চুরি করল, হাজির হলো মঙ্গোলিয়ায়। যে কারণেই হোক, চিতার চামড়া তার আকর্ষণীয় মনে হয়নি। কিন্তু নীল নেকড়ে আমাকে টানল।'

'কীসের নীল নেকড়ে, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল মিতা।

'ওটা একটা মোটিফ।' কফিনের উপরের নক্সা দেখিয়ে দিল রানা। 'রাজকীয় খানদের। চেঙ্গিস খানের হাত থেকে এসেছে এ জিনিস। যদি খেয়াল করো চিতার চামড়া, প্রকাণ্ড জাহাজের মাস্তুলে দেখবে পতাকা। তাতে আঁকা এক নীল নেকড়ে। রাজকীয় কোনও খান জাহাজে না থাকলে ওই পতাকা ওড়ানো হতো না। তোমরা যে জাহাজ পাও, সেটার সঙ্গে চিতার চামড়ার ছবি একদম মেলে। চেঙ্গিস খান মারা যাওয়ার পঞ্চাশ বছর পর চিন ছাড়ে ওই জাহাজ। কাজেই ওটা চেঙ্গিস খানকে বহন করছে না, এ ধরেই নেয়া যায়। আমি ধরে নিই, কুবলাই খানকে নিয়ে আসে জাহাজ। চিতার চামড়া বলে দিয়েছে, তাঁর শেষ যাত্রা ছিল এই দ্বীপে।'

'কিন্তু হাওয়াই দ্বীপে কেন?' কফিনের উপর আলো ফেলল মিতা। ফ্ল্যাশলাইটে দেখা গেল কফিনের পাশে মোচড়ানো একটা লাঠি। ওটা থেকে ঝুলছে হাঙরের দাঁত দিয়ে তৈরি নেকলেস।

'কুবলাই খানের শেষ দিকের দিনগুলো ছিল কষ্টকর। হয়তো তখনই সিদ্ধান্ত নেন, বহু দূরের এক অদ্ভুত সুন্দর দেশে যাবেন। যে দেশ স্বর্গের মত।'

'মাসুদ ভাই, আপনি জানলেন কী করে আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্‌গিরণ করবার পরও...' থেমে গেল রাশেদ। বড় করে শ্বাস নিল।

'যে-লোক চিতার চামড়ার উপর ছবি এঁকেছে, সে এ সমাধি ঘুরে দেখে গেছে। লাভা তাকে গ্রাস করেনি। ছবির ক্রেটগুলো পুড়ে যায়নি। আমার এই গুহার মুখে ঢোকা, বলতে পারো একটা জুয়াখেলা। আট শ' বছর আগে এখনকার চেয়ে অনেক নীচে ছিল সাগর। ধারণা করি, সেই গুহার মুখ এখন তলিয়ে গেছে সাগরের নীচে।'

'সারাজীবন যত ধনরত্ন লুটপাট করেছে, সব নিয়ে এসেছে,' বলল রাশেদ। চারপাশ দেখছে। তিক্ত স্বরে বলল, 'সব পড়বে এখন আমেরিকার হাতে! কপাল আর কাকে বলে!'

'ওরা কোনদিনই নিজেদেরকে বদলে নেবে না—কোনও না কোনও দেশকে জড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করবে,' বলল মিতা। 'আরও টাকা চাই তাদের, আরও ক্ষমতা!'

'আমেরিকা-বিরোধী হয়ে গেলে দু'জন?' মিটিমিটি হাসছে রানা।

'আসলে কেমন যেন লাগছে,' বলল রাশেদ। 'আমেরিকার তো অনেক আছে। আমাদের জন্মভূমি তো কিছুই পায়নি। যদি পারতাম, সব বাংলাদেশে নিয়ে যেতে!'

'বোধহয় সম্ভব না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তবে...' থেমে গেল। আর কিছুই বলছে না।

'তবে কী, মাসুদ ভাই?' অধৈর্য হয়ে উঠল মিতা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানেন কী পাওয়া যেতে পারে। কাজেই আমেরিকান সরকারকে দুটি প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এক. কুবলাই খানের কফিন ফেরত যাবে মঙ্গোলিয়ায়, দুই...' একটু থামল রানা। 'বলো দেখি কী?'

মাথা নাড়ল দুজনই। পারবে না।

'প্রথম প্রস্তাবে কারও কোনও আপত্তি নেই, মঙ্গোলদের হিরো ওদের কাছে যাবে... যাক। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে ক্যাবিনেট মিটিঙে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট কথা দিয়েছেন: আমরা যদি সত্যিই হাওয়াই-এ কুবলাই খানের গুপ্তধন পাই, তার বড় একটা অংশ পাবে বাংলাদেশ।'

খপ্ করে রানার হাত ধরল মিতা, প্রায় নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফেলেছে ওকে। 'সত্যিই, মাসুদ ভাই?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, হাসছে।

রাশেদ যে পাশে সেটা ভুলেই গেল মিতা, বুকে জড়িয়ে ধরল রানাকে। আর দুইহাতে ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরল রাশেদ।

দুই ভাই-বোন ও রানার হৈ-হুল্লোড়ে গমগম করে উঠল কুবলাই খানের সমাধি।

***